সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারী গ্রেট বৃটেন দল বন্ধুবর্গ সহ

প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

		এথ্‌লেটিক্‌স্‌	সাঁতার	ফুটবল	টেনিস্‌	সাইকেল দৌড়	পয়েণ্ট
১।	গ্রেটবৃটেন	৮৪	৪৭	১০	৪৯	১৬	২০৬
২।	জার্ম্মানী	৮১	৭৮	—	১০½	—	১৬৯½
৩।	ফ্রান্স	১০৫	১১	৪	২০	৯	১৪৯
৪।	সুইডেন্‌	১২১	—	—	—	—	১২১
৫।	ফিন্‌ফ্যাণ্ড	১১২	—	—	—	—	১১২
৬।	নরওয়ে	১৮	৩০	—	—	—	৪৮
৭।	বেলজিয়াম	—	—	৬	৩৫½	—	৪১½
৮।	ডেনমার্ক	২৬	১১	—	—	—	৩৭
৯।	হল্যাণ্ড	—	৩৬	—	—	—	৩৬
১০।	হাঙ্গেরী	—	৩০	—	—	—	৩০
১১।	ইউ এস এ	২৯	—	—	—	—	২৯
১২।	অষ্ট্রিয়া	১১	১২	—	—	—	২৩

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "রবীন মাষ্টার"— ২৲
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "সান্ত্বনা"— ১।০
রায় শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর প্রণীত "কলিকাতার কথা" (মধ্যকাণ্ড ইতিহাস)— ৩৲
শ্রীসুভো ঠাকুর প্রণীত কাব্য "স্বপ্ন শেষ"— ম৵০
শ্রীসতীশচন্দ্র ভক্তিরত্ন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন"— ।৹
শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত উপন্যাস "কাল-নিদ্রা"— ১॥০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প "বিদেশী ফুল"— ১॥০
শ্রীজগৎ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "এরা শুধু মানুষ"— ১॥০
শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "পতিতার জাহ্নবী"— ২৲
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত কবিতা "রূপায়তন"— ১৲
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নারী জীবনী "জীবনী সংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ— ১।০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

চৈত্র—১৩৪২

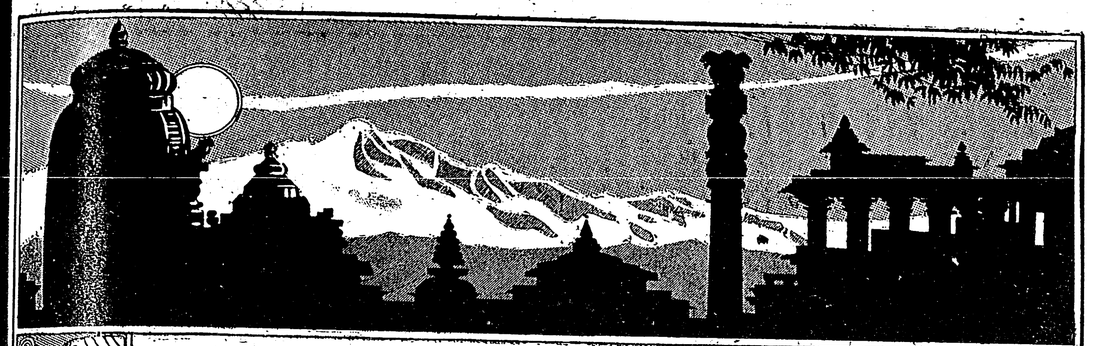

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

চলিত ভাষার সংস্কার

শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা চলিত ভাষার বানান নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। আনন্দের কথা। প্রগতি-শীলা চলিত ভাষার যথেচ্ছাচারকে সুনিয়ন্ত্রিত করে একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংযত পথে তাকে পরিচালনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, কেবলমাত্র বানান সমস্যার সমাধান চেষ্টাতেই এ সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য সমাপ্ত হবে না।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ধারা দেখে মনে আগেই এই সংশয় জাগে যে, তাঁরা এদিকে ঠিক দৃঢ়পদে অগ্রসর হবার সংকল্প করেন নি। পদক্ষেপ যেন একটু দ্বিধাজড়িত ও সকুণ্ঠ! তাঁরা 'সাধুভাষা' ও 'চলিত ভাষা' দু' নৌকাতেই পা দিয়ে অগ্রসর হ'তে চান, কিন্তু এরূপ যাত্রা যে চিরদিনই সঙ্কটময় এবং তার ফল যে কোনো দিনই শুভ হ'তে পারে না একথা বলাই বাহুল্য!

তাঁরা চান একটা মাঝা-মাঝি রফা করে চ'লতে! কিন্তু, এতে কোনোটিরই কল্যাণ হবে ব'লে মনে হয় না। এই উভয়-সঙ্কট অবস্থায় যে কোনো একটাকে ত্যাগ ক'রে একটাকে ধরে থাকাই ভালো। হয় সাধু ভাষাই তাঁরা শিরোধার্য্য ক'রে নিন; নয় চলিত ভাষার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করুন।

এ বিষয়ে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্যমও ঠিক এই একই কারণে আশানুরূপ ফলবান হ'তে পারছে না। তিনি মৌখিক ও লৈখিক ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পক্ষপাতী। এতদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু অক্ষর সংক্ষেপও ক'রতে চান্। কিন্তু তিনি সংস্কৃতের মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা তাঁকে প্রতিপদে ভ্রূকুটি ক'রে অক্ষর পরিত্যাগে বাধা দিচ্ছে! তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার ভার কিছু কমাতে ইচ্ছুক অপরদিকে তেমনি আবার এর স্কন্ধে কতকগুলি চিহ্নের বোঝা চাপাতেও চান! এই 'চাপান' কিন্তু বর্ত্তমান ব্যস্ততার যুগে কোনো কিছুর উপরই সইবে না!

এখন দিন এসেছে সকল প্রকার বাহুল্য বর্জ্জনের।

বর্ত্তমান শতাব্দীকে প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক যুগ বলা চলে। এ যুগে মানুষের সকল প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হ'চ্ছে কল-কব্জার সাহায্যে। যা কিছু চিঠি-পত্র দলিল দস্তাবেজ আদালতের আর্জ্জি ও রায়, মায়—বড় বড় বই লেখা পর্য্যন্ত টাইপ-রাইটারে নিষ্পন্ন হ'চ্ছে। দ্রুত লিখনের জন্য short-hand বা 'ত্বরা-লেখা' এবং cable বা তারে সংবাদ প্রেরণের সুবিধার জন্য code-words বা সাঙ্কেতিক শব্দের প্রচলন হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের কাজ সত্বর, সহজ এবং সুন্দর করবার জন্য 'লাইনোটাইপ' 'মনোটাইপ' ও 'রোটারি মেশিন' ব'সেছে। কিন্তু সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত্তের যেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, তেমনি এসব দেখে আমরা শুধু ম্লান অধোমুখে চেয়ে থাকি মাত্র। কারণ 'বাংলাভাষা' এ সকল সুযোগ গ্রহণের মোটেই উপযোগী নয়। আনন্দবাজার পত্রিকাকে বাংলা লাইনোটাইপ যন্ত্র সংগ্রহ করতে রীতিমত কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হ'য়েছে। তাঁরা বরলাভ করেছেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁদের সম্পূর্ণ মনঃপুত হয়নি। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ধরণীর ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চ'লতে না পারলে জগতে আজ আমাদের যে কেবল পেছিয়েই পড়তে হবে তাই নয়, জগন্নাথের বিরাট রথচক্র তলে নিষ্পেষিত হ'য়ে মরতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতিই বর্ত্তমান সময়ানুকূল ও উত্তর যুগোপযোগী নিজেদের যা কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তা যথাকালে সংস্কার করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে! কেবল আমরাই কি পড়ে থাকবো পুরাতনের মোহ নিয়ে?

এই আকাশ-যানের যুগে বৈদিক আমলের গরুর গাড়ীর মায়া কাটাতে হবে। পরিবর্ত্তনই গতি; পরিবর্ত্তনই প্রাণ! নদীর স্রোতোবেগ আছে বলেই তার জল থাকে চির-নির্ম্মল! যুগে যুগে নব নব সংস্কারের পথ বেয়েই জাতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হ'য়ে ওঠে।

চীন তার বর্ণমালার ৪৯০০০ অক্ষরকে কমিয়ে ২৪টিতে দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কেবলমাত্র টিকি ছেঁটেই নিশ্চিন্ত হয় নি। তুর্কী তার খিলাফৎ ও ফেজটুপি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার এবং লিখন ও মুদ্রণের সুবিধার জন্য 'রোমান-লিপি' গ্রহণ করেছে। বন্ধুবর ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন থেকেই আমাদের রোমান-লিপি গ্রহণ করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা জন্মগত সনাতনী। মন আমাদের পুরাতন-পন্থী। সে তার মজ্জাগত জরার জড়তা এবং সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে এ সকল অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারও গ্রহণ ক'রতে পারছে না।

আজকের কথা নয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ গড়ে তোলবার জন্য 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সকলকে আহ্বান ক'রেছিলেন। তাঁর মতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয় বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর ভাদ্র-বৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখন মুখ দর্শন করেন নি। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হয়েছিল, সে জন্য একে তাঁরা আমল দেন নি। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটে নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করলেন যার কেবল বিধিই আছে, কিন্তু গতি নেই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়ে যজ্ঞ-কর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়লেন। (সবুজ পত্র ১৩২৩) কিন্তু সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলেনি। নিকষ এবং তৌলদণ্ডের যোগে সে সীতার মূল্য পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য সে সজীব প্রাণের মূল্য * * (বিচিত্রা ১৩৩৯) চলিত বাংলার প্রতিষ্ঠার পক্ষে—অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার বিরাম নেই। তিনিই প্রথম একথা জোর ক'রে ব'লতে সাহসী হয়েছিলেন যে "তিনটে 'শ', দুটো 'ন' ও দুটো 'জ' শিশু-দিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। * * * এ ছাড়া দুটো 'ব'য়ের মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ, ৯, ঙ, ঞ, এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। * * সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় "হ্রস্ব দীর্ঘস্বর।" কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ সেই কথাই বলি। চলিত ভাষার সংস্কার তথা বানান নিরূপণে নিযুক্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলা বর্ণমালা সংক্ষেপ করা! কারণ বানানের ভিত্তি বর্ণমালার উপরই নির্ভর করে। এই বর্ণ-মালা আগে নির্দ্দিষ্ট না হ'লে 'বানান' এই শব্দটিরই বানান

নিয়ে গোল বেধে যেতে পারে! বর্ণমালার বর্ণনা থেকে যদি বানান শব্দ এসে থাকে তাহ'লে সংস্কৃতপন্থীদের মতে বানানের বানান করতে মাঝের 'ন'টি মূর্দ্ধণ্য ণ লেখা উচিত! কিন্তু এতাবৎ আমাদের দন্ত্য নয়েই কাজ চলেছে, এ জন্য 'মহাভারত' অশুদ্ধ হয়নি।

চলিত বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের বালাই নেই; রাজশেখরবাবু বলেন—মূল সংস্কৃত শব্দের আদিতে বা মধ্যে যদি 'ঈ' থাকে তবেই বাংলা শব্দে দীর্ঘ ঈ হয়, যথা দীর্ঘ=দীঘ, দীর্ঘিকা=দীঘি, কুম্ভীর=কুমীর। কিন্তু, এর ব্যতিক্রমও তিনি দেখিয়েছেন। আর, দীর্ঘ ঈ হয়—অবশ্য পণ্ডিতি প্রথায়—দুই সমান স্বর সন্নিহিত হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করলে—যেমন গিরি-ইন্দ্র=গিরীন্দ্র, মহী-ইন্দ্র=মহীন্দ্র। অথচ দীর্ঘ ঊর বেলা মূল সংস্কৃতে দীর্ঘ ঊ থাকলেও শব্দের বাংলা রূপে হ্রস্ব উ হয়, যেমন—ঊনবিংশ=উনিশ, কূপ=কুয়া, তূল=তুলা ইত্যাদি। সন্ধির ক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘ ঊ বজায় থাকে।

বিশেষণে ও স্ত্রীলিঙ্গে—দীর্ঘ ঈ ব্যবহার বাংলায় নিয়মিত হয়েছে বলা চলে না—কেন না তারও যথেষ্ট ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। যেমন—বেশি, দিদি। অতএব আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষায় ১৪টি স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র অ আ ই উ এ ও এই ৬টি থাকলেই যথেষ্ট! চলিত বাংলা ৯, ঌ,কে বর্জ্জন করেই চলে। আর—ঋ, ঐ'কার, ঔ'কার প্রভৃতি যখন স্বাধীনবর্ণ নয়, দু'টি বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে উচ্চারিত হচ্ছে, তখন সেই সন্ধিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেই অনায়াসে উচ্চারণ ক'রতে পারা যাবে। যথা—র্-ই=ঋ বা রি, অ-ই বা ও-ই=ঐ, এবং অ-উ বা ও-উ=ঔ! যেমন:—ঐ লোকটি=ওই লোকটি। 'ঐশ্বর্য্য' শব্দটিকে যদি 'অইশর্য' এই বানানে চালানো হয়, কেন না আমরা বাংলায় শ্ব'র ব'ফলা উচ্চারণ করি না, তাতে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য কিছুমাত্র কমবে বলে মনে হয় না! 'খই', 'দই', ঐ'কারের পরিবর্ত্তে ই দিয়ে লিখলে ফলারের কোনো অসুবিধা হবে কি? 'ঔষধ'কে চলিত বাংলায় 'ওষুধ' বানান করলেও আশা করি তা' সেবনে রোগ সারবে। 'কৌশল'কে যদি 'কউশল' লেখেন তাতে কারুর কৌশল ব্যর্থ হবে না।

ব্যঞ্জন-বর্ণ থেকে ঙ, ঞ, ণ, ব, শ, স, ঢ়, ঃ এবং ৎ সহজেই বর্জ্জন ক'রে চলিত ভাষা মাত্র ৩০টি ব্যঞ্জন অক্ষরে তার সকল ব্যঞ্জনা শেষ করতে পারে। বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রেখে, এমন কি ইংরাজীর V. W. Z. ও আরবি ফার্সির খে, কাফ, গাইন প্রভৃতিরও সঠিক উচ্চারণ কেমন ক'রে বাংলায় লেখা যায় সে সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভেবে, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কর্ত্তারা যদি বাংলা ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলে "পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মা আমার" করে তোলেন, তাহ'লে তাঁরা হয়ত ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিধি বজায় রাখতে পারবেন, কিন্তু, ভাষা হ'য়ে উঠবে দুর্ভাষ্য!

উচ্চারণ প্রথা বাংলা দেশের সকল জেলায় সমান নয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা যায় কলকাতার লাখপতিরা লক্ষ টাকাকে বলবে—'লোখ্য টাকা' এবং ঢাকার ধনী মহাজনেরা তাঁদের প্রাদেশিক ধ্বনি বজায় রেখে পড়বেন 'লৈক্ষ্য টাহা!' কিন্তু, সে জন্য লাখটাকার একটি পয়সাও কম পড়বে কি? সুতরাং ও চেষ্টা না ক'রে, যাতে ছেলেমেয়েদের ভাষা শেখার উপায়টি সুগম হয়, লাইনো-টাইপ, মনোটাইপ, টাইপ-রাইটার প্রভৃতি মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা ও ছাপাখানার সৌকর্য্যের সুযোগ ঘটে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে যথাসম্ভব বর্ণমালার বাহুল্য বর্জ্জন করাটাই হবে সমীচীন।

এখন দেখা যাক্ আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা হ্রাস করলে বাংলা ভাষা—বিশেষ চলিত ভাষা অচল হ'য়ে পড়বে কি না?—

আমাদের মনে হয় 'ঙ'র আসনে যদি ং কে বসানো যায় তাহ'লে ঙ কে আমরা অনায়াসে নির্ব্বাসনে দিতে পারি। বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঙ ঞ ণ ন ম স্থানে যদি সমবর্গীয় বর্ণ পরে থাকে তবে ং ব্যবহার করা বিধি আছে এবং তা চলছেও। অহংকার, সংকীর্ণ, সংখ্যা, সংঘ ইত্যাদি এর প্রমাণ। কাঙালী বাঙালী লিখতে চলিত বাংলা এখনও 'ঙ'র শরণাপন্ন হয়, কিন্তু 'ঙ'য় আকার চিহ্ন দেওয়ার পরিবর্ত্তে 'ঙ'টাকে বাদ দিয়ে যদি পুরো 'আ'কারটাই ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে 'বাংআলী'—বাঙালীই থাকবে, ওড়িয়া বনে যাবার ভয় নেই।

বর্গীয় 'জ'এর কায আমরা অন্তস্থ 'য' দিয়ে সারবো, কারণ বাংলার জিহ্বায় দুই 'জ'ই সমান। দুটো 'য'এর

মধ্যে অন্ত্যস্থ 'য'টা বেছে নেওয়ার কারণ—ওর তলায় ফুটকি দিলেই আমরা 'য়' অক্ষরটা পাবো, তাতে 'লাইনো' ও টাইপ রাইটারের পক্ষে এবং ছাপাখানার দিক থেকেও স্থবিধে।

'ঞ' আমাদের খুব কমই প্রয়োজনে লাগে। সে আছে কেবল যুক্তাক্ষরের সংখ্যা বাড়াবার জন্য। যথা—চঞ্চল, বাঞ্ছা, কুঞ্জ, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শব্দে এক একটি নূতন নূতন যুক্তাক্ষর—অথচ প্রত্যেকটি শব্দ আমরা উচ্চারণ করি সুস্পষ্ট দন্ত্য 'ন' দিয়ে—যেমন—চন্‌চল, বান্‌ছা, কুন্‌জ, ঝন্‌ঝা! স্থতরাং 'ঞ'র উৎপাত এখানে সহ্য করা নির্ব্বুদ্ধিতা! জ্ঞানীদের 'যজ্ঞ' পণ্ড করবার জন্য কোনো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হ'লে 'য' ফলা ও ঁ চন্দ্র বিন্দুর শরণাপন্ন হলেই চল্‌বে। অবশ্য হসন্ত চিহ্নটা থাকা চাই। কারণ, এই হসন্তের হাতিয়ার ঘুরিয়েই আমরা সমস্ত যুক্তাক্ষরকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চাই। চলিতভাষা যদি এভাবে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন ক'রে চলে তাহ'লে গ্যাঁন, বিগ্যাঁতা, অভিগ্যাঁতা অগ্যাঁ লোকেরও অবিদিত থাকবে না। যগ্যাঁ শিশুরাও সম্পাদন করতে পারবে। মূর্দ্ধণ্য 'ণ'কে ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র দন্ত্য ন কে ধরে থাকলেই চলিত বাংলা—ভাষার সাগরে ভেসে বেড়াতে সমর্থ হবে। কেন না, মৌখিক ভাষা 'ষ'ত্ব 'ণ'ত্বর ধার ধারে না। অন্ত্যস্থ 'ব'টি বাংলা ভাষায় একেবারেই নিষ্কর্ম্মা!

তিনটি 'শ'য়ের মধ্যে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'কে রাখার আমরা পক্ষপাতী, কারণ অন্ত্যস্থ 'য'এর পেট কাটলেই তাকে পাওয়া যাবে। ছেলেদের শেখার পক্ষেও স্থবিধার, কলকব্জার পক্ষেও স্থবিধার। ছাপাখানার ত কথাই নেই!

ঃ বিসর্গ আপনিই ক্রমশঃ স্বর্গলাভ করছে। বাংলা ভাষায় ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'তুঃসময়ের' জন্য 'তুঃখ' ক'রতে হ'লে এখন পর পর য্‌'য়ে হসন্ত ও ক্‌'য়ে হসন্ত বসালেই আর বিসর্গের অভাবে কারুর 'নিষ্‌সহায়' বোধ হবে না।

'আষাঢ়'কে যখন আষাড় বলি, 'রাঢ়' দেশকে উচ্চারণ করি 'রাড়' স্থতরাং আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র 'ড়' থাকলেই 'মূড়্‌হ'জনেরাও তার 'গূড়্‌হ' অর্থটা 'গাড়্‌হ'ভাবেই বুঝবে।

বেঁচে থাক্ 'ত'য়ে হসন্ত—ৎ আবার কেন? ওকে নাকে 'খৎ' দিয়ে বিদায় করা হোক্।

এইভাবে অনাবশ্যক হরফগুলিকে সংক্ষেপ করতে পারলে ছাপাখানাওয়ালারা তু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরেরাও 'বর্ণ পরিচয়' চট্‌পট্ শেষ করতে পারবে। পূর্ব্বেই বলেছি চলিত বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর রাখবার প্রয়োজন নেই। 'ক্ত' নিয়ে এত রক্তপাত না করে ক'য়ে হসন্ত দিয়ে 'বক্‌তব্য' শেষ করাই ভালো। ক'য়ে ষ'য়ে 'ক্ষ'টা ভিক্ষাতেই শোভা পায়। ওটা বাদ দিয়ে ক'য়ে হসন্ত ও খ রাখলে ছেলেরা রক্‌খা (রক্ষা) পাবে। ক'য়ে স'য়ে যুক্ত করবার প্রয়োজন ত দেখি কেবল কক্সবাজারে বা বক্সারে 'বাক্স' কিনতে গেলে হ'তে পারে। স্থতরাং ওটাও ক' য়ে হসন্ত দিয়েই সারা উচিত। গ'য়ে ধ'য়ে যুক্ত না ক'রে, যদি কিছু দ গ্‌ধ করা হয় তাহ'লে কি আপনারা মুগ্‌ধ হবেন না?

'লঙ্কা' যদি ঙ'য়ায় ক'য়ে না লিখে ল'য়ে ং+কা=লংকা লিখি তাহ'লে লংকার ঝাল একটুও কমবে না, সোনার লংকাও ছারখার হবে না। এমনি করে ষ'য়ে ং অনুস্বর দিয়েই যদি ষংখ লিখি তাহ'লে সে ষংখও সকল শুভ কাজে বাজবে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে ঙয়ায় গ'য়ের অনাবশ্যকতা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

চয়ে চয়ে, চয়ে ছয়ে, জয়ে ঝয়ে, টয়ে টয়ে, নয়ে ঠয়ে, নয়ে ডয়ে, তয়ে তয়ে, পয়ে তয়ে, নয়ে দয়ে, নয়ে ধয়ে, ঞয়ে জয়ে, ময়ে ফয়ে, সয়ে তয়ে, প্রভৃতি সমস্ত যুক্তাক্ষর এইভাবে হসন্তের সাহায্যে লিখে স্থচারু ভাবে কাজ চালানো যায় 'উ-চ্‌-ছ-ন্য' এইভাবে 'উচ্ছন্ন' বানান লিখলে ছেলেরা কেউ উচ্ছন্ন যাবে না। 'উচ্‌ছন্‌ন' এখানে ন'য়ে হসন্ত ও ন লিখলেও চলে কিন্তু একটি হরফ্ বেড়ে যায়। 'য' ফলা দিলে সেটা সংখেপ করা যায়।

এতগুলি দ্বৈগুণী যুক্তাক্ষর ছাড়া কয়েকটি আবার ত্রৈগুণী যুক্তাক্ষরও আমরা ছেলেদের কাঁধে চাপাই যেমন—লক্ষ্মণ, উজ্জ্বল, মহত্ত্ব, মন্ত্র, উর্দ্ধ, বস্ত্র ইত্যাদি। এ গুলিকে বাচ্ছাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে না নিলে তারা ঘাড় সিধে ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এখন থেকে ওরা লিখুক লখ্যন, উজ্যল্, মহত্য, মন্ত্, উদ্ধার, বস্ত্ ইত্যাদি। কিন্তু, এই ্ 'র'. ফলা প্রভৃতি চিহ্ন সম্বন্ধেও একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে হয়। ই, কার উ'কার প্রভৃতি চিহ্ন ও য'ফলা র' ফলা ম'ফলা ব'ফলা, ন 'ফলা ঋ'-

ফলা আমাদের ঢেলে সাজিতে হবে। স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ যখন বাদ দিচ্ছি, তখন 'f' চিহ্নটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে টেনে আনাই স্থবিধা যথা—তীনী। ডাইনের হ্রস্বইকার না থাকায় এখানে দীর্ঘঈকার ব্যবহার করতে হ'ল। কারণ, আগে ব্যঞ্জন—তারপর স্বর যোগ! ু চিহ্নটি যোগেশবাবু ও রাজশেখরবাবুর প্রস্তাব অনুসারেই চালানো ভাল। সর্ব্বদা নিচের দিকে এক পাশে থাকবে। কোনো হরফের সঙ্গে আর যুক্ত হ'তে দেওয়া নয়। তাহ'লে শুঁড়পাকানো 'গু' 'শু' প্রভৃতি পৃথক হরফ আবশ্যক হবে না। 'ঋ'কে আমরা ত্যাগ করেছি র+ই র সাহায্যে। কাযেই 'ঋষি' এখন থেকে 'রীষী' লিখলেই চলবে, কিন্তু 'কৃষি' কাযের বেলা ক'য়ের সঙ্গে র+ই র চিহ্নরূপে সেই পুরাতন কাতকরা ৃফলাকেই বাহাল রাখতে চাই—এবং ্র ফলার বেলা তাকেই উপর দিকে তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে বলি।

ৃ ফলা তলার দিকে থাকলে হবে র+ই=রি। উপর দিকে থাকলে হবে 'র' ফলা। তাই সম্বল ক'রেই ত্র্যম্ব্যক বৃষারূঢ় হ হয়ে ত্রৈলক্য ঘুরে আসতে পারবে। এটা কউতুক নয়। "ে" চিহ্নকে অক্ষত রেখে 'ও'কারের বেলা সেই পুরাতন 'ঔ'কার চিহ্নটার শেষাংশ টেনে নিয়ে এসে ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন 'শোক' না লিখে 'শৗক' লিখলেই হবে। 'ঐ' কার ও 'ঔ'কারের কোনো চিহ্নই রাখার আবশ্যক নেই; কারণ ওগুলো 'ই' 'উ' দিয়ে চলবে। 'ক্র' হরফেরও প্রয়োজন গেল, এখন 'ক'য়ের মাথার পাশে 'র' ফলা অর্থে প্রযুক্ত 'রি' ফলা দিলেই হবে যথা—বক্র, কুর। 'ব' ফলা রাখাও অনাবশ্যক। কারণ অধিকাংশ শব্দেই তিনি অনুচ্চারিত থাকেন যেমন—স্বাধীন, শ্বেত, স্বজন, দ্বীপ, স্বর্ণ, স্বর, ইত্যাদি। যেখানে উচ্চারিত হয় সেখানে উদ্যানের মত 'য' ফলাতেই কাজ চলবে—যেমন 'বিদ্বেষ', 'অম্ব্য' 'বিদ্যান' ইত্যাদি। 'ন' ফলারও প্রয়োজন নেই কারণ 'বিষন্য' 'অন্য' ইত্যাদি 'য' ফলাতেই চলবে। দণ্ড্য ন'য়ে হসন্ত ও 'ন' দিলেও চলে কিন্তু তাতে হরফ বাড়ে। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্‌ন' লিখলে আশা করি, 'বৈষ্‌নবেরা উষ্‌ন বা 'অসহিষ্নু' হবেন না। মধ্যাহ্ন র 'হ্ন' চলিত ভাষায় হত হ'য়ে উচ্চারিত হয় মধ্যান্‌ন!

'ম' ফলা নিয়েও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলা ভাষায় ওটার উচ্চারণ নাসিকাতেই আবদ্ধ থাকে।

যথা—'ভস্যঁ' (ভস্ম) পদ্যঁ (পদ্ম) রেফ্‌টা ´ আমরা চাই। কারণ, ওটা অনেক 'দ্বিত্ব' রূপঃহরফি দৈত্যেরহাত থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবে। যেমন—ধর্ম, কর্ম, মর্ম, গর্দভ ইত্যাদি।

স্থতরাং, আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী এখন বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে একখানি মাত্র সরল 'বর্ণ বোধে' দাঁড়াচ্ছে—যার অক্ষর বিন্যাস ৫৪টি স্থলে—হবে ৩৩টি। স্বর-ব্যঞ্জন চিহ্ন ২১টির পরিবর্ত্তে মাত্র ১০টি—যুক্তাক্ষর ৩০টি একেবারেই বাদ যথা—ক্ক, ক্ত, ক্ষ, ক্ম, গ্ধ, ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, চ্চ, চ্ছ, ঞ্ঝ, জ্ঞ, ঞ্জ, ট্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ত্ত, ন্দ, ন্ধ, ব্জ, স্ফ, স্ত, ক্ষ্ম, জ্জ্ব, ন্ত্র, ত্র, ম্ন, র্জ্জ, র্দ্ধ, স্ত্র। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—স্বরবর্ণ=অ, আ, ই, উ, এ, ও=৬, ব্যঞ্জনবর্ণ=ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, হ, ং, ঁ, ড়, য়।=৩০, স্বর-চিহ্ন=া, ী, ু, ে, ৗ=৫, ব্যঞ্জন ফলা=্য, ৃ, ্র, ´=৫। ব্যস্, এই পেলেই চলিত বাংলা চমৎকার চলবে—কি পাঠশালে, কি টাইপ-রাইটারে, কি ছাপাখানার লাইনোটাইপ, মনোটাইপ রোটারি মেশিনে—সবেতেই এবং স্থনীতিবাবু বোধ হয় স্বীকার করবেন 'রোমান লিপি' চালাবার পক্ষে এটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ!

শব্দের উচ্চারণ সঙ্কট ও অর্থ-বিভ্রাট ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অনেকেই সঠিক উচ্চারণের অনুকূল অতিরিক্ত কতকগুলি চিহ্ন বানানের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে উৎস্থক হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ যাননি। 'লেখা' এবং 'দেখা' শব্দে এ' কারের সোজা ও বাঁকা তুরকম বিভিন্ন উচ্চারণের ইঙ্গিত দেবার জন্য বাঁকা 'এ' কারের একটু পার্থক্য রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। ইংরাজীনবীশ পণ্ডিতেরা আবার 'জ' ও Zএর উচ্চারণ পার্থক্য প্রকাশের যোগ্য চিহ্ন খুঁজছেন। কিন্তু, ছেলেরা যখন Bat, আবার Ball নিয়ে খেলা করতে পারে, Sit বলে Kite শেখে, Top জেনেও Toll টোল পড়ে—Put বলেই Cut বলে, তখন একারের এই ঈষৎ করুণা তাদের উপর না বর্ষণ করলেও চলে। 'এ'কারের কোথায় বাঁকা উচ্চারণ হবে এবং 'য' কোথায় 'Z'এর মত উচ্চারিত হবে সেটা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলেই সুবিবেচনার কাজ হবে। "কেশব কেরাণীগিরি করে না কেশিয়ারী করে।" এর মধ্যে কেবল মাত্র একই 'ে'কার চিহ্ন থাকলেও যথাস্থানে বাঁকা উচ্চারণ কেউ পড়তে ভুল করবে না। অবশ্য "ইষ্ট্যা-মপকা-

গজবি-ক্রয় হয়” যাঁরা পড়েন তাঁদের কথা আলাদা। ‘এবং’ কথাটায় মস্ত বড় ‘এ’ থাকলেও কোনো কোনো জেলার লোকেরা—পড়েন ‘এ্যাবং’। ‘কেবল’ তাদের কাছে ‘ক্যাবল’—আর যতই বাঁকা ‘ে’ একার থাক না এমন কি যে শব্দে ‘্যা’ও আছে, সেখানেও তাঁরা বেরিষ্টার (ব্যারিষ্টার) ডেকে এনে ‘বেঘাত’ (ব্যাঘাত) উৎপাদন করবেন এবং ‘বেকারণের’ (ব্যাকরণ) ‘বেখ্যা’ (ব্যাখ্যা) শোনবার জন্য ‘বেকুল’ (ব্যাকুল) হবেন। সুতরাং বাঁকা ‘এ’কারের বঁড়শী দিয়ে তাঁদের জিহ্বাকে সংযত করবার চেষ্টা নিষ্ফল।

তবে তাঁরা নিজেরা এর একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার ক’রেছেন বটে, সেটা আপনারা গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না ভেবে দেখুন! তাঁরা ‘চেন’ শব্দটাকে লেখেন ‘চেইন্’—পাছে ‘চ্যান’ পড়ে ফেলেন কেউ! ‘ল্যান’ না বলেন কেউ, এই ভেবে ‘লেন’কে লেখেন ‘লেইন’! কিন্তু, যাক্ সেকথা। সুনীতিবাবু ‘ষ্টেশন’ লিখলেও যখন তাঁরা পড়েন ‘ষ্ট্যাশন’ এবং আমরা পড়ি ‘ষ্টেশান’ তখন ‘ষ্টেশনে’ কোনো পক্ষেরই আপত্তি থাকতে পারে না। পাঠক-সমাজকে একেবারে নীরেট মূর্খ ধরে নেওয়াটা কিন্তু পণ্ডিত-বর্গের পক্ষে না বিদ্যাবত্তার—না বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক! কোথায় ‘য’ Zএর মত উচ্চারিত হবে এ তারা জানে। একারণ য’য়ের পিঠে Zএর আঁচড় দেবার প্রয়োজন করে না। তারা বাবুও সাজে, আবার তামাকও সাজে, হাজার কাজের মধ্যেও বাজার যেতে বেজার হয় না!

এই তো গেলো উচ্চারণ সঙ্কটের কথা। এখন অর্থ-বিভ্রাট সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাক। ঈ, ঊ জ, ণ, শ, স, ইত্যাদি তুলে দিলে অনেক ভিন্নঅর্থ-বাচক শব্দের একই রকম বানান হবে, ও তা’ নিয়ে গোল বাধবে। তাছাড়া, লিঙ্গ-বিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা ত আছেই, একথাও অনেকে বলবেন। কারণ, বাংলায় সাধারণতঃ ই ও ঈ এবং নি ও নী প্রত্যয় যোগেই স্ত্রীলিঙ্গ পদ নিষ্পন্ন হয়! কিন্তু এসকল আপত্তিও একেবারেই টেকে না! কারণ বাংলা ভাষায় এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যার বানান এক, কিন্তু অর্থ বহু! “minute” কোথায় সময়জ্ঞাপক এবং কোথায় সভাসমিতির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী—আবার কোথায় বা তা ‘মাইনিউট’ সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছেলেরা যদি শেখে—Please take it এবং It will please you! এই উভয় pleaseএর অর্থ পার্থক্য যদি ছেলেদের রপ্ত হ’তে পারে, তাহলে ‘ভাষা’ কোথায় language, আর কোথায় ‘ভাষা’ মানে to float, ‘দিপ’ অর্থে কোথায় ‘প্রদীপ’ আর কোথায়ই বা জলবেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ—তা’ সহজেই তারা আয়ত্ত করে নেবে। ‘পাট’=শব্দটির বানান পা+ট কিন্তু অর্থ অনেকগুলি।—১। কোষ্ঠী বা শণপাট, ২। নালিতা, ৩। রেশম, ৪। কৌশেয়, ৫। পাটশাড়ি, ৬। ভাঁজ, ৭। স্তর, ৮। তক্তা (ধোবার), ৯। কপাটের পাট, ১০। খড়ম বা চটির (জুতোর) পাটি, ১১। সিংহাসন (রাজপাট), ১১। শ্রেষ্ঠ (পাটরাণী), ১২। বৈষ্ণবপীঠ (শ্রীপাট), ১৩। অস্ত (সূর্য্যপাটে), ১৪। নিত্যকর্ম্ম (ঘরের পাট), ১৫। ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি (বংশের পাট), ১৬। কুয়ার পাট, পেটো ইত্যাদি। আর একটা দেখুন—‘তারা’ শব্দটি, একই বানান ‘তা-রা’—কিন্তু, অর্থ এর প্রায় এক ডজন! যথা—তারা=নক্ষত্র, তারা=আখিতারকা, তারা=দশমহাবিদ্যার একটি, তারা=বালিরাজার পত্নী, তারা=বৌদ্ধ দেবী, তারা=সুরগ্রামের উচ্চগ্রামক (উদারা মুদারা তারা!), তারা=তাহারা, তারা=পার হওয়া উত্তীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঊ, ণ, জ, শ, স প্রভৃতি বাদ দেওয়ার ফলে একই বানানের বিভিন্ন অর্থ-বাচক শব্দ ছেলেদের বেশী কিছু জব্দ ক’রতে পারবে কি?—

আমাদের প্রস্তাবিত ভাষা সংস্কারের ফলে ঈহা ও ইহা এক হবে বটে, কিন্তু চলিত বাংলায় ‘ঈহা’ ব্যবহার হয় কি? সংস্কৃত কীল=বাংলায় ‘খিল্’ হয়ে গেছে সুতরাং আটকাবে না। কাষি—অর্থ তখন অভিধানে লেখা হবে ১। কাষিধাম্ বারাননষি হিন্দুর তিরথ্ য্থান ২। যদি কাষি, কাষরোগ ইত্যাদি। মতিলালের মতিগতি ভাল নয় লোকে যখন বুঝতে পারে তখন গংগায় ‘বান’ ডাকলে কেউ গংগা ময়রার ‘বান’ বলে ভুল করবে না এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

তারপর লিঙ্গ-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা! এটা একেই অমূলক যে তা নিয়ে পুঁথি বাড়াতে চাইনে। শুধু এইটুক ব’ললেই যথেষ্ট হবে যে ‘ই’ ও ‘নি’ প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলি এ উৎপাতেও অক্ষতই থাকবে, কারণ আমরা ‘ঈ’ বর্জ্জন করিনি। আর ‘ঈ’ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যদি অতঃপর ‘ই’ দিয়ে লেখা হয়—তাতে আশা করি কোনো

হানি হবে না। স্ত্রীকে যদি এখন থেকে হ্রস্ব ‘ই’ দিয়ে বানান করি, তাঁর আধিপত্য তাতে কিছুমাত্র হ্রস্ব হবে বলে ত’ বোধ হয় না—হ্রস্ব ‘ই’ কার দিয়ে লিখলেও ‘পেত্নি’ চিরদিন পেত্নীই থাকবে। ‘অভাগির’ও কোনকালে ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটবে না! সুতরাং মাভৈঃ!

চলিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব কম ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী। সাধুভাষায় ‘আর্দ্রবস্ত্র’ চলিতভাষায় ‘ভিজে কাপড়’ মাত্র! এতে ‘সিক্তবসনের’ তাৎপর্য্য ও রসের এতটুকুও ঘাটতি হবে বলে মনে করি না। “চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি” যদি সাহিত্যের অমরাবতীতে পৌছতে পেরে থাকে, তবে মিছে কেন সংস্কৃতের প্রাচীন শিলাখণ্ড ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলাভাষাকে গতিহীন করা? এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটলে ‘চণ্ডীদাস’ সেদিন মাঠে মারা যেতেন! মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ’ হয়ত রচিতই হ’ত না—যদি তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের দাসত্ব করতেন। এমন কি পূর্ব্বতন ধারার বিদ্রোহী না হ’লে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পেতেম কিনা সন্দেহ!

অনেকে ব’লছেন ‘পরিভাষা’র সন্ধান ক’রতে সংস্কৃতের কুবের ভাণ্ডারে আমাদের হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই, কারণ চলিতভাষার শব্দসম্পদ এত অল্প ও অসম্পূর্ণ যে সংস্কৃতের দাক্ষিণ্য ভিন্ন তার সংসার অচল হ’য়ে পড়বে। কিন্তু, সত্যই কি তাই? পণ্ডিতেরা অনেক ভেবে Bycycleএর পরিভাষা ক’রে দিয়েছিলেন “দ্বিচক্রযান” কিন্তু তা’কি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হ’তে পেরেছে? তার চেয়ে চলিতভাষার ‘পা-গাড়ী’ অনেক সোজা কথা! আজকাল ত’ দেখি ‘বাইক’ শব্দটাই সবারমুখে চলছে, এমন কি কেতাবেও! “ঘটিকাযন্ত্র” অপেক্ষা ‘ঘড়ি’ যেমন সোজা কথা—তেমনি ক’রেই চলিতভাষায় নূতন শব্দ লোকের মুখে আপনি গড়ে উঠবে ও উঠ্ছে! চাই শুধু পণ্ডিতী গাহারাওয়ালাদের রুলের ভয় না ক’রে সমস্ত প্রয়োজনীয় নূতন বিদেশী শব্দগুলিকে আমাদের বেমালুম আত্মসাৎ করা! যেমন করে আমরা একাধিক সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দকে নিজের ক’রে নিয়েছি! খণ্ড=খাঁড়া, দণ্ড=ডান্ডা, চন্দ্র=চাঁদ, কর্ণ=কান, স্বর্ণ=সোনা হয়ে উঠেছে বাংলায়!! খুব, খোষমেজাজ, মশ্গুল, গোলাপ, রোজগার, গুনাগার, বেমালুম, বাংলা হয়ে গেছে। গেলাস, বাক্স, টিপায়, চেয়ার টেবিল সবই আজ বাংলার ঘরের জিনিষ হ’য়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজ ও আপিষের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম! চপ্-কাটলেটের পরিভাষা খুঁজতে হয়নি কোনো দিন; কেন না, পণ্ডিতের দল টিকি পৈতের অনুশাসন মেনে দীর্ঘকাল ওগুলোর আস্বাদ গ্রহণে বিরত ছিলেন, ওরা সেই সুযোগে একেবারে আমাদের রান্নামহলের হেঁসেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! ‘যবক্ষারজান’ বুঝতে আমাদের জান বেরিয়ে যায়, কিন্তু নাইট্রোজেন সহজে বুঝি। পাড়ার যে কোনো নিরক্ষর স্যাকরা ‘নাইট্রিক এসিড্’ পদার্থটা কি ভাল ক’রেই জানে, কিন্তু “নেত্রিকাম্ল” জিনিষটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত!

বিশ্ববিদ্যালয় বরং প্রচলিত ও প্রাচীন পরিভাষাগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক’রে তাদের নির্দ্দিষ্ট পরিচয় স্থির ক’রে দিন। যে সকল ‘শব্দ’ আমাদের ভাষায় নেই তার কতক-গুলির যথাসম্ভব সহজ ও সরল পরিভাষা প্রণয়ন করুন। বাকী শব্দ আত্মসাৎ করুন। প্রচুর পোর্ত্তুগীজ শব্দ আজ বাংলা হয়ে গেছে—যেমন আচার, আয়া, সায়া, সেমিজ, কামিজ, কেদারা, আলপিন, আনারস ইত্যাদি। বিদ্যুৎ, বিজলী, তড়িৎ প্রভৃতি বুঝি কিন্তু কোনটা Electricityর জন্য ব্যবহার হবে, কোনটা lightningএর জন্য ব্যবহার হবে এইটে তাঁরা বিধিবদ্ধ ক’রে দিন।

এইবার ব্যাকরণ সম্বন্ধে দু’এক কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো। প্রথম প্রশ্ন হ’চ্ছে—“পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র?” অর্থাৎ ব্যাকরণ আগে, ভাষা পরে—না, ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে?

ব্যাকরণের উৎপত্তি অনুসন্ধান করলে তো দেখা যায়—ভাষার কোলেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভাষাই তার জননী! যে বর্ণ, বর্গ, যুক্তাক্ষর, সন্ধি, সমাস, যত্ব, ণত্ব, লিঙ্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, কারক, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দরূপ, অব্যয় এবং ধাতুপ্রকরণাদি নিয়ে এত লাঠালাঠি চলেছে—তারা সকলেই ভাষার স্বাধীন শাসন পরিষদের নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্য মাত্র! ব্যাকরণের অধীনতা মানাটা ভাষারই শাসন সুনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে, ব্যাকরণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নয়। তার পরিবর্ত্তন ও নবনির্ব্বাচন বরাবরই চলবে। এবং সেইটাই বিহিত ব্যবস্থা। আমাদের ভাষায় এত যুক্তাক্ষর ও সমাস সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান ক’রে ত দেখা যায়, সেকালে ছাপাখানা

ছিল না, কাগজের জন্ম হয় নি! লেখকদের হাতে লিখে তালপত্রে গ্রন্থ রচনা ক'রতে হ'ত। যত সহজে শীঘ্র ও অল্পের মধ্যে অনেক লেখা যায় এবং সেই পুঁথির আরও পাঁচখানা নকল চট্ ক'রে করে নেবার সুবিধা হয় এইদিকে লক্ষ্য রেখেই পুরাকালে ভাষার গঠন এই গাঢ়রূপ ধারণ করেছিল। আজকের যান্ত্রিক যুগে তার সে গাঢ়তার প্রয়োজন লোপ পেয়েছে! এখন কলের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভাষার আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে!

বাংলাভাষায় একখানিও বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ আজও রচিত হয় নি। সেই ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ থেকে সুরু ক'রে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ, বীমস্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, লোহারামের বাংলা ব্যাকরণ, মায় যোগেশ বাবুর বাংলা ব্যাকরণ পর্য্যন্ত পানিনি বোপদেবের প্রাচীন সূত্রের উদ্গার মাত্র! সুতরাং এই সময় আগে বাংলা ভাষার আমূল সংস্কার ক'রে নিয়ে তারপর একখানি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা ভাল নয় কি? কি ভাবে এই ব্যাকরণ রচিত হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শব্দকোষে" সে সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে পথনির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং মাল মস্‌লাও যথেষ্ট সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এখন যে কোনোও একজন অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান বৈয়াকরণ সহজেই এ কাজ সম্পাদনে সমর্থ হবেন।

চলিত বাংলা ভাষার প্রত্যেক শব্দের 'ধাতু' উদ্ধারের জন্য অনেকেই আজ বিশাল সংস্কৃত শব্দক্ষেত্রে গভীর খাদ খননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের এ অকারণ শ্রমের কোনো প্রয়োজন আছে কি? বহুযুগের অপব্যবহারের ফলে যে শব্দ তার মান্ধাতার আমলের পৈতৃক ধাতু থেকে আজ সম্পূর্ণ স্খলিত হ'য়ে পড়েছে, তার বর্ত্তমান রূপ ও পরিচয়টাকেই গ্রাহ্য ক'রে নেওয়া উচিত এবং তদনুসারে এখন আবার তাদের নূতন ধাতুরূপ গড়াই কর্ত্তব্য। জাত হারিয়ে যারা পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব হ'য়ে পড়েছে তাদের আজ শুদ্ধি সম্পাদন করে আবার স্ব স্ব পরিত্যক্ত জাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায়, তাদের প্রাক্‌বৈষ্ণবীয় আদি-জাতি নির্ণয়ের আদম-সুমারি বসাতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয় কি? তা'ছাড়া, যে সংস্কৃতের দোহাই পেড়ে সংস্কৃতপন্থীরা এইভাবে বাংলা ভাষার সংস্কার ক'রতে চান, তাঁরা কি জানেন না যে খোদ সংস্কৃতই নিজের অনেক ধাতু হারিয়ে বসে আছে বহুদিন থেকে? 'বুধ্' 'ঋধ্' ও 'এধ্' এই তিনটি ধাতু পরস্পর ভিন্ন বলে সংস্কৃত ব্যাকরণে গৃহীত হ'য়েছে; কিন্তু পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বস্তুতঃ একই 'বৃধ্' ধাতুই 'ঋধ্' ও 'এধ্' এই দুই আকার ধারণ করেছে। 'বৃণোতি' ও 'উর্ণোতি' একই 'বৃ' ধাতুর রূপ। 'বৃষভ' শব্দেরই রূপান্তর 'ঋষভ'।

'দৃশ্' ধাতুর বর্ত্তমানকালে প্রথম পুরুষের একবচনে বৈয়াকরণেরা বলেন 'পশ্যতি', কিন্তু 'দৃশ্' ধাতুর 'দ' কার স্থানে 'প' কার কেন হ'ল? শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সহস্র নৈরুক্ত সমবেত হলেও এর উত্তর দিতে পারবে না! 'পশ্যতি' বস্তুতপক্ষে 'দৃশ্' ধাতুর রূপ নয়। ওটা 'দর্শন' অর্থে প্রযুক্ত 'স্পশ্' ধাতুর রূপ!"

বাংলা ভাষায় 'চাঁদ' শব্দটির ধাতু সন্ধানে যদি চন্দ্রলোকে অভিযান করা যায় তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে মূল 'শচন্দ্র' হ'তে আমাদের 'চন্দ্র' বা চাঁদ হয়েছে। বৈদিক ভাষার 'পুরুশচন্দ্র' 'সুশ্চন্দ্র' 'বিশ্বশ্চন্দ্র' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায়। এইরূপ 'হরিশ্চন্দ্র' শব্দ ও বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আছে। এ সমস্ত পদই মূল 'শ্চন্দ্' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। 'শ্চন্দ্' হ'তেই পরে শ'কার লোপে 'চন্দ্' হ'য়েছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা বলেন 'হরি-চন্দ্র' এই উভয় শব্দের মধ্যে শ'কারের আগমে 'হরিশ্চন্দ্র' হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "এটা তাঁদের কষ্টকল্পনা!"—

সংস্কৃত 'চন্দ্রমাঃ' বা 'চন্দ্রমস্' ও 'চন্দ্র', পর্য্যায় শব্দ বলে ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুত এদের অর্থে কিছু ভেদ আছে। 'চন্দ্র' শব্দের যৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'উজ্জ্বল' 'দীপ্তিমান' কারণ, 'শ্চন্দ্' বা 'চন্দ্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। ওর একটা গৌণ অর্থ হ'চ্ছে 'আহ্লাদিত করা'। 'মাঃ' বা 'মস' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' 'চাঁদ'। পূর্ব্বে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ উদয়াস্ত দেখে কাল্ মাপা হত ব'লে ওর নাম হ'য়েছিল—মাঃ বা 'মস্'। 'মস'—'মস্' অথবা 'মা' ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন। সুতরাং 'চন্দ্রমাঃ' শব্দের পুরাকালে অর্থ ছিল; চন্দ্র=উজ্জ্বল; মা=চাঁদ অর্থাৎ "উজ্জ্বল চন্দ্র"! পরে বিশেষণ বাচক শব্দের অর্থটি লুপ্ত হওয়ায় এখন কেবল 'চাঁদ' ব'লতে 'চন্দ্রমা' শব্দের প্রয়োগ হ'চ্ছে। 'মাঃ' অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় চৈত্রাদি মাসকে 'মাস' বলা হয়।

এখানে 'মাস' কথাটিরও পূর্ব্ব পুরুষের সন্ধান পাওয়া গেল! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অতি চিত্তাকর্ষক ও মহা মূল্যবান প্রবন্ধ "শব্দ প্রসঙ্গ" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪১) থেকে জানা যায়—এমন আরও অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বেনামীতে চলে আসছে, যারা তাদের ধাতু, রূপ ও অর্থ পর্য্যন্ত বহুকাল হ'ল হারিয়ে বসে আছে! পাণিনির মত পাঁড় বৈয়াকরণেও তাঁদের ছদ্মবেশ ধ'রতে না পেরে ব্যাকরণে গোঁজা মিল দিয়ে গেছেন! সুতরাং, অন্যে পরে কা কথা?—

আমরা চলিত বাংলায় এমন অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করি, যা লেখা পণ্ডিতদের মতে একটা অতি লজ্জাকর গর্হিত আচরণ! তার গোটা কয়েক নমুনা এখানে উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন—ব্যাপারটা কিন্তু ততটা মারাত্মক অপরাধ নয়। যথা—আমরা যদি লিখি—'অনাথিনী' ওঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন কথাটা 'অনাথা' হবে। তোমরা 'থিনী' লাগিয়ে আর 'অনাথার' অতিরিক্ত সর্ব্বনাশ কোরো না! আমরা 'গোবর' লিখলে ওঁরা সেখানে 'গোময়' লেপে দেন! আমরা 'অন্তর্ধান' হয়েছেন লিখলে ওরা সেখান থেকে 'অন্তর্হিত' হ'ন। আমরা 'আশ্চর্য্য' হয়েছেন লিখলে ওঁরা 'আশ্চর্য্যান্বিত' হ'য়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন! আমরা 'নির্দ্দোষী' লিখলে ওঁরা কিন্তু সেটা মোটেই 'নির্দ্দোষ' মনে করেন না। আমাদের 'নির্ধনী' তাঁদের কাছে 'নির্ধন'! আমাদের "নৈরাশ" লিখতে দেখলে তাঁরা একেবারেই 'নিরাশ' হন। আমরা 'বিধর্ম্মী' লিখলে তাঁরা আমাদের 'বিধর্ম্মা' মনে করেন! 'বিশেষ ভাবে' কিছু বলতে গেলে তাঁরা 'বিশিষ্টভাবে' সেটা বোঝেন না! আমাদের 'মহদুপকার'কে তাঁরা 'মহোপকার' বলে স্বীকার করেন না। আমরা 'সশঙ্কিত' লিখিলে তাঁরা 'সশঙ্ক' বা বা 'শঙ্কিত' হ'য়ে ওঠেন! আমাদের 'সৌজন্যতা'কে তাঁরা মোটেই 'সৌজন্য' বা 'সুজনতা' বলে মানেন না! সুতরাং ওসব ব্যাকরণের সাংস্কৃতিক বিধান নিয়ে গোড়া থেকেই গোল না বাধিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি:—বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাব-সঙ্গত নিয়মগুলি উদ্ভাবন করা হোক।

মনীষী রাজশেখরবাবু যথার্থ কথাই বলেছেন যে—"কোনো ব্যক্তি বা বিদ্বৎ সঙ্ঘের ফরমাশে ভাষায় সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবেও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে।"

বানানের ব্যাপারে তিনি বলেছেন—"বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিষ্পীড়িত, তার উপর যদি 'ও'কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা ও ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র!" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪০)

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"প্রাচীন প্রাকৃতে বানানের যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধরীতি। ছদ্মবেশে মর্য্যাদা ভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়।" (শব্দকোষ)

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। অনুভবই ইহার পরম প্রমাণ। রাজ শেখর (কবি) বলিয়াছেন সংস্কৃতবন্ধ কঠোর, প্রাকৃতবন্ধ সুকুমার। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও সেই ভেদ। বাক্‌পতি বলিয়াছেন—নব নব অর্থের দর্শন আর সন্নিবেশ শিশিরবন্ধন-সম্পদ এইসব সৃষ্টিকাল হইতে নিবিড়ভাবে প্রাকৃতেই পাওয়া যায়।" (শব্দ-প্রসঙ্গ) আমরাও বলি সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে অবিকল এইরূপ তারতম্যই বিদ্যমান! সুতরাং প্রাকৃত বাংলা বা চলিত ভাষাই একমাত্র এই যান্ত্রিক যুগের পুঁথির ভাষারূপে প্রচলিত হবার যোগ্য, অবশ্য যদি তার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তার জন্য কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাসনবিধি প্রণয়ন করতে পারা যায়।

অতএব আমাদের অভিমত এই যে—বিশ্ববিদ্যালয় আগে বর্ণ সংক্ষেপ করে নিয়ে, যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জ্জন করে চলিত ভাষার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করুন, কেন না ভাষা একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ না নেওয়া পর্য্যন্ত তার সঠিক ব্যাকরণ গড়া সম্ভব হতে পারে না এবং তার বানান নিরূপণও সহজসাধ্য নয়। এদেশে একজন ষ্ট্যালীন্ বা কামালপাশার উদ্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত সুনীতিবাবুকে তাঁর রোম্যান লিপি চালাবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়েরও 'ধর্ম' 'কর্ম' প্রভৃতি ততদিন পণ্ড হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

উপন্যাস

মাটির দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩৬)

রাত্রি বারটার পর ইন্দ্রনীলের মোটর এসে থামল।

গেটকিপার গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল, মোটর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে ইন্দ্রনীল নেমে পড়ল।

আজ ঝোঁকের বশে সে বেশ বেশীরকমই মদ খেয়েছিল, —বেশীক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়ানর ক্ষমতা তার ছিল না। কাল বাদে পরশু দিন তমসা আর সে এরোপ্লেনে ইংল্যাণ্ড যাবে, আজ আনন্দ সম্মিলন ছিল তমসার বাড়ীতে।

মোটর থামতেই দু-তিনজন চাকর ছুটে এসেছিল। তারা ইদানিং তাদের মনিবের প্রকৃতি বেশ জেনেছিল—গাড়ীর শব্দ পেয়েই তাদের প্রস্তুত হতে হয়।

কোনক্রমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরের দরজার সামনে গিয়েই ইন্দ্রনীল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল।

ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা; সেই খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে।

প্রধান চাকর রামটহল ফিস ফিস করে বললে—"মা এসেছেন—"

ইন্দ্রনীল হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল।

সেই মেয়েটি—যাকে সে সেই গ্রামের প্রান্তে দেখেছিল।

স্বপ্ন যে কোনদিন সত্য হতে পারে তা ইন্দ্রনীল জানত না।

বিস্ময়ে সে শুধু বিস্ফারিতচোখে তার পানে চেয়ে রইল, তার নেশা কোথায় উড়ে গেল।

মেয়েটি এগিয়ে এল; শান্ত কণ্ঠে বললে—"এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরে এস—"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"গায়ত্রী—"

মেয়েটি উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, আমিই, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, আমিই এসেছি। তোমার ডাকের প্রত্যাশায় ছিলুম, দেখলুম ডাকলে না—বাধ্য হয়ে নিজেকেই আসতে হল। দেখছি অনেক দেরীতে এসেছি, আরও আগে এলেই ভাল হত। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক, তুমি এস।"

নিজেই এগিয়ে এসে সে ইন্দ্রনীলের হাত ধরলে—চাকরদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললে—"যাও, তোমরা শোও গিয়ে। আমি যখন এসেছি, আর তোমাদের এ সব দিক দেখতে হবে না।"

ইন্দ্রনীলকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে বিছানায় বসিয়ে দিলে—জিজ্ঞাসা করলে—"খাওয়া হয়েছে?"

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইন্দ্রনীল ভুলে গেল, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললে—"কিন্তু সত্যই আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে তুমি নিজেই এসেছ গায়ত্রী—এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর।"

গায়ত্রীর মুখ বড় মলিন, তবু সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—"স্বপ্নও নাকি অনেক সময় সত্য হয়, এও তাই। কিন্তু আজ এ সব কথা থাক, তুমি বড় পরিশ্রান্ত। বিছানায় শুয়ে ঘুমাও, আমি পাশের ঘরে থাকছি—দরকার পড়লে ডেক—"

সে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে—

ব্যগ্রভাবে ইন্দ্রনীল বললে—"একটু দাঁড়াও, তারপরে যেয়ো।"

গায়ত্রী ফিরে দাঁড়াল, বললে—"বল, কি বলবে?"

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে—"এতকাল পরে আজ হঠাৎ আসবার মানেটা কি বুঝতে পারছিনে ত।"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"বোঝাটা এমন কিছু শক্ত নয়। অনেক কথাই কানে গিয়েছিল, সব সয়েছিলুম, কিন্তু যখন শুনলুম অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমেছ, তখন আর থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনীল বললে—"পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কাযটা তখন মনে পড়ল বুঝি?"

গায়ত্রী মুখ উঁচু করলে, বললে—"নিশ্চয়ই, এ কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। এর আগে সৈকতের সম্বন্ধে সব কথাই আমি জানি। রাগে নয়, অভিমানে নয়, কেবল সৈকতর জন্যই আমি আসি নি, পাছে তার কষ্ট হয়। তারপর এও শুনলুম সে চলে গেছে, তুমি আবার একটি মেয়েকে নিয়ে পড়েছ—তার সঙ্গে এরোপ্লেনে বিলেত যাচ্ছ। সইতে পারলুম না, স্ত্রীর কর্ত্তব্য মনে পড়ল—চলে এলুম।"

ইন্দ্রনীল বললে—"কিন্তু আবার যাবে ত—?"

ধীরে ধীরে গায়ত্রী বললে—"সেটা ভেবে দেখব।"

ইন্দ্রনীল বললে—"এই নাস্তিকের কাছে, এই অনাচারের মাঝখানে তুমি থাকতে পারবে কি?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"মনের একাগ্রতায় নাকি সব কিছুই সম্ভব হয়। আমার যদি সেই একাগ্রতা থাকে—অনেক অসাধ্যকেও সুসাধ্য করে তুলব আশা করি।"

সামান্য পল্লীগ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া বেশী জানে না, অথচ মনে হয় যেন এ সবই জানে। এর দৃপ্ত উজ্জ্বল মুখখানার পানে তাকাতে ভয় হয় পাছে এ তাকায়, এর চোখে চোখ মিলে যায়। সে যেন একটা বিরাট লজ্জা, সে লজ্জা রাখার মত জায়গা দুনিয়ায় নেই।

বিছানায় পড়ে ইন্দ্রনীল ভাবছিল তার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কথা।

বিলেত যাওয়ার আগে বাপের জিদে তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল এই গায়ত্রীকে। সামান্য গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, তার বাপ ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর নিজের একটা টোল ছিল, সেখানে অনেক ছেলে পড়াশুনা করত।

এই টোলে সেই সব ছেলেদের সঙ্গে গায়ত্রীও পড়ছিল—ইংরাজী নয়, দেশীয় ভাষা সংস্কৃত।

মেয়েটি ছিল সুন্দরী এবং ছোটবেলা হতে খুব বুদ্ধিমতী; ইন্দ্রনীলের বাপ তাই একেই পছন্দ করলেন। ইন্দ্রনীলের মৃদু আপত্তি টেঁকে নি। বিয়ে না করলে সে বিলেত যেতে পাবে না, সম্পত্তি পাবে না—এসব ভেবে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল।

গায়ত্রী তখন সবে বার তের বৎসরের।

সেইটুকু মেয়ের মধ্যে ইন্দ্রনীল যে প্রখর বুদ্ধির বিকাশ হতে দেখেছিল তাতে সে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ এগার বার বৎসর তারপর অতীত হয়ে গেছে, ইন্দ্রনীল দেশে ফিরেছে, পিতা গত হওয়ায় তাঁর বিপুল সম্পত্তি পেয়েছে, গায়ত্রী কোথায় পড়ে রইল কে জানে? ইন্দ্রনীলের চলার পথে সে একদিনও এসে দাঁড়ায় নি, একটিবার সাড়া দেয় নি সে আছে।

তবু ইন্দ্রনীলের মনের অতি গোপন স্তরে সে ছিল, হয় ত একেবারে মিলিয়ে যায় নি, তাই বহুকাল পরে গ্রামের পথে তাকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েই সে চমকে উঠেছিল; তার নামটা মনে পড়ে গিয়েছিল, সে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর হতে সময় অসময়ে এই মেয়েটির কথা মনে জাগে, ইন্দ্রনীল অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

বিলাসে বিতৃষ্ণা এসেছিল, কোলাহলময় নাগরিক জীবন আর ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল—সে সেই ত্যাগের—নিবৃত্তির মাঝখানে যদি ফিরে যেতে পারে।

স্বপ্নেও সে ভাবে নি—গায়ত্রী আসবে—তার স্বামী বলে দাবি করবে, তাকেই তুলে নিতে চাইবে।

আজ আরও একটা দিক তার মনে পড়ে গেল।

নিজের দিক নয়—গায়ত্রীর দিক।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ঘরের মেয়ে সে, বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার ধার সে ধারে না, এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মাঝখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে, ইন্দ্রনীল তাকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

পদে পদে তার বাধবে, সেই জন্যই তাকে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হবে।

যাক, সেইটাই হবে ইন্দ্রনীলের পরম মুক্তি। সে গায়ত্রীকে সইতে পারবে না, গায়ত্রী তার পক্ষে অসহ্য। গায়ত্রীর মুখের পানে সে চাইতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না। মাঝখানে এত বড় একটা ব্যবধান তুলে ইন্দ্রনীল বাস করতে পারবে না, সে রকম থাকার চেয়ে গায়ত্রীর স্বস্থানে ফিরে যাওয়া ভাল।

মনে ত হয় না সে ফিরবে। সে সব জেনে শুনেই এসেছে—সে হয় ত যাবে না। কিন্তু পরশু মিসেস সিংহের সঙ্গে এরোপ্লেনে বিলেত যাওয়া—

চুলোয় যাক বিলেত যাওয়া—

মিসেস সিংহ ও গায়ত্রী দুজনের কথাই মনে জাগে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষাভিমানিনী উদ্ধতা তমসা—মুক্ত

স্বাধীন মন তার, চলা-ফেরা পান ভোজনে তার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা। একদিন ইন্দ্রনীল ঠিক এমনই একটি মেয়েকে তার সঙ্গিনীরূপে পেতে চেয়েছিল—ঠিক তারই মনের মত, তারই মূর্ত্ত কঙ্কাল। কিন্তু আজ সে চায় না—তার মন অকস্মাৎ তার মানসীর আদর্শ বিচ্যুত হয়েছে।

মনে হয় ওর মধ্যে নিজস্ব কিছু নেই—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি ওর নেই, ও যেন কলের পুতুল, যে যেদিকে টানবে সেইদিকেই হবে ওর গতি।

না, দূর হক—ওর সঙ্গী হয়ে এরোপ্লেনে বিলাত যাওয়ার কল্পনা—ইন্দ্রনীল এবার ঘরে ফিরল। সে এবার হতে শান্ত সমাহিত জীবন ভোগ করবে, নিজেকে আর স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেবে না।

ঘড়িতে টং টং করে তিনটা বাজল।

ইন্দ্রনীল পাশ ফিরে শুলে।

এবার একটু ঘুমান দরকার। কাল তমসা যখন আসবে তখন গায়ত্রীকে দেখতে পাবে, তার পর যখন তার পরিচয় পাবে—

তমসার তখনকার মুখখানা কল্পনা করে ইন্দ্রনীল সেই গভীর রাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

(৩৭)

শান্তভাবে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে থাকতে পারবে ত গায়ত্রী?"

গায়ত্রী তার বড় বড় চোখ দুটির শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার মুখের ওপর রেখে উত্তর দিলে—"পারব। আমি হিন্দুর মেয়ে, ছোটবেলা জ্ঞান ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পেয়েছি স্বামীই দেবতা, তিনি যেখানেই থাকুন—সে জায়গা যত কদর্য্যই হ'ক, স্ত্রীর কাছে তাই স্বর্গ। যত কষ্ট যত দুঃখই হ'ক, যত অত্যাচার যত নির্য্যাতনই হ'ক, স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সবই সয়ে যেতে পারে? তোমার কাছে কেবল এইটুকু বলতে চাই—আমাকে এখান হতে জোর করে সরাবে না। আর তুমি আজ জোর করে সরাতে চাইলেও আমি যে সরব তা ভেব না।"

অত্যন্ত দৃঢ় তার কণ্ঠস্বর—

সে জোর করে নিজের স্থান দখল করেছে—কি জানি কেন—ইন্দ্রনীল তার এই দৃঢ়তা দেখে ভারী খুসী হয়ে উঠল।

এই রকম দৃঢ়মনা একটি মেয়েকেই সে কামনা করেছিল, যে তাকে টেনে ধরে রাখতে পারবে। এই রকম শক্ত মেয়ে ছিল সৈকত, তাকে এতটুকু আলগা হতে দেয় নি, শক্তভাবে টেনে রেখেছিল।

আজ সেই সৈকতের কথাই মনে পড়ে।

সমস্ত অন্তরটা জুড়ে জেগে ওঠে বেদনা—মনে হয় যদি সে থাকত—।

গায়ত্রী খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"সৈকতের খোঁজ নিয়েছিলে কি?"

ইন্দ্রনীল ঠিক এই কথাই ভাবছিল—

হঠাৎ চমকে উঠল, বললে—"না—"

খুব সংক্ষেপে গায়ত্রী বললে—"কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল।"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"ছিল তা আমিও জানি, কিন্তু তারই কথা রেখেছি। সে আমায় বার বার বলেছে আমি যেন তার খোঁজ না করি।"

গায়ত্রী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে—"তার খোঁজ না নিতে পার, কিন্তু তার সন্তানের—? সে ত শুধু মায়েরই নয়, তার বাপেরও বটে।"

ইন্দ্রনীল নীরবে দুই হাতে নিজের মাথার পুরু চুলগুলা টানছিল।

গায়ত্রী বললে—"তার সন্তানের খোঁজ নাও, নিজের কর্ত্তব্যের কথা মনে কর, তাকে আমার কাছে এনে দাও।"

"তোমার কাছে—"

ইন্দ্রনীল যেন আকাশ হতে পড়ল।

গায়ত্রী ধীরকণ্ঠে বললে—"হ্যাঁ, আমার কাছে। আমি তাকে মানুষ করব, তাকে শিক্ষা দেব, তোমার ছেলে বলে জগতে প্রচার করব।"

বড় মলিন এক টুকরা হাসি ইন্দ্রনীলের মুখের ওপর ভেসে উঠল—

"পারবে গায়ত্রী? সে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, সৈকত তার মা—তাকে মেনে নিতে—কোলে টেনে নিতে তুমি পারবে? তোমার মনে এতটুকু বাধবে না—তোমার আচারে—নিষ্ঠায়—"

গায়ত্রী হেসে উঠল—"তুমি আজও তোমার দেশের

মেয়েদের চেন নি, বিলিতি আবহাওয়া তোমায় ওদের দেশের ধাঁজেই গড়ে তুলেছে। দেখ, এ দেশ তোমার নয়। তুমি পুরাতন যুগ হতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত দেখে এস—এ দেশের ছেলেমেয়ের মধ্যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত ঢের দেখতে পাবে। ভোগে সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, তার পরে আসে জ্বালা—তীব্র দাহন। এ দেশের মুনি ঋষিরা নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—এই মহাবাণী প্রচার করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে এ দেশে ত্যাগের দৃষ্টান্ত চলেছে, এখনও—এই পাশ্চাত্যের আবহাওয়ার মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এখনও এমন মেয়ে এ দেশে আছে যারা অনেক অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে একসঙ্গে বাস করে। সৈকত যদি আজ আসে আমি তাকে তার আসন ছেড়ে দিয়ে তার ছেলেটিকে মানুষ করবার ভার নিয়ে থাকব।"

ইন্দ্রনীল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"পারবে গায়ত্রী, সৈকতকে তার জায়গা ছেড়ে দিতে পারবে?"

গায়ত্রী কাছে এগিয়ে এল—ইন্দ্রনীলের পাশে দাঁড়িয়ে তার অবিন্যস্ত চুলগুলা ঠিক করে দিতে দিতে বললে—"কেন পারব না? অত ছোট মন আমার নয়, আমি সৈকতকে চিনেছি তোমায় চেনার মধ্য দিয়ে। সত্য আমি তাকে না দেখেই ভালবেসেছি, নিজের ছোট বোন বলে জেনেছি। আজ যদি সে ফিরে আসে আমি তাকে তার জায়গা ছেড়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হব না।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে সে বললে—"তোমার উচিত তাকে খুঁজে বার করা। সে তোমায় বারণ করলেই তুমি বিরত থাকবে সেটা নিশ্চয়ই উচিত নয়, তোমারই কর্ত্তব্য আছে সেটা মনে করতে হয়?"

এই কথাটাই ঘুরে ফিরে ইন্দ্রনীলের মনে হয়।

সৈকত চলে গেছে, তার চিহ্ন আজও সব কিছুর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে, সে চিহ্ন কেউই মুছতে পারলে না—না তমসা, না গায়ত্রী।

সত্যকার ভালবাসতে পেরেছিল সে সৈকতকে—সেই কাল মেয়েটিকে। তার রূপ ছিল না, তার পরুষ প্রকৃতির জন্য কেউই তাকে পছন্দ করতে পারে নি, একা ইন্দ্রনীলই তাকে পছন্দ করেছিল, তাকে জীবনের সহচারিণী বলে গ্রহণ করেছিল।

সে রাত্রিটা ইন্দ্রনীল মোটেই ঘুমাতে পারে নি।

জানালার ধারে বসে সে তাকিয়েছিল দূরের পানে—কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ অনেক রাত্রে আকাশে ভেসে উঠেছিল, আকাশে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ফুটেছিল দুটি চারটি তারা, অতি ম্লানভাবে তাদের কিরণ ফুটেছিল।

সারা দিনের পর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসটা লাগছিল বেশ সুন্দর।

তমসা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার যাওয়ার অপেক্ষা করেছিল, তারপর পত্র লিখে লোক পাঠিয়েছিল, ইন্দ্রনীল সে পত্রের উত্তরও দেয় নি।

ও ঘরে এক ঘুমের পর গায়ত্রী জেগে উঠেছিল—

আস্তে ভেজান দরজাটা খুলতে সে খোলা জানালার সামনে ইন্দ্রনীলকে দেখতে পেলে।

খুব আস্তে পা টিপে সে এসে তার পাশে দাঁড়ালে—তার কাঁধের ওপর হাতখানা রাখতেই ইন্দ্রনীল চমকে উঠল—

গায়ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে—"রাত অনেক হয়ে গেছে, এখনও বসে রয়েছ যে। এ রকম করে রাত জেগে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে দেখছি।"

ইন্দ্রনীল মাথা নাড়লে, একটু হেসে বললে—"না, অসুখ হবে না। বিছানায় শুয়েছিলুম, ঘুম এল না, সেই জন্যই বসে আছি।"

গায়ত্রী বললে—"তুমি শোও, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেই, ঘুম আসবে এখন।"

ইন্দ্রনীল বললে—"অতটা সুখ আমার সহ্য হবে না গায়ত্রী, পা টিপবার দরকার হবে না। তুমি যাও, আমি এইবার ঘুমাব।"

সে যে একা থাকতে চায়—তা গায়ত্রী বুঝেছিল, বললে—"আমি যাচ্ছি, তোমায় শুতে দেখে তারপর যাব।"

ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল, একটা আড়ামোড়া ছেড়ে বললে—"তুমি যাও, আমার জন্যে অনর্থক রাত জেগ না। আমার এমন রাত জাগা ঢের অভ্যাস আছে—"

গায়ত্রী যেমন ধীরে এসেছিল তেমনই চলে গেল, তার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সকালে ইন্দ্রনীলের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেলা আটটা বেজে গেছে।

আলস্য সে ছাড়তে পারছিল না, বিছানায় চুপ করে পড়ে রইল।

পাশের ঘর হতে গায়ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ ভেসে আসছিল। ভোর বেলায় তার স্নান হয়ে গেছে—স্নানান্তে সে নিজের ঘরে ফিরে এসে পূজা করতে বসেছে।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে মায়ের কথা—

তখন ইন্দ্রনীলের কতই বা বয়স, বোধ হয় পাঁচ ছয় বৎসর হবে। মায়ের চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ে না—সবই যেন ঝাপসা মনে হয়। তবু মনে হয়—এমনই লালপাড় শাড়ীটি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে থাকত, সিঁথিতে এমনই সিঁদুর জ্বলত, কপালের মাঝখানে লাল টিপটা দপ দপ করত। মুখখানার কথা মনে না থাকলেও তাঁকে ঘিরে যে একটি শান্ত শ্রী বিরাজ করত সেটার কথা মনে হয়।

ইন্দ্রনীল দুই হাত কপালে ঠেকালে—

কোন সেই ছোটবেলায় দেখা—আজ স্বপ্নের মত মনে ভেসে ওঠা মাতৃমূর্ত্তিকে স্মরণ করে সে মনে মনে বলছিল—"আশীর্ব্বাদ কর দেবী, যেন পথ না হারাই, তোমায় যেন ভুলে না যাই। জানিনে কোন পথ ভাল—এতদিন যে পথে চলেছিলুম সেই পথ, কিম্বা বর্ত্তমানে যে পথ সামনে জেগে উঠেছে সেই পথ। যে পথে চলেই হোক—আমি যেন এক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, আমি যেন শান্তি পাই।"

গায়ত্রী ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়াল।

শান্ত শ্রী—মায়েরই প্রতিচ্ছবি।

গায়ত্রী এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললে—"তোমার ঘুম বোধ হয় ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি। আজ বাড়ী ঘরগুলা দেখে শুনে ঠিক করে নেব এখন, নিরিবিলি একটা ঘর বেছে নেব পূজার জন্য। কাল নতুন এসে কিছু ঠিক করতে পারি নি, লাভে হতে তোমার বিঘ্ন জন্মিয়েছি।"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"না, বিঘ্ন কিছুই হয় নি গায়ত্রী, আমার ঘুম অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। অনেককাল পরে তোমার মুখে স্তোত্র শুনতে শুনতে আমার মনে অনেক কালের হারান স্মৃতি জেগে উঠল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—"আমার মা যখন মারা যান তখন আমি মাত্র ছয় সাত বছরের, ভাল মনে পড়ে না—তবু আবছা ছায়া মনে জাগে। মনে পড়ে তোমারই মত আমার মা ছিলেন—তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠাই আমার উচ্ছৃঙ্খল বাপকে সৎ করে তুলতে পেরেছিল।"

গায়ত্রী বললে—"আমি সব জানি—সব শুনেছি। ও সব কথা থাক, গুরুজনের কথা না তোলাই ভাল।

উঠে বসে ইন্দ্রনীল বললে—"কিন্তু মায়ের কথা আজ আমার মনে পড়েছে গায়ত্রী, সেই জন্যই আমার বাপের কথা মনে জাগছে। আমার বাপ কি ছিলেন আজও সে গল্প শুনতে পাই—আমার মা তাঁকে ফেরাতে পেরেছিলেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিক লোকটিকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম আস্তিক ত্যাগী মহাপুরুষ রূপে।"

গায়ত্রী বললে—"আশীর্ব্বাদ কর, আমিও যেন সেই রকম হতে পারি, আমার স্বামীকে সৎপথে ফেরাতে পারি, আস্তিক করে তুলতে পারি।"

সে নত হয়ে ইন্দ্রনীলের পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে।

গাঢ়স্বরে ইন্দ্রনীল বললে—"আশীর্ব্বাদের জোর যদি আমার থাকে গায়ত্রী, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।"

(৩৮)

মোটর হতে নেমেই তমসা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আজ সে অনেক কথাই শুনিয়ে দেবে ইন্দ্রনীলকে, সহজে ছাড়বে না। আজই ইংলণ্ডে রওনা হওয়ার দিন, কাল সে সারাদিন একটি বারের জন্য তমসার বাড়ী যায় নি।

সামনেই পড়ল একটি মেয়ে,—

তমসা থতমত খেয়ে দাঁড়াল।

অনুপম সুন্দরী মেয়ে, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। এমন সৌন্দর্য্য তমসা খুব কমই দেখেছে, তবু সে সহজে মেনে নিতে পারলে না। এর সিঁথির সিন্দুর, কপালের মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, হাতের শাঁখা—এমন কি লোহাটাও তার চোখ এড়াল না।

গায়ত্রী অতি সহজেই মেয়েটিকে গ্রহণ করলে, অসঙ্কোচে বললে—"আসুন—"

ভ্রু কুঞ্চিত করে দাম্ভিকা মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত্ত এই মেয়েটির পানে তাকিয়ে রইল, তারপর এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল, একটি কথাও বললে না।

গায়ত্রী তার ভাবটা সহজেই বুঝতে পারলে, তবুও সে বললে—"এ ঘরে বসবার কিছু নেই, ও ঘরে বসবেন চলুন।"

তমসা তার পাশ কাটিয়ে আগেই বার হয়ে পড়ল।

মেয়েটির প্রকৃতি অতি অদ্ভুত—গায়ত্রীর বেশ একটু মজা বোধ হচ্ছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে প্রবেশ করলে।

তমসা একখানা চেয়ারে বসে পড়েছে। টেবিলের ওপর অত্যন্ত পরুষভাবে পা দু-খানা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে একখানা বই তুলে নিচ্ছে।

গায়ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েটিকে সে কিছুতেই অন্তরে গ্রহণ করতে পারছিল না।

তমসা মুখ তুললে—অত্যন্ত কঠিন মুখেই জিজ্ঞাসা করলে—"মিঃ চ্যাটার্জ্জি বাড়ী নেই—?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"না—"

তমসার মুখখানা কাল হয়ে গেল—

জিজ্ঞাসা করলে—"কতক্ষণ বার হয়েছেন, কখন ফিরবেন, কিছু বলেছেন—?"

গায়ত্রী বললে—"এখনই ফিরবেন বলে গেছেন।"

তমসা খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে তার পানে চেয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি মিঃ চ্যাটার্জ্জির কে হও?"

গায়ত্রী একটু হাসলে—বললে—"তাঁর দেশের লোক।"

"ওঃ"—বলে তমসা আবার বইতে মন দিলে।

রামটহল দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—"মা—ভাঁড়ারের চাবিটা—"

আঁচল হতে প্রকাণ্ড বড় চাবির গোছাটা খুলে একটা বড় চাবি দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এই চাবিটা দিয়ে তালা খুলে সব বার করে নাও গিয়ে রামটহল, যা যা লাগবে সব নিয়ো। সাহেবের জন্য মাংস আনিয়ে নিয়ো—তাঁর খাওয়ার যেন ত্রুটি না হয়। তোমরা যদি মাছ খাও—আনিয়ে নিয়ো।"

রামটহল চাবিটা নিয়ে ইতস্ততঃ করে বললে—"আর আপনার—"

একটু হেসে গায়ত্রী বললে—"না বাবা, আমার জন্য কিছু ভাবতে হবে না, কাল আমার যেমন হয়েছে আজও তেমনি হবে।"

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রামটহল বললে—"রোজ অমনি করে হবিষ্যি করবেন মা, ওতে শরীর ভাল থাকবে?"

গায়ত্রী বললে—"খুব থাকবে বাবা, চিরটা কাল এমনি করেই কাটছে ত। আমার জন্য তোমাদের এতটুকু ভাবতে হবে না রামটহল, আমার বাকি দিনটাও এমনি করে কেটে যাবে।"

খুব ক্ষুণ্ণভাবেই রামটহল চলে গেল।

কাল তারা মায়ের খাওয়ার জন্য বিস্তৃত আয়োজন করে ফেলেছিল। বাজারের সেরা তরকারী মাছ সব এনে ফেলেছিল, কিন্তু গায়ত্রী সে সব কিছুই নেয় নি। সে শুধু ভাতে ভাত নিজেই রেঁধে নিয়ে পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করেছিল।

তমসা বই পড়তে পড়তে আড়চোখে গায়ত্রীর পানে চেয়ে দেখছিল।

তার কাছে এ বাড়ীতে এই মেয়েটির অবস্থিতি একেবারে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল। এ বাড়ীতে কিছুতেই মেলে না—না—একে মানায় খাঁটি হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে।

তমসা জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি এখানে নতুন এসেছ বুঝি?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"হ্যাঁ—"

একখানা মোটর থামবার শব্দ হল—গায়ত্রী বললে—"তিনি এসেছেন—গাড়ী এল।"

সে সরে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল।

কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই, কারণ একটু পরেই ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল—

দরজার পর্দ্দাটা সরে যেতে সেখানে ইন্দ্রনীলের সুদীর্ঘ অবয়ব দেখা গেল।

"বেশ বেশ, ভারী খুসী হয়েছি গায়ত্রী, তুমি অভ্যাগতার সম্মান রাখতে জান। মাপ করবেন মিসেস সিংহ, আমায় বিশেষ দরকারে একবার ভবানীপুরে যেতে হয়েছিল, আপনাকে বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে—"

ইন্দ্রনীল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তমসার সামনে টেবিলটার ওধারে বসে পড়ল।

তমসা অভিমানে মুখখানা গম্ভীর করে রাখলে।

গায়ত্রী এগিয়ে এসে বললে—"হ্যাঁ, এসেছেন প্রায় আধ

ঘণ্টা—তুমি এখনই আসছ আসছ করে যেতে পারেন নি। আচ্ছা, তুমি বস, আমি ওদিকে চললুম—কাজ আছে।"

ইন্দ্রনীল তার গমনে বাধা দিলে, বললে—"থাক কাজ, তোমায় এখনই যেতে দেব না গায়ত্রী। এতদিন তুমি না থাকতেও এসব কাজ যেমন করে হয়েছে তেমনই করে আজও হবে। মিসেস সিংহ এসেছেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, কথাবার্ত্তা হোক—"

গায়ত্রীর ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির রেখা জেগে উঠে তখনই মুছে গেল —

সে বললে—"তোমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বল, আমি পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছি, বেশীক্ষণ দেরী হবে না।"

সে বেশ বুঝছিল সে থাকতে তমসার কথাবার্ত্তা বড় বেশী সহজভাবে চলতে পারবে না; সেই জন্যই সে একটা কাজের অছিলা করে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

তমসা হাতের সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললে—"আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হবে, মিঃ চ্যাটার্জ্জি—।"

ইন্দ্রনীল শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললে—"আপনার মতলব কি তাই শুধু জানতে চাই। কোথায় আজ ইউরোপে আমাদের রওনা হওয়ার কথা, সকল লোকে একথা শুনেছে, আর আপনি কি না—"

রাগে দুঃখে তার মুখে আর কথা ফুটল না।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনীল বললে—"যাওয়া হল না, মিসেস সিংহ। কথাটা জানাতে আপনার ওখানে এখনি যাব ঠিক করেছিলুম, সেই জন্যই বাড়ীতে এসেছি গায়ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য। নইলে শেষে বলবেন—আমি সত্যই ফাঁকি দিয়েছি।"

তমসা জিজ্ঞাসা করলে—"ওর সঙ্গে আপনার এমন কি সম্বন্ধ যে ওকে না নিয়ে আপনি যেতে পারেন না?"

ইন্দ্রনীল মুখখানা গম্ভীর করে বললে—"সম্বন্ধ গভীরতর, মিসেস সিংহ, উনি আমার স্ত্রী—মিসেস চ্যাটার্জ্জি বা গায়ত্রী চ্যাটার্জ্জি—"

মিসেস চ্যাটার্জ্জি—

তমসার চোখের সামনে বিশ্ব নামে কিছু যেন নেই—পায়ের তলা হতে পৃথিবী পিছলে চলে যায়।

কতক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর বলে উঠল—"আপনি আমায় পরিহাস করছেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জি—"

ইন্দ্রনীল মাথা দুলিয়ে বললে—"সত্যই পরিহাস নয়, গায়ত্রী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এ বিয়ে কবে হয়েছিল জানেন—আমি বিলেতে যাওয়ার অনেক আগে। আমি ওকে গ্রহণ করি নি; ও নিজের পিত্রালয়ে বড় কষ্টে দিন কাটিয়েছে—অথচ আমার একরাত্রির আনন্দে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এতদিন অস্বীকার করে এসেছি, আজকেও অস্বীকার করতে পারব না, মিসেস সিংহ—কারণ সত্যই আমি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—সংসারে এ রকম-ভাবে একা আমি আর চলতে পারছি নে, তাই কারও পরে ভর দিতে চাই।"

সে তমসার মুখের পানে চাইলে, তমসা তখন অন্যমনস্ক-ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ইন্দ্রনীল বলে চ'লল—"যে পথ বেয়ে চলছিলুম—ক্রমেই তার স্বরূপ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, আমি নিজেই শিউরে উঠছিলুম। আপাত-দৃষ্টিতে দেখে যা হীরা বলে জেনেছিলুম—শেষে দেখলুম সে একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো, বাজারে তার দাম এক কানাকড়িও নয়। মাপ করবেন মিসেস সিংহ, হয় তো অনেক কিছু রূঢ় কথাই আমার মুখ দিয়ে বার হবে। সতীত্ব জিনিসটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনদিন জানতে না চাইলেও আমি কোন-দিন এ রকম মেয়েদের এতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারি নি। এদের মূল্য তাই আমার কাছে—শুধু আমার কাছেই বা বলি কেন—কারও কাছেই নেই। আজ আমি বুঝতে পেরেছি—পথের ধারে বসে যে ভিখারিণী হাতে দুটি লাল সুতা বেঁধে ভিক্ষা চায়, তার মূল্য যা আছে—মোটর হাঁকিয়ে যে সব বিলাসিনীরা চলে যায়, তাদের মূল্য তার শতাংশের একটু নয়। সতীত্ব মেয়েদের মর্য্যাদার তুলাদণ্ড মাপকাঠি—কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে সতীর আসন তাই স্বতন্ত্র, সতী মেয়ে অসাধ্য সাধনও করতে পারে—কথা আছে।"

নিদারুণ অথচ গোপন আঘাতে তমসা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রনীল নূতন করে আর একটা সিগারেট ধরাতে

ধরাতে বললে—"জানেন, মিসেস সিংহ—মানুষ কিসে শান্তি পায়? এই যে এতখানি পথ বেয়ে এসেছি, নিত্য নূতন কামনা আমায় পুড়িয়েছে, সবই পেয়েছি অথচ শান্তি পাই নি, তৃপ্তিও আমার জীবনে মেলেনি। সত্যকার মানুষ যে পাই নি তা নয়, পেয়েছি—পেয়েছি বলেই পেছন ফিরে এক আধবার চেয়েছি, জেনেছি সকলেই উচ্ছৃঙ্খল নয়। বলতে পারেন মিসেস সিংহ, আপনি যে পথে চলেছেন এতে কি পেয়েছেন? নিত্য নূতন জয়ের কল্পনামাত্র, ওতে জ্বালা ছাড়া আর কিছু নেই। সুমিত্রার কথা মনে পড়ে। কাপড় জীর্ণ হয়ে গেলে মানুষ যেমন সেটা ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় পরে, সেও তেমনি পত্যন্তর গ্রহণ করেই চলেছিল, তারপর ভুলটা বুঝলে—কিন্তু অনেক পরে। তবু তার সৌভাগ্য—সে থমকে দাঁড়িয়েছিল—নতুন পথ সে আজ বেছে নিয়েছে। মানুষের জীবনে এমন ক্ষণও আসে মিসেস সিংহ, দানব দেবতা হতে চায়—অন্ততঃ আশাও করে—"

তমসা লাফিয়ে উঠে বললে—"আপনি কি সব বলে যাচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।"

আঙ্গুলে টোকা মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্দ্রনীল বললে—"খুব সোজা কথা মিসেস সিংহ, এমন কিছু শক্ত নয় যা আপনার পক্ষে বোঝা কঠিন হবে। একটা গল্প আছে—একটা শিয়ালের নাকি লেজ কাটা ছিল সে তাই প্রস্তাব করেছিল সকলেরই লেজ কাটা হোক, আমার অবস্থাও ঠিক সেই গোছের। আমার কথা ধরবেন না, পাগলের মত আবোল তাবোল বকে চলেছি, মাথা নেই—মুণ্ড নেই।"

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল—

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—"চা এনে দেবে কি?"

অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে তমসা উঠে দাঁড়াল—"না, না, আমি চা খেয়ে এসেছি, আর কিছু দরকার নেই। আচ্ছা, আজ আসি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আর একদিন দেখা হবে আশা করি।"

ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে—"নিশ্চয়ই—তাতে কোন সন্দেহ নেই; আপনি যে দিনই বলবেন—চাই কি আমি নিজেই যাব।"

তমসা বললে—"আমি আপনাকে জানাব। আচ্ছা নমস্কার—"

তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে চলল—ইন্দ্রনীলও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

গায়ত্রী যে সেখানে উপস্থিত রয়েছে—তমসা যেন সেটা ভুলে গিয়েছিল।

(৩৯)

নির্ম্মল একা চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

উপস্থিত সে বেশ ভাল হয়েই উঠেছে, কোর্টে আবার কাজও করছে।

সম্প্রতি শোনা গেছে ইন্দ্রনীলের স্ত্রী আছে, সে উপস্থিত তার বাড়ীতে এসেছে। সমস্ত লোকের মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠেছে, কেউ কেউ এসে নির্ম্মলকে এ সংবাদটা দিয়ে গেছে।

নির্ম্মলকে এ সংবাদ দেওয়ার কারণ কি, তা নির্ম্মল বেশই জানে—

জেনে শুনেও সে চুপ করে থাকে। কাউকে একটি কথাও বলে নি।

সুবিমল কোথা হতে কথাটা শুনে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বাড়ীতে ফিরেছিল—

"শুনেছ দাদা, রাস্কেলটার কথা? ওর নাকি স্ত্রী আছে, বিলেতে যাওয়ার আগে বিয়ে করে গিয়েছিল। আজ সেই স্ত্রী ফিরে এসেছে তার ঘরে। উঃ, কি বলব—সৈকত আজ উপস্থিত নেই। সে যদি থাকত—ঠিক আমি গিয়ে রাস্কেলটাকে জুতা মারতুম।"

কথাটা সত্য—কেবল সৈকত নেই বলেই ইন্দ্রনীল বেঁচে গেল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একখানা পত্র নির্ম্মলের কাছে যেদিন এসে পড়ল, সেদিন সে উত্তেজিত হয়ে উঠল বড় কম নয়—

"বউমা—বউমা—"

তার ব্যগ্র ডাক শুনে সুব্রতা ছুটে এল!

হাতের পত্রখানা তার হাতে দিয়ে নির্ম্মল বললে—"পড়ে দেখ বউমা, সৈকত আসছে।"

সৈকত—

সুব্রতা অবাক হয়ে গেল।

নির্ম্মল আনন্দ চাপতে পারছিল না—"হ্যাঁ, সৈকত। সে তার বাপের কাছে রয়েছে লিখেছে, তিনিও আসছেন যে।"

সুব্রতা পত্রখানা পড়ে আস্তে আস্তে সেখানা রেখে বার হয়ে গেল।

খুসী হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে খুসী হতে পারলে না। তার বার বার মনে হচ্ছিল—সৈকত না এলেই ভাল হ'ত। সে এলেই সকলে ইন্দ্রনীলের সম্বন্ধে কত কথা তাকে বলবে, সে সব শোনার চেয়ে তার না আসাই উচিত।

কেউ ত তার মুখ চেয়ে কথা বলবে না। মানুষ চায় নিজের খুসীর খেয়ালে চলতে, সেই জন্য অনেক সময় নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েও তারা আনন্দ পায়। কার মনে ব্যথা লাগল, না লাগল—কেই বা দেখে, কেই বা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করে?

সুব্রতা তাই মনে মনে কামনা করতে লাগল সৈকত যেন না আসে। সময় থাকলে সে একখানা টেলি করে দিত, কিন্তু সময় যে নেই।

সৈকত সত্যই এসে পড়ল।

কেউ তাকে প্রথমটায় চিনতেই পারে না।

মাথার চুলগুলা পুরুষদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা,—এই ছোট চুলগুলাতে তার মুখের শ্রী একেবারে বদলে দিয়েছে। তার হাত একেবারে খালি—যেমন আগে ছিল। পরণে অত্যন্ত সাদা-সিদা একখানা চুলপাড় ধুতি।

তাকে যেন নিজেদের মধ্যে আর মানিয়ে নেওয়া চলে না, তার চেহারাটাই হয়ে উঠল প্রধান অন্তরায়।

যে হাসিটা তার মুখে জেগে উঠেছিল—সেটাও যেন অত্যন্ত করুণ—বেদনাপূর্ণ বলেই সকলের চোখে ঠেকল। সে বড়দা, মেজদা, বউদি সকলেরই পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে, ওরা কেউ একটা আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

এক মুহূর্ত্তে সবারই চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়টা বছর আগেকার সৈকতের ছবিখানা।

বড়দার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে সৈকত তাঁর মাথার ছোট চুলগুলার মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল—ঠিক চার বছর আগেকার মত।

কেউ জিজ্ঞাসাও করতে পারলে না—সে একা কেন? সকলেই জানত সৈকত আসবে—তার সঙ্গে আসবে ছোট একটি শিশু। সে স্বর্গের দূত, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। ধার্ম্মিক লোকরা হয়ত তাকে মেনে নেবে না—সমাজ তাকে টানবে না, তবু সে থাকবে, সে পৃথিবীর বুকে একটি মানুষ হয়ে বর্ত্তমান থাকবে। হয় ত সে আবর্জ্জনা—তবু এও সত্য—জগতে আবর্জ্জনারও আবশ্যকতা থাকে। সে শেষ অবস্থাতে মাটিতে পর্য্যবেশিত হবে এবং সেই মাটিই পৃথিবীর যেদিন ওজন হবে, সে দিন তাকে গুরুত্ব দেবে।

অন্য সময় এ সন্তানের দরকার না থাক্ লোক গণনায় সময় দরকার, একটি মানুষ বাড়বে। ও যদি না থাকে, একটি কমবে—তাতে গণনার সংখ্যা কম হবে।

কিন্তু কেন সে এল না?

কেউই মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। সত্যই কি সে এসেছিল—এখনও বর্ত্তমান আছে কি? থাকলে সে এখন কোথায়—কার কাছে?

সবারই মনে এই একটি কথাই জাগে, অথচ মুখে কথা ফোটে না।

বড়দার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সৈকত হেসে উঠল—"ওমা, বড়দার মাথার সব চুল যে সাদা হয়ে উঠল—দেখ মেজদা—দেখ বউদি। আর দুদিন বাদে দেখ—সব কদম ফুল হয়ে গেছে। জান বউদি, যেখানে আমরা থাকি সেই ঘরটার পাশে একটা কদম ফুলের গাছ আছে। ফুলগুলা যখন ফোটে, গন্ধটা ভেসে এলেই ঘর ছেড়ে বার হই,—ঠিক যেন বড়দার মাথা। সত্য—সব সাদা দেখায়, বড় চমৎকার।"

চোখ মুদে সে ফোটা কদমের রূপটা মনে এঁকে তোলে।

নির্ম্মল হেসে বললে—"আর অত বর্ণনায় কাজ নেই সৈকত। বয়স হল—চুল কি এখনও কাল হয়ে থাকবে, সাদা আর হবে না? হিসেব করে দেখ দেখি—কত বয়স হল—?"

সৈকত মহা কোলাহল তুললে—"বাঃ, কতই বা আর বয়েস হয়েছে যে তাতে তোমার মাথার চুল কদমফুল হয়ে যাবে? নিজেকে বুড়া ভেবে ভেবে সত্য তুমি বুড়া হয়ে গেলে বড়দা, এর নাম অকালবার্দ্ধক্য। আজ পিসীমা থাকলে সত্য মাথা ভেঙ্গে মরতেন—তোমার এ রকম অবস্থা দেখে।"

নির্ম্মল বললে—"সত্য—কপাল ভাল যে তিনি নেই।"

সৈকত সুব্রতার দিকে চাইলে—"বাবা, কারও মুখে একটি কথা নেই—সংয়ের মত কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে রয়েছে দেখ। বউদি না হয় পরের মেয়ে, কথা না বললেও

বলতে পারে, কিন্তু তুমি মেজদা, নিজের ভাই হয়ে তুমিও মুখ বুজে থাকবে?"

সুবিমল হেসে উঠে বললে—"কি বলব তাই যে মনে হচ্ছে না।"

সৈকত বলে উঠল—"চমৎকার, সেটাও তা হলে শিখিয়ে দিতে হবে।"

সুবিমল নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

সুব্রতা বললে—"উত্তর আমিই দিতুম, কিন্তু দেব না; কারণ আগেই তুমি জবাব দিয়ে গেছ—বউদি পরের মেয়ে, ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

সৈকত বলিয়া উঠিল—"অমন কথা আমি বলিনি বউদি, বলুক বড়দা, বলুক মেজদা, আমি সে কথা বলেছি কি না। সত্য মনের এমন অধোগতি হয় নি—যে এই মাত্র একটা কথা বলে তক্ষুণি ভুলে যাব, আমি যা বলেছি সব আমার মনে আছে।"

বড়দা মেজদা হাসছিল—

সুব্রতার হাসিতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ ছিল না। নেহাৎ হাসতে হয় তাই হাসছিল—

সৈকত যেন সেই সৈকতই আছে। মাঝখানে প্রায় সাড়ে চার বছর গেছে, এর প্রতিদিন কি রকম ভাবে এসেছে এবং গেছে—তা কারও অবিদিত নেই। আজ মনে হয় মাঝখানে সে দিনগুলা আসেই নি, বছরগুলা মাঝখানে বাদ চলে গেছে। মনে হয় সৈকত কোথাও যায় নি, সে বরাবর এখানেই রয়েছে; তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নি, সে যেমন তেমনই রয়েছে।

সমস্ত দিনটা তুমুল গোলমালের মধ্যে কেটে গেল। সৈকতের ছুটাছুটি হাসি গল্পের একমুহূর্ত্ত বিরাম নেই—বাড়ীর সকলকে সমস্ত দিনটা সে তন্ময় করে রেখে দিলে।

রাত্রে সকলের খাওয়া মিটে গেল—

নির্ম্মল সৈকতকে লক্ষ্য করে বললে—"আর না, রাত এগারটা বাজল, এবার শুয়ে পড় গিয়ে সৈকত। কাল বিকেলে ত চলে যাবি বলছিস, রাত জাগিস নে আর।"

সৈকত চলে গেল।—

সুব্রতাও শুতে যাওয়ার সময় সৈকতের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে সে ঘরে নেই। সমস্ত ঘরগুলা খুঁজে তাকে যখন দেখতে পাওয়া গেল না তখন সুব্রতা ছাদে গেল।

অন্ধকার ছাদের একটি পাশে চুপ করে বসে আছে সৈকত।

সুব্রতা আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

একটি ছায়ামূর্ত্তির মত বসেছিল সৈকত। একটি অঙ্গও তার নড়ছিল না—বাতাসে তার কাপড়ও নড়াতে পারে নি।

সারাদিন ছলনার মধ্য দিয়ে কেটেছে—এবার শ্রান্তি এসেছে—সৈকত শান্ত প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে—এই তার আসল মূর্ত্তি।—

"সৈকত—"

সুব্রতার ডাকে সে চমকে উঠে ফিরল—

হঠাৎ হেসে উঠে বললে—"বাপ রে, তোমার জ্বালায় কোথাও নিরিবিলি একটু বসবার উপায় নেই বউদি, অমনি এসে ধরেছ।"

তার পাশে বসে পড়ে সুব্রতা গম্ভীরভাবে বললে—"হ্যাঁ, ধরেছি। কিন্তু জোর করে এ হাসি আনবার দরকার নেই সৈকত, কত কষ্টে যে এ হাসিটুকু ফুটাচ্ছ তা তোমার দাদারা বুঝতে না পারুক, আমি বুঝেছি। সৈকত, এর চেয়ে তুমি কাঁদ—তোমার চোখ দিয়ে জল বার হোক—কান্নার চেয়ে ভয়ানক এই হাসিটাকে আমি মোটে সহ্য করতে পারছি নে।"

সৈকত যেন অবাক হয়ে গেল—"কি বলছ বউদি—?"

সুব্রতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"মেয়েরা যত শিগ্‌গীর মেয়েদের বুঝতে পারে সৈকত, এতটা পুরুষে পারে না। তুমি যে সারাদিন হাসি গল্প খেলা নিয়ে রয়েছ, এতে ভাইয়েরা ভুলে যেতে পারে, আমি ভুলতে পারি নে। তুমি বুঝেছ—আমি জেনেছি এটা তোমার বাইরের আবরণ; তোমার ওই হাসির তলায় যে কান্নার স্রোতটা গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, উথলে প্রকাশ হয়ে পড়তে চাচ্ছে, সেটা আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে সৈকত—"

"বউদি—"

সৈকত সত্যই নিজেকে আর সামলাতে পারলে না, সে সামনে নুয়ে পড়তেই সুব্রতা তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সুব্রতা বলতে লাগল—"কতখানি শক্তি থাকলে মানুষ এমন করে বুকের আগুন

চেপে রাখতে পারে, আমি তাই ভাবি ভাই। আজ সারাদিন তাই তোর পানে চাচ্ছি—আর আমার চোখের জল উপচে পড়তে চাচ্ছে। কত কষ্টে যে সামলে রেখেছি তা আমি তোমায় কি করে জানাব, সৈকত। কতবার মনে হয়েছে বলি—এর চেয়ে কাঁদ, সেটা বরং সয়ে নিতে পারব, কিন্তু হাসি একেবারে অসহ্য, তোমার মত অবস্থায় কেউ হাসতে পারে না।"

রুদ্ধকণ্ঠে সৈকত বললে—"সত্য পারে না—সত্য নয়। বউদি, আমি—"

বলতে বলতে সে সুব্রতার বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজে রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল। সুব্রতা নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, সান্ত্বনার কথা একটি বললে না।—

(৪০)

ইন্দ্রনীল একখানা সংবাদপত্র পড়ছিল।

সামনে অর্দ্ধভুক্ত চায়ের কাপটা পড়ে আছে, সংবাদপত্র পড়তে সে তন্ময় হয়ে গেছে।

দরজার উপরে এসে দাঁড়াল সৈকত—

অকস্মাৎ তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইন্দ্রনীল একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল।—

একটু হাসির রেখা সৈকতের মুখে ফুটে উঠল;

ধীর পদে এগিয়ে এসে সে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল—

"আমায় চিনতে পারছ না—আমি সৈকত।"

ইন্দ্রনীলের সহজ জ্ঞান অল্পে অল্পে ফিরে এল, একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—"চিনেছি, তুমি সৈকত, কিন্তু—"

সৈকত বললে—"কেন এসেছি তাই বুঝতে পারছ না, কেমন? কেন এসেছি এ কথা তোমায় বলবার দরকারও আমার নেই, দরকার তোমার স্ত্রীর কাছে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, অনেক প্রশংসার কথা এর মধ্যে আমার কানে গেছে, তাঁকে একবার দেখতে পাব কি?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইন্দ্রনীল বললে—"তার কাছে দরকার—আমার কাছে নয়? আমার অপরাধ কি এতই বেশী যে আমায় আজও ক্ষমা করতে পারলে না? একদিন কঠিনহৃদয় বিচারকের মত আমার বিচার করলে, তারপর আমায় একলা ফেলে গভীর রাত্রে—"

সৈকত বাধা দিলে—"থাক থাক, ও সব কথা তুলবার আর দরকার নেই। যা হয়ে গেছে সে সব আর না তোলাই ভাল।"

ইন্দ্রনীল একটা নিঃশ্বাস ফেললে—।

এবার সে ভাল করে সৈকতের পানে চাইলে।

কেবল তার দৈহিক পরিবর্ত্তনই নয়, মনেরও পরিবর্ত্তন যথেষ্ট ঘটেছে, আর তারই ছাপটা ফুটে উঠেছে তার মুখের ওপর।

ইন্দ্রনীল বললে—"আমার কাছে তোমার কথা হতে পারে না, সৈকত?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সৈকত বললে—"না—"

ইন্দ্রনীল গায়ত্রীকে ডেকে পাঠালে—

সৈকত যে মেয়েটিকে পেছনদিককার দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলে, তার মুখের পানে তাকিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় তার মাথা অবনত হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রনীল স্ত্রীকে তার পরিচয় দিয়ে দিলে—"এই সৈকত—আর সৈকত, ইনিই আমার স্ত্রী গায়ত্রী দেবী।"

বিস্ময়ে সৈকত গায়ত্রীর পানে চেয়ে রইল।

এমনও মূর্খ কেউ থাকে যে সুগন্ধ ফুল ফেলে পদদলিত করে নির্গন্ধ শিমূল ফুলের লোভে ছোটে; শীতল জল ফেলে গরম দুর্গন্ধ জলের আশায় ছোটে; এই পবিত্র মূর্ত্তি সুন্দরী স্ত্রী যার, সে কিসের আশায় পথে ঘুরেছে?

কাল রাত্রে সুব্রতার মুখে সৈকত সবই শুনেছে।

গায়ত্রীও নিস্পন্দে কতক্ষণ সৈকতের পানে চেয়েছিল; অনেকক্ষণ পরে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমিই সৈকত?"

"হ্যাঁ, আমিই সৈকত—দিদিমণি—"

সে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই গায়ত্রী তাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলে—

"থাক, প্রণামটা আজ না হয় নাই হল, আর একদিন ওটাকে আদায় করে নেওয়া যাবে। থাকবে ত দিদিমণির কাছে? এসেছ যখন আর সহজে যেতে দিচ্ছি নে মনে রেখ। তোমার যা কিছু সব নাও দেখি, আমায় ছুটি দাও; বাপরে এই সংসারের ফেঁসাদে মানুষ নাকি ইচ্ছে করে

জড়ায়—এই মাস দুইয়েকের জন্যই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে বাপু।"

"আমার সংসার—"

সৈকত হেসে উঠল—"কি যে বলেন দিদিমণি, তার ঠিক নেই। না, না, ও সব মতলব ছেড়ে দিন, আমি এসেছি একটা মতলব নিয়ে, সে দরকার আপনারই কাছে। বলুন—আমার একটা কথা রাখবেন?"

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে গায়ত্রী বললে—"আমার কাছে দরকার? কি দরকার বল দেখি?"

সৈকত বললে—"আমি আজ বম্বে মেলে বিলেত রওনা হচ্ছি। আমার দাদা আমায় নিয়ে যাচ্ছেন—বাঙ্গালী হলেও বাঙ্গালী সমাজে আমার জায়গা হল না। আপনি তো সবই শুনেছেন দিদিমণি, এত বড় একটা কলঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে, তার পরে আর এখানে থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমার দাদা আমার জন্যই চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হচ্ছেন, আমরা দু ভাই বোনে আর ভারতে ফিরব না—"

আর্ত্তকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"সৈকত—"

একবার তার পানে তাকিয়ে গায়ত্রী সৈকতের পানে ফিরলে—

দৃঢ়কণ্ঠে বললে—"কিন্তু তোমার ত যাওয়া হতে পারে না সৈকত। আমি তোমায় যেতে দেব না।"

নির্ব্বাক জিজ্ঞাসুনেত্রে সৈকত তার পানে চাইলে।

গায়ত্রী বললে—"আমি তোমার সকল কলঙ্ক মুছে দেব, আমার স্বামীর ঘরের লক্ষ্মীরূপে তোমায় আমি নিজে বরণ করে নেব।"

সৈকতের চোখে জল আসছিল, কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে হাসলে, বললে—"তা কি হয় দিদিমণি, তাতে কি আমার কলঙ্ক ঢাকা পড়বে?"

গায়ত্রীর চোখ দুটি দৃপ্ত হয়ে উঠল—

"কেন পড়বে না? আমি মেনে নেব সৈকত, আমি দশজনকে ডেকে দেখাব—সৈকত আমার স্বামীর স্ত্রী, আমি নিজে ওকে বরণ করে নিয়েছি।"

কি মহান উদার হৃদয়—

সৈকত বললে—"আমি তা করব কেমন করে দিদিমণি? লোকে যে বলবে চিরদিন বিয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আজ কেবল ওদেরই ভয়ে বিয়েটাকে মেনে নিলুম, তা হতে পারবে না। জনমতকে চিরদিন উপেক্ষা করে এসে আজ নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে পারব না, ওতে আমার অন্তরের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়ে যাবে।"

গায়ত্রী নীরব হয়ে গেল।

সৈকত বললে—"হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে এসেছি, আমার কথা আপনারা ভুলে যান। আমি আজ চলে যাব—জীবনে আর কোনদিন ফিরব না এ কথা ঠিক। আপনাকে একটি জিনিস আমি চিরকালের মত দিয়ে যেতে চাই—"

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"কি—?"

সৈকত উত্তর দিলে—"আমার ছেলে—"

দরজার কাছে সরে গিয়ে সে ডাকলে—"লখিয়া, খোকাকে আন—।"

আয়ার কোলে একটি শিশুকে দেখা গেল।

বড় সুন্দর ছেলে—সে যেন ইন্দ্রনীলের দ্বিতীয় প্রতিকৃতি। এক বৎসর মাত্র বয়স হবে—।

সৈকত তাকে দেখিয়ে বললে—"আমায় রাখার চেয়ে এই হতভাগা শিশুকে রাখার সার্থকতা বেশী। একে নামাবার জায়গা কোথাও পেলুম না দিদিমণি, বাবা নেই যে তাঁর কাছে দিয়ে যাব। তখন মনে হল তোমার কথা। আমার গর্ভে জন্মালেও এ তোমার স্বামীর ছেলে—একে তুমি নাও, এর জীবন সার্থকতায় ভরে তোল। আমি জন্মের মত ওকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। ও মা চেনে নি—নিজের কাছে ওকে রাখি নি শুধু এই উদ্দেশ্যে, যদি ওকে কোথাও দিতে পারি।—"

গায়ত্রী শিশুটিকে আয়ার কোল হতে টেনে নিলে, তার বুকের ওপর মাথা দিয়ে সে চুপ করে পড়ে রইল।

গায়ত্রী তার মুখে চুমো দিয়ে ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও, খোকাকে ধর।"

ইন্দ্রনীল হাত বাড়াতেই শিশু তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুই হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর মুখ দিলে।

হতভাগ্য পিতা—

চোখ দুটি তার সজল হয়ে উঠল।—

সৈকত অপলকদৃষ্টিতে চেয়েছিল—

গায়ত্রী তার হাতখানা চেপে ধরে অনুনয়পূর্ণকণ্ঠে বললে—"তুমিও থাক সৈকত—এই ছেলে ফেলে তুমি সেখানে থাকতে পারবে না।"

সৈকত কি ভাবছিল, চমকে উঠে গায়ত্রীর পানে তাকাল—

একটু হেসে বললে—"খুব থাকতে পারব দিদিমণি, বরং শান্তিতে থাকতে পারব। খোকন তার নিজের জায়গা পেয়েছে, সে তার বাপের স্নেহ পেয়েছে, তুমি তাকে ঘৃণা না করে বুকে নিয়েছ। ওর ভবিষ্যতের পানে চেয়েই ওকে ছেড়ে চললুম, আমার বড় দুঃখে সান্ত্বনা হবে এইটাই। তোমরা ওকে দেখ—ওকে মানুষ কর—। কালে সকলেই ভুলে যাবে আমি ওর মা ছিলুম, ও নিজেও জানতে পারবে না। আমার তাতে এতটুকু দুঃখ হবে না দিদিমণি, আমি বহুদূর হতে ভাবব—খোকন তার বাপের নামে পরিচিত হতে পেরেছে।"

তার চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল।—আত্মহারা ইন্দ্রনীল ডাকলে—"সৈকত—"

"না, আর ডেক না, আমার সময় হয়েছে। বাইরে দাদা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রেনের আর দেরী নেই। চললুম দিদিমণি, খোকনকে দেখ—কেউ যেন না বলে আমি ওর মা ছিলুম।—"

একটিবার ছেলের মুখের পানে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে সৈকত বার হয়ে পড়ল।

কেউ যদি তখন মুখ বার করে দেখত—যেতে যেত অসহ্য শোকাবেগে সে চলতে পারছে না, তার পা দু'খানা ভেঙ্গে পড়ছে।

সমাপ্ত

মুন্সেফ-আবিষ্কার

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১

একদিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া নিয়তি,
করিলেন প্রশ্ন এক বিধাতার কাছে,
দেখিয়া যা লাগে তাক্ বলো মহামতি
তোমার সৃষ্টির মধ্যে এমন কী আছে?
মানুষেরা হাসে গায়,
সকলেই খায় দায়,
একইভাবে বন্ধুসনে গল্প করে সবে;
এর মধ্যে আছে বলো আশ্চর্য্য কি তবে?

২

বিধাতা শুনি সে প্রশ্ন হলেন নির্ব্বাক্,
ভাবিলেন গুম্ফ দুটি বুলাইয়া ধীরে,
"তাই ত, কিছুই দেখে লাগে নাকো তাক্,
দেখি সবই সাধারণ এ বিশ্বমন্দিরে;
সকলেই খায় দায়,
সকলেই হাসে গায়,
সকলেই করে গল্প বন্ধুসনে মিশে,
তাইত! এ সত্য কথা—আশ্চর্য্যটা কিসে?"

৩

বিধাতার গুম্ফ ঝুলে গেল ভেবে ভেবে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি চিন্তাকুলমনে
পরিশেষে ডাকিলেন বিশ্বকর্ম্মাদেবে;
প্রণমেন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার চরণে;
কহিলেন "মহাশয়!
আমারে কি আজ্ঞা হয়?
করিতে হইবে পূর্ণ কোন্ মনস্কাম?"
করিলেন বিশ্বকর্ম্মা আবার প্রণাম।

৪

কহেন বিধাতা, "বৎস! সমস্যা কঠিন!
ভাবিয়া দেখেছি আজ শুন দিয়া মন,
তোমার এ বিশ্বসৃষ্টি বিশেষত্বহীন,
তোমার ত বিশ্বতলে সবই সাধারণ;
মানুষ ত আছে যারা,
খায় ও ঘুমায় তারা,
হাসে আর গল্প করে সেই নরগণ;
নেহাইৎ সামান্য যে সে! অতি সাধারণ।

৫

"করেছিলে সৃষ্টি বটে তিলোত্তমা নারী
অত্যদ্ভুত। কিন্তু সে ত বহুদিন গত;
সৃষ্টি করো সবিশেষ কোনও গুণধারী
নররূপী জীব দেখি কিছু তার মত,
যারা আছে বসুধায়,
সকলেই খায় দায়
সকলেই হাসে গায়—এই বার্ত্তা শুনি'
সৃষ্টি করো ধরা মাঝে অন্যরূপ গুণী।"

৬

"তাইত!" বলিয়া দেব বিশ্বকর্ম্মা ক্রমে
রহিলেন মুহূর্ত্তেক স্তিমিত নয়নে;
"হয়েছে"—বলিয়া দেব পুন সসম্ভ্রমে
প্রণমেন দণ্ডবৎ বিধাতৃ চরণে;
"হয়েছে, একটি নয়;
শুন তবে মহাশয়
দেখ তবে যাহা কেহ কখনও দেখে নি;
অজিব নূতনরূপ জীব এক শ্রেণী

৭

"এই বঙ্গদেশ জুড়ি জেলায় জেলায়,
মহকুমা মহকুমা ব্যাপ্ত করি আজ
করিব নূতন সৃষ্টি এক সম্প্রদায়,
নররূপধারী জীব দেখ বিশ্বরাজ!
যারা নাহি খায় দায়,
যারা নাহি হাসে গায়,
যারা নাহি গল্প করে কারো সঙ্গে কভু
করি এ সৃজন নব দেখ তবে প্রভু।

৮

"যে শ্রেণী সৃজিব তারা পুস্তক ঘাঁটিয়া
পাশ করি কোনোরূপে বি, এল্-টি ক্রমে
ফিরিবে বিচারগৃহে শামলা আঁটিয়া
এদিকে ওদিকে নিত্য ব্যর্থ পরিশ্রমে;
নাহি আয় নাহি জমা,
(নাহি কোন মকদ্দমা)
তিনটি বৎসর পরে হইয়া বাহির,
উঠিবে বিচারাসনে সেই সব বীর।

৯

"শামলা ছাড়িয়া তারা শিরে পরি টুপি,
চাপকান পরিবর্ত্তে কোটে গাত্র ঢাকা,
উকীল হইবে ক্রমে বিচারক রূপী—
কীট হবে প্রজাপতি—বাহিরিবে পাখা;
সমরে কাগজ'পরে
ষ্টীল পেন লয়ে করে
নথির সহিত যুদ্ধ করি' দিবারাত,
করিবে অশ্রান্ত তারা মসীরক্তপাত।

১০

"এই শ্রেণী হাসিবে না কাঁদিবে না কেহ
মিশিবে না কারো সঙ্গে। ফিরে নিজঘরে
নিশীথে প্রহর পরে কর্ম্মক্লান্ত দেহ
শুইয়া পড়িবে ভাত ভরিয়া উদরে;
(তার সঙ্গে ডাল থাকে
তা হ'লে কে পায় তাকে?)
যাহা পাবে মাঝে মাঝে করিবে না ব্যয়
যাহা পাবে জমাইবে শুন মহাশয়।

১১

"এই শ্রেণী দেখা হলে ফিরাইবে মুখ;
করিবে না অভ্যর্থনা; কহিবে না কথা;
সদাই ভাবনা, আর সদাই বিমুখ
হুজুরের তুষ্টিলাভে হইলে অন্যথা;
সদাই ভাবনা ভবে
কবে সবজজ হবে
কটা মেয়ে পার হল কটা আছে বাকী—
ভাবিবে একথা নিত্য বসিয়া একাকী।

১২

"ইঁহারা হবেন হিঁদু; গীতা লয়ে হাতে
ভাবিবেন বসে তার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,
কারণ খরচ কম ডাল আর ভাতে
কারণ ঘাড়ের পরে নিজে বাড়ে টিকী
ভক্তি সেবা পূজা যত
সাহেবের পদানত
বিশুষ্ক প্রণাম দেবদেবীর সময়
—কিনা, বিনা পয়সায় যতদূর হয়।

১৩

"এঁদের দিয়াছি আয়—দিই নাই ব্যয় ;
এঁদের দিয়াছি দন্ত—হাসি নাহি তায় ;
এঁদের দিয়াছি কণ্ঠ কথা নাহি কয় ;
দিয়াছি উদর, পেট ভরে নাহি খায় ;
কেবল অঙ্গুলি তার,
করে মাত্র ব্যবহার,
গলদেশে মালা তার দুপয়সা হারে,
শিরোদেশে টিকী তার আপনিই বাড়ে।"

১৪

এই ব'লি' হাতকাটা কুর্ত্তি দিয়া গায়,
পরাইয়া ধুতি হস্ত দেড়েক বহরে,
সৃজিলেন বিশ্বকর্ম্মা নব-সম্প্রদায়,
রাখিলেন খোড়ে, চালে, গ্রামে ও সহরে ;
বলিলেন, "মম আজ
দেখ সৃষ্টি বিশ্বরাজ,
এঁরাই মুন্সেফ, খোঁজো মর্ত্ত ও ত্রিদিব,
বা'র করো দেখি হেন অত্যাশ্চর্য্য জীব।"

১৫

বিশ্বকর্ম্মা নবসৃষ্টি একত্রিত করি
রাখিলেন বিধাতার চরণের তলে,
দেখিয়া বিধাতা আর নিয়তি সুন্দরী
উঠিলেন যুগপৎ "কেয়াবাৎ!" ব'লে ;
"এরা নাহি খায় দায়,
এরা নাহি হাসে গায়,
নরের মতই জীব নরনামধারী ;
কেয়াবাৎ বিশ্বকর্ম্মা! যাই বলিহারী!"

আমাদের রেশিও সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম-এ

ভারতের মুদ্রানীতির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে ১৯২৭ সালে হিল্টন-ইয়ং কমিশনের প্রস্তাবমত রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করা হয়। ১ শিলিং ৬ পেনির স্বর্ণমূল্য প্রায় ৮·৪৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ। এই হারে ভারত গভর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান এবং স্বর্ণথানের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ১৯৩১ সালে এই মুদ্রা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই বৎসরের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে। এই জন্য ইংলণ্ডের পাউণ্ড নোট অথবা ষ্টার্লিংয়ের এখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিই আছে এবং এর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এই হারে গভর্ণমেণ্ট এবং ১৯৩৪ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—টাকা বা ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে। ফল কথা এই যে—আমাদের রৌপ্য মুদ্রাও স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং টাকার সহিত ষ্টার্লিংয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার আছে বলিয়া এই মুদ্রা-ব্যবস্থা "ষ্টার্লিং একস্‌চেঞ্জ ষ্টাণ্ডার্ড" নামে অভিহিত হয়।

কিন্তু ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। হিল্টন-ইয়ং কমিশনের সদস্য হিসাবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পারস্পরিক মূল্য বিবেচনা করিলে রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির বেশী হওয়া উচিত নহে এবং ১৯৩১ সালে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যখন বাট্টার হার স্থির রাখা হয় তখন দেশব্যাপী এই রেশিও সমস্যা নিয়া তুমুল তর্কবিতর্ক ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন যে এই বাট্টার হার 'অধিক' এবং ভারতের পক্ষে "অহিতকর"। তাঁহারা "রৌপ্য মুদ্রার

মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে বেশী কম না হইলেও অন্ততঃ ১ শিলিং ৪ পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য" দরবার ও আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধে ১ শিলিং ৬ পেনি বাট্টার হার 'অধিক' এবং 'অহিতকর' কি না এই কথাটা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রারম্ভে একটা মোটা কথা মনে রাখা উচিত। কোন রেশিও বা বাট্টার হার কোন দেশের কৃষি, ব্যবসা বা বাণিজ্যের পক্ষে চিরদিনের জন্য সুবিধাজনক বা অনিষ্টকর হইতে পারে না। বাট্টার হারের সহিত পণ্যের মূল্য, শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদির সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে কাহারও লাভ-ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সামঞ্জস্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাট্টার হার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে হিত বা অহিতকর হইতে পারে।

খুব সোজাভাবে এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বাট্টার হার যদি ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে ক্রমশঃ নামিতে থাকে তাহা হইলে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে পারে। ধরা যাক—বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে ১ শিলিং ৪ পেনিতে নামিয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন ইংরেজ বণিক ভারত হইতে ১২০,০০০ টাকার জিনিষ ক্রয় করে তবে তাহাকে দিতে হইবে ৮,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু পূর্ব্বের বাট্টার হার অনুসারে তাহাকে দিতে হইত ৯,০০০ পাউণ্ড। ভারতীয় বণিক তাহার পণ্যের জন্য ১২০,০০০ টাকাই পাইল। কিন্তু ইংরেজ বণিককে এখন ১,০০০ পাউণ্ড কম দিতে হইতেছে। কথাটা অন্যভাবেও বলা চলে। ভারতের বণিক ইংলণ্ডে মাল রপ্তানী করিয়া রৌপ্য মুদ্রার হিসাবে বেশী পাইবে—যদিও পাউণ্ডের হিসাবে তাহার পণ্যের মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিল। ফলে বিদেশী বাজারে তাহার প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা দৃঢ়তর হইবে, ভারতীয় মাল বিদেশে সস্তায় বিকাইবে এবং আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে।

পক্ষান্তরে আমাদের আমদানী হ্রাস পাইতে পারে। ৩০০ পাউণ্ডের জিনিষ ক্রয় করিলে ভারতের বণিককে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও অনুসারে দিতে হইত ৪,০০০ টাকা। ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও অনুসারে তাহাকে দিতে হইবে ৪,৫০০ টাকা। ইংলণ্ডের বণিক পূর্ব্বের ন্যায় ৩০০ পাউণ্ডই পাইবে। কিন্তু ভারতীয় দেনাদারকে ৫০০ টাকা বেশী দিতে হইবে। ফলে ইংলণ্ড হইতে আমাদের পণ্যের আমদানী হ্রাস পাইতে পারে।

ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে রপ্তানীকারী কিয়ৎ-পরিমাণে লাভবান হইবে। কারণ সে বেশী রৌপ্য মুদ্রা পাইবে এবং তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। অন্যদিকে আমদানীকারী কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভারতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়াতে সে বেশী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া জিনিষ ক্রয় করা সত্ত্বেও উচ্চদরে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

কিন্তু এইভাবে বাট্টার হার চিরদিন রপ্তানীকে সহায়তা এবং আমদানীকে খর্ব্ব করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে ভারতে পণ্যের মূল্য, মজুরদের মজুরী ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে যখন পণ্যের মূল্য, লোকের আয় ইত্যাদি এক ভাবে উঠা-নামা করিবে, তখন আর নূতন বাট্টার হার কাহারও পক্ষে লাভজনক বা ক্ষতিকর হইবে না। পণ্য-প্রস্তুতকারী যেমন বিদেশে তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া বেশী রৌপ্য মুদ্রা পাইবে তেমন তাহাকেও অধিক মজুরী দিতে হইবে এবং অধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে হইবে। আমদানীকারীও যেমন বেশী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বিদেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিবে, তদ্রূপ সে উঁচুদরে ভারতে পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে। সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে ব্যবসাবাণিজ্য আবার পূর্ব্বের ন্যায় নিরুপদ্রবে চলিতে থাকিবে।

এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। ১ শিলিং ৬ পেনির বিরুদ্ধে দুইটি কথা শুনা যায়। প্রথম কথা এই যে—১৯২৭ সালে টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি স্বর্ণ মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে—এক্ষণে টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং মূল্যও অধিক।

প্রথম মতটির স্বপক্ষে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ইংলণ্ডের ও ভারতের পণ্যের মূল্য তালিকা হইতে ষ্টার্লিংয়ের ও টাকার ক্রয়শক্তির পার্থক্য দেখাইয়া অনেকে বলেন যে রৌপ্য-মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দ্ধারণ ঠিক হয় নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতদূর মূল্যবান সেই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। কারণ এই দুই দেশের পণ্য-তালিকা নির্ম্মাণ প্রণালী এক নহে। কাজেই কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেই যে রেশিওকে দায়ী করিতে হইবে—এমন কথা বলা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই

রেশিও গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকার মুদ্রার মার-প্যাঁচ দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া এই রেশিও স্থাপন করা হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট যদি অন্যভাবে মুদ্রানীতি পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও স্থাপিত হইত—এই জাতীয় প্রশ্নগুলি এখন উত্থাপন করার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন হইতেছে এই যে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর সহিত পণ্য-মূল্য, আয়, মজুরী ইত্যাদির সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে কি?

অর্থনীতির পণ্ডিতদের মতে এই সামঞ্জস্য দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। (১) বাট্টার হার কতকাল যাবৎ কার্য্যকরী অবস্থায় আছে? (২) শ্রমজীবীদের মজুরী ইত্যাদির স্থিতি-স্থাপকতা কি প্রকার? (elasticity of the factors of production, especially of the wage rate).

অনেকে জানেন যে বিগত যুদ্ধের সময় ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯১৯ সালে টাকার স্বর্ণ-মূল্য গড়ে ১ শিলিং ৭$\frac{5}{16}$ পেনি পর্য্যন্ত উঠে। ১৯২০ সালে আবার ১ শিলিং ৫$\frac{3}{4}$ পেনিতে নামে। ১৯২১ সালে বাট্টার হার ১ শিলিং ৫$\frac{1}{16}$ পেনিতে নামে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে টাকার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৪ পেনিতে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বাট্টার হার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রেশিও ১ শিলিং ৫$\frac{15}{16}$ পেনি হয় এবং সেই বৎসরের জুন মাসে টাকার স্বর্ণ মূল্য ১ শিলিং ৬$\frac{1}{32}$ পেনিতে দাঁড়ায়।

১৯১৭ সালের মধ্যভাগ হইতেই ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও লোপ পায় এবং এই বাট্টার হার ১৯২৪ সালে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থায়ী হয়। সেই তুলনায় ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও ১৯২৭ সালের পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর কার্য্যকরী অবস্থায় ছিল। এই বিবরণ হইতে বোধ করি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পণ্য-মূল্য, আয় ও মজুরীর ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর সহিত সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।*

দ্বিতীয়তঃ এই কথাটা সকলেরই জানা আছে যে ভারতে Trade union (শ্রমিক-সঙ্ঘ) এখনও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং ইংলণ্ডের শ্রমিকসঙ্ঘগুলির শক্তি ও ক্ষমতার সহিত আমাদের দেশের Trade union গুলির তুলনাই হইতে পারে না। তাই বাট্টার হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকদের মজুরী কমান বোধ করি এদেশে ইংলণ্ড হইতে সহজ। অর্থাৎ এ দেশে বাট্টার হারের এবং শ্রমিকদের বেতনের মধ্যে অনেক পরিমাণে স্বল্প আয়াসে ও সময়ে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে।

এক কথায় আমরা বলিতে চাই যে ১৯২৭ সালে টাকার স্বর্ণ মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করা যায় যে ১৯২৭ সালে রৌপ্যমুদ্রার স্বর্ণ-মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক ধরা হইয়াছিল তাহা হইলেও এ কথা বলা চলে যে উপরোক্ত কারণ দুইটির জন্য বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান বাট্টার হার—টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং মূল্য—কোন ক্রমেই বেশী হইতে পারে না। কারণ ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিংয়ের স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। টাকার স্বর্ণমূল্য এখন ১ শিলিং ৪ পেনি হইতেও কম।

প্রতিপক্ষের আর একটি যুক্তি-বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গত কয়েক বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অন্যান্য দেনাদার দেশসমূহের (Debtor countries) তুলনায় ভারতের রপ্তানী অধিক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দুর্গতির জন্য দায়ী করেন। কিন্তু এই অনুমান আমাদের অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা বিশেষত্ব সুবিদিত। আমাদের দেশ হইতে যে সব জিনিষ রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে কৃষি-জাত পণ্য ও যে সব জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে শিল্পজাত পণ্যই প্রধান। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য শিল্পজাত পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাট রপ্তানী-বাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্য। ইহার অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাসের কথা মনে করিলেই বিষয়টা বুঝা যায়।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি কথা মনে রাখা উচিত। ইদানীং ভারতের নানা প্রদেশে চিনির কারখানা স্থাপিত হইতেছে। কাপড়ের মিলের সংখ্যাও বাড়িতেছে। এর জন্য বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রমাগত আমদানী হইতেছে। আবার অন্য দেশের তুলনায় আমদানী খর্ব্ব করিবার জন্য ভারতের শুল্ক-প্রাচীর অধিকতর উচ্চ করা হয় নাই। সুতরাং ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং রেশিওকে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাসের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও ভারতের পক্ষে অধিক এবং অহিতকর নহে। তাই বাট্টার হার কমাইবার জন্য এত আন্দোলন ও দরবার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও অনেকদিন যাবৎ কার্য্যকরী অবস্থায় নাই। তথাপি ইহাই যথার্থ বাট্টার হার—এই কথাটা আমাদের নিকট হেঁয়ালীর মত ঠেকে। আমাদের মনে হয় যে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিওর স্বপক্ষে এত উত্তেজনা ও উৎসাহের মূলে রহিয়াছে অর্থ প্রসারণের (currency inflation) আকাঙ্ক্ষা। এই জন্যই বোধ হয় রেশিও প্রশ্ন এখনও সজীব আছে। কিন্তু অর্থ প্রসারণের ফলে মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইয়া আর্থিক জীবন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

* এই সংখ্যাগুলি শ্রদ্ধেয় ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রেশিও সম্বন্ধে একটি বিবৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার বিবৃতি আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৮)

গঙ্গাবতীর ঘরের উৎপাত কম'ল, কিন্তু বাহিরের উৎপাত চল'ল আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মজুরী সঙ্গে আনা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়, গোপনে বাজার সদা করে—আটা, ছাতু, ডাল, তরকারি নিয়ে বাড়ী আসে, স্বামীর ভয়ে একটি পয়সা বাড়ীতে রাখতে চায় না। কানাই অত্যাচারের মাত্রা দিল বাড়িয়ে; সকল ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকে—গঙ্গাবতী এতদিন নীরবে সব সয়েছে, স্বামীর সুমতির জন্য নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছে। পাষাণ দেবতা শুনলে না, তাই নিরুপায় হয়ে দাঁড়াতে হ'ল মাথা তুলে। দৈহিক অত্যাচার কত সইতে পারে! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, হাত পা শিথিল হয়ে পড়ে, কাজ করবার শক্তি, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। কাজ করতে পারে না; মাথা ঘুরে, শরীর ঝিমিয়ে আসে। তাই সেও মাথা তুলে দাঁড়া'ল। কানাই যখন আসে মারধর করতে—সেও রুখে দাঁড়ায়। চরিত্রহীন, লম্পট, দুর্বৃত্ত কানাইএর সে শক্তি নেই, গঙ্গাবতীর মত শক্তিশালিনী রমণীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য শক্তিতে টিঁকে থাকতে পারে না, ভয়ে পালিয়ে যায়। কখন কখন ছুরি থেকে ঢিল ছুঁড়ে পালায়। স্ত্রীর নিকট টাকা পায় না তাই আরম্ভ কর'ল চুরি, একদিন ধরা পড়ে—গে'ল জেলে। ঘরের শত্রু নিষ্কৃতি দিল।

কানাই জেলে যাবার পর থেকে পাড়া-পড়সী ও শ্যামজীর উৎপাত আরও বেড়ে গে'ল। যাদের টাকা আছে তারা দেখায় টাকার লোভ; যাদের যৌবন আছে তারা দেখায় প্রেমের ছলনা; বয়সে ছোট এমন যুবকও বহু ভক্ত জুটে গেছে; এদের প্রেম আরও মারাত্মক; যাদের টাকাকড়িও নেই, রূপযৌবনও নেই—তারা খাটাতে চায় শক্তি। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না, এরা মাঝে মাঝে রাত্তিরে হানা দেয়, তখন গঙ্গাবতীকে লাঠি ধরতে হয়, দুর্বৃত্তদের শাসন করতে হয়। এরা পুরুষ, আস্ফালন করে বিশ্ব-বিজয়ীর মত, নিজেদের জটলার মাঝে গঙ্গাবতীকে খেলার পুতুলের মত করে নাচায়, কিন্তু গঙ্গাবতীর শৌর্য্যে বীর্য্যে মাথা তুলতে পারে না। গঙ্গাবতীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টির নিকট দাঁড়াতে পারে না, গায়ের জোরে কুলিয়ে উঠবার মত শক্তি অল্প লোকের আছে।

পাড়াপড়সীদের গঙ্গাবতী বেশি ভয় পায় না। সে বেশ বুঝতে পারে যতদিন তার দৃঢ়তা শক্তি সামর্থ্য থাকবে ততদিন এরা নিকটেও ঘেঁসতে সাহস পারবে না। যত ভয়

শ্যামজীকে। আগে ধরতে করতে পাওয়া যেত না অথচ গলার কাঁটার মত জড়িয়ে থাকতে চাইত, এখন প্রকাশ্যে আরম্ভ করেছেন। মিলের কাজ-কর্ম্ম ত' ছেড়েই দিয়েছেন, কেবল কুলি-মজুর ঠেঙ্গান। আফিস ঘরে যাওয়া এক রূপ ছেড়ে দিয়েছেন, সর্ব্বদা কুলি-মজুদের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা—বিশেষতঃ যেখানে গঙ্গাবতী কাজ করে। গঙ্গাবতী যখন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যায় তখন শ্যামজী নির্জ্জনে পেলে কুপ্রস্তাব করেন। ফাঁক বুঝে কখনও হাত চেপে ধরেন। দশ বিশ টাকা হাতে গুঁজে দেন। গঙ্গাবতী নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায়। শ্যামজী গঙ্গাবতীকে দেখলেই মুচকি হাসেন, চোখে ঈসারা করেন। চক্ষুলজ্জাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মিলের শিশু-রক্ষাগার উঠিয়ে দিল। কাজ বেড়েছে, জিনিষ পত্তর রাখবার অসুবিধে। কুলিমেয়েরা প্রতিবাদ করলে, কর্ত্তৃপক্ষ কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কুলিরমণীদের অসুবিধে কেউ গ্রাহ্য করলেন না। অনেক কুলিরমণী কাজ ছেড়ে দিল, অন্য সকল কুলি ও কুলিরমণীরা ধর্ম্মঘট করলে। মিল কয়েকদিন বন্ধ রইল। মিলের চারিদিকে পুলিস এল পাহারা দিতে, বিদ্রোহী কুলিদের দমন করতে। গরীব কুলিরা পেটের দায়ে প্রথম সর্ত্ত অনুযায়ী আপোষ করতে রাজি হল, কর্ত্তৃপক্ষ এদের আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। কুলি মজুররা নিরুপায় হয়ে আবার ধীরে ধীরে শান্ত শিষ্ট হয়ে মিলে ঢুকল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গল, কোন লাভ সুবিধে ত' হলই না; নির্য্যাতন আরও বেড়ে গেল। ধর্ম্মঘট করার দরুণ সর্দ্দাররা জেলে গেল, অনেকে চাকরি হারাল।

ধর্ম্মঘট করে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল গঙ্গাবতীর। মেয়ের অসুখ, টাকা পয়সা নেই, মিলের ডাক্তার রোগী দেখবেন না; ওষুধ পত্তর বন্ধ। কেউ এক পয়সা সাহায্য করবে না; নিরুপায় হয়ে গঙ্গাবতী রোজই কাজ করতে যেতে চাইত, পাড়াপড়সীরা জোর করে ধরে রাখে, শ্যামজীর উল্লেখ করে অশ্লীল শ্লেষ বিদ্রূপ করে। যে দিন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রুগ্ন মেয়েকে আফিম্ গোলা দুধ খাইয়ে মিলে গেল কাজ করতে। গিয়ে শুনল তার চাকরি গিয়েছে—কারণ সে নাকি এ ধর্ম্মঘটের নেতা ছিল। উপায় নেই, দু'তিন দিন যাবৎ সে দু'বেলা খেতে পায় নি, ছেলেকে রীতিমত ওষুধ পথ্য দিতে পারে নি। অপমান সয়েও ছেলেকে বাঁচাতে হবে তাই উন্মাদের মত শ্যামজীর শরণাপন্ন হল—না হ'লে অন্য কেউ চাকরি দিতে পারবেন না। যদিও সে বুঝেছিল যে এ একটা ফাঁদ, শ্যামজীর চাল চাতুরী, তবু ফাঁদে পা দিতে হল। যেমন করে হোক সন্তানকে বাঁচাতে হ'বে।

গঙ্গাবতীর বশ্যতায় শ্যামজীর সাহস গেল বেড়ে, অচল মুখ হল সচল, কাম হল প্রেম, সঙ্গে এল যুক্তিতর্ক। গঙ্গাবতী যখন দোষীর মত নতমস্তকে চাকরির জন্য দীনকণ্ঠে প্রার্থনা করলে, তিনি করলেন অভিনয়। প্রথম শাসালেন, তারপর বল্লেন—যার রূপ যৌবন আছে সে কোন দুঃখে, কোন যুক্তিতে অমন কষ্ট করে গতরে খাটে। সে মুখের কথাটি খসালে যে অমন বহু দাস দাসী রাখতে পারে—তিনটি সন্তানকে না খাইয়ে মেরেছে, যা একটি এখনও আছে তাকেও শেষ করবার যোগাড় করেছে, নিজেও মরতে চলছে, কেন? এতগুলি নরহত্যায় কি পাপ হয় না, এর চেয়ে বড় পাপ কি দুনিয়ায় আর আছে। যে সৌভাগ্যকে পদদলিত করে নিজেও ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায় অপরকেও ধ্বংস করে, সে কি নরকেও স্থান পাবে? কানাই চরিত্রহীন, মাতাল, চোর, ডাকাত, নরকের কীটের মত ভয়ঙ্কর—তার আশাও বৃথা—অতএব আর কেন গোঁড়ামীর দোষে মহাসর্ব্বনাশ, মহাপাপ বৃদ্ধি করা? এখনও সময় আছে, যদি সুমতি হয়, একতিল বুদ্ধি থাকে তবে চলে এস, চিরজীবন রাজরাণীর হালে মাথায় তুলে রাখব। তোমায় আমি বড় ভালবাসি, বিশ্বাস ক'র, এ ভালবাসায় ছলনা নেই। যদি কেবল তোমার রূপ দেহ চাইতুম তবে ভালবেসে তোমায় জয় করবার জন্য তপস্যা করতুম না, অন্যান্য যুবতীদের মত জোর জবরদস্তী করতুম।

গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় নি, ভ্রমরীমিত্রতার রূপ সে চেনে, বুঝে। ভ্রমরীমিত্রতা চিনুক, বুঝতে পারুক, সে যে সত্যকার প্রেমও চায় না। স্বামীকে ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, দুরদৃষ্টবশতঃ তা যখন হারিয়েছে তখন সেই স্মৃতি নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। সতীত্বের নিকট প্রেম, সুখ, সমৃদ্ধি, অসীম প্রতিপত্তি, রাজার ঐশ্বর্য্য যে অতি তুচ্ছ। স্বামীকেই যখন প্রকৃত পক্ষে

হারিয়েছে তখন তার মৃত্যুও যে হ'য়ে গেছে। যদি কোলের শিশুটি না থাকত তবে সে পাপ কথা শুনবার পূর্ব্বে মরণ বরণ করতে পারত। আজও তার দেহে এমন শক্তি আছে, মনে এমন বল আছে—যাতে শ্যামজীর মত নরাধমকে এক ঘুসিতে ধরাশায়ী করতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, তাই কোন প্রতিবাদ করলে না, অদম্য ইচ্ছা সত্বেও এক ঘুসি নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে না যে সে নারী—তার সতীত্ব, নারীত্ব খেলার জিনিষ নয়। উপায় নেই, পথ নেই, মুক্তি নেই—অভিশপ্ত শিশুটি যে এখনও কণ্ঠে জড়িয়ে আছে। টাকা চাই, পয়সা চাই। নীরবে, অতি নীরবে হেঁটমুখে সে কাজে চলে যায়; এমন ভাবে চলে গিয়েছিল যেন সে এত বড় সৌভাগ্যের প্রস্তাবে স্বীকৃত—অথচ সম্মতির কোন লক্ষণ এতটুকুও বোঝা যায় নি।

শ্যামজীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী এখন আর রেগে উঠে না, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায় না, চোটপাট করে গায়ের জোর খাটাতে চায় না, কড়া কড়া কথা শোনায় না। মিলের ভেতরে একা কোথাও চলাফেরা করে না, কাজও করে না, কোথাও একা যেতে হলে একা যায় না, একজন সঙ্গী সাথে নিয়ে যায়। শ্যামজীকে প্রাণপণ চায় এড়াতে। মিলে ঢুকতেই গা করে ছম্ ছম্, পা থাকে কাঁপতে; শ্যামজীর সাড়াশব্দ পেলেই গা শিউরে উঠে, সান্নিধ্যে পড়লে মুখ যায় ছাইবর্ণ হয়ে, বুকের রক্ত হয় শীতল—এমন শীতল ও ভারী হয় যেন মস্ত বড় বরফ চাপা দিয়েছে কেউ জোর করে। মনে মনে ভগবানকে ডাকে অতি দীন করুণ ভাষায়।

শ্যামজীর চক্ষুলজ্জার মুখোস পড়ে গেছে, গঙ্গাবতীর ভীতার্ত্ত, শান্ত মুখের ভাবে সাহস সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি ব্যাপার আরম্ভ করেছেন যেন সে রাস্তার পানওয়ালী, পতিতা নারী, বাবুদের মিষ্টি হাসি পাবার জন্য আসর জমিয়ে বসে আছে! হোক না সে দুর্দ্দশাগ্রস্তা, নির্য্যাতিতা গরীব নারী, হোক না সে স্বার্থপর হীন সমাজের পরিত্যক্তা হীনচরিত্র, পাষণ্ড, মাতাল, চোর, জোচ্চোরের স্ত্রী—তবু ত' সে নারী। তার নারীত্ব ত' হীন নয়, তুচ্ছ অবজ্ঞার নয়। সে মূর্খ, অশিক্ষিত নারী বলে কি রোজ শুনতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে সতীত্ব গরিব ও আভিজাত্যহীন নারীদের জন্য নয়। সতীত্বজ্ঞান কুসংস্কার, সমাজের চালাকি ফাঁকি। হোক কুসংস্কার, হোক চালাকি, হোক ফাঁকি—সে পারবে না, অসম্ভব—এর পূর্ব্বে মৃত্যু স্বেচ্ছায় না আসে তবে যেন জোর করে সে মৃত্যুকে আনতে পারে। সতীত্ব হারাতে হলে যদি শ্যামজীর কথামত জ্ঞানী, অভিজাত হওয়া যায়, রাজরাণীর মত ঐশ্বর্য্যশালিনী হওয়া যায়, অসীম ক্ষমতাশালিনী হওয়া যায় তবে সে চায় না, চায় না কিছু সে দুনিয়ার। সে যেন চিরজীবন জন্ম জন্ম ধরে এমনি দুঃখ কষ্টই পায়।

ভাবতে ভাবতে অসীম শক্তি বল জেগে উঠে, অপমান-সূচক কথায় শরীরে আগুন জ্বলে উঠে, হাত দৃঢ়মুষ্টি হয়ে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর হয়, শেষটায় পারে না—শিশু-সন্তানের মরণোন্মুখ ছবি নয়নপথে ভেসে উঠে, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে; উপঢৌকন, কুপ্রস্তাবে গর্জ্জে উঠে না—পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েও থেমে যায়, কাঁপতে কাঁপতে দূরে পালিয়ে যায়। প্রতিশোধ নেবার যে উপায় নেই।

(৯)

মিলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। প্রথম উড়ল ধূলিবালি, চোখ মেলা যায় না, চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে গাদা গাদা রাস্তার হালকা আবর্জ্জনা এসে জড়াচ্ছে। দরজা জানালার কবাট দুম্ দাম্ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, গাছের ডাল পালা, কুঁড়ে ঘর-বাড়ী ধপ্ ধপ্ করে ভেঙ্গে পড়ছে। কেউ রাস্তায় বেরোতে সাহস পেল না। তুফানের বেগও একটু কমল—অমনি ঝপ্ ঝপ্ নামল বাদল। বিশাল সমুদ্র উঠল ক্ষেপে। ক্ষেপা সমুদ্রের মাঝবুক থেকে ধেই-ধেই করে নেচে আসছে পাহাড়ের বিশাল জলের ঝাপটা, ঝপ্ ঝপ্ করে পড়ছে জল। এমনি ভাবে জল পড়ছে যেন শিগ্‌গীর বন্যা হবে।

গঙ্গাবতী গেটের এক কোণে দাঁড়িয়ে ভীতচকিত নয়নে আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবছে। বহু কুলি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়েছে, যারা সে অবকাশ পায় নি, ঝড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না—তারা চিন্তিতমুখে আকাশ পানে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে। জল আর ধরছে না, শিগ্‌গীর ধরবে বলে কোন লক্ষণও বোঝা যাচ্ছে না। এত বৃষ্টিতে যেতেও সাহস পাচ্ছে না, অথচ বৃষ্টি ধরার প্রতীক্ষায় কতক্ষণ বা উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করবে। যুবকরা উস্‌খুস্ করছে। অসহ্য হয়ে উঠলে দশ বার জন দল বেঁধে হল্লা

করতে করতে বাড়ী চলে; এদের দেখাদেখি অন্য দল বের হয়।···

গঙ্গাবতীর বাড়ী যাবার তাড়া সব চেয়ে বেশি। রাত্রি হতে চলল, মেয়েটা হয়ত' জেগে উঠে মাকে খুঁজছে, আর ভয়ে ক্ষুধায় মাকে না পেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে। মেয়ের কথা মনে পড়তেই গঙ্গাবতী চমকে উঠল, মনে বিভীষিকা জেগে উঠল, ভয়ে অমঙ্গল আশঙ্কায় গা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। কি বিষম স্বার্থপর সে! নিজের কষ্ট হবে বলে আরাম করে দাঁড়িয়ে আছে, জলের ছিটে যাতে গায়ে না পড়ে তারই অপেক্ষা করছে। সে কেন প্রতীক্ষা করছে তার প্রকৃত কারণ মনে করে সান্ত্বনা নিলে না, চেষ্টাও করলে না, অভিযোগের ওজর দিলে না, মেয়েকে কষ্ট দিয়ে নিজে সামান্য জলের ভয়ে ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সে জন্য নিজেকে ধীক্কার দিতে লাগল। সে যে এতক্ষণ মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় যায় নি তা মনে করলে না; ভিজে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়বার মত একটা বস্ত্র নেই, যদি অসুখ-বিসুখ হয় তবে যে দুজনকেই অনাহারে মরতে হবে। স্বপক্ষে বলবার তার কিছুই নেই, এ-ত পরের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ নয়। তারই বুকের রক্তে গড়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন একটি মাত্র মেয়ে। সে সন্তানের জন্য সব কিছু হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারে, ভগবানকেও অস্বীকার করতে একটু ইতস্তত করবে না; একটু কুণ্ঠিত হবে না। সন্তানের নিকট নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, তাই ছুটল উন্মাদের মত, কোনদিকে খেয়াল না করে। ঝড়-তুফান অনুভূতির বাইরে, বাধা-বিপত্তি ভাববার সময় নেই, দিশেহারার মত ছুটল, কেবলই ছুটছে।

ঝড়ের হাওয়া থেমে গেছে, টিপ্ টিপ্ করে ছাতুর মত গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণা পড়ছে। আকাশের স্তরে স্তরে মেঘরাশি জমাট বাঁধে নি, সমস্ত আকাশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। আকাশ নিকষ কাল, ধরণী আঁধারে আত্মগোপন করেছে, গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণার সমষ্টিতে ধরণীর অনন্ত আভরণকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছে, তবে দৃষ্টির পথ রুদ্ধ নয়, আশু ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের চিহ্ন নেই। একবারে মুক্ত নয়, সরল নয়—কুটিলও নয়, ভীতিপ্রদও নয়।

গঙ্গাবতী চলেছে। রাস্তার মিটমিটে আলোকে দেখা যাচ্ছে তার শিথিলতা, ক্লান্ততা। অক্ষম দৈহিক শক্তির ওপর মানসিক বলের অত্যাচারের পরিণতি। গঙ্গাবতীর সর্ব্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে, মোটা এলো খোঁপা থেকে অবয়বে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টির জল পড়ছে। পাতলা সাড়ীখানা গায়ে মিশে গেছে, শালুকা (অর্দ্ধ পাঞ্জাবীর মত জামা) ভিজে বুকে জড়িয়ে গেছে। ভেজা শরীরে শীতল বায়ু এসে একটু কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আঁধার রজনীর মেঠো আলোকে গঙ্গাবতীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত রক্তাভ গৌরবর্ণ—দুঃখ-দুর্দ্দশায় এখনও মলিন হয় নি, বিষাদে দারিদ্র্যের পীড়নে যেন আরও রমণীয় আকর্ষণীয় অতুলনীয় সুন্দরী করে তুলেছে শুভ্র গোলাকার মুখখানা। গভীর কাল টানাটানা ভাসাভাসা চোখ দু'টি কি করুণ, কি মিষ্টি, কত সুন্দর—কত যুগের অনন্ত ভাবপ্রবণ ভাষার আধার! হাসি ভুলে গেছে, হাসতে চায় পারে না বিষাদ মুখ আরও বিষাদ-করুণ হয়ে উঠে। সে এত করুণ, এত বিষাদ বলেই বুঝি এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দরী। কুলির মেয়ে, কুলির জায়া কি এত সুন্দরী হ'তে পারে? চার সন্তানের জননী এত রূপসী হয় কি করে? শারীরিক মানসিক এত বিপত্তির পর কি গুণে এত সুন্দরী থাকতে পারে—যার জন্য রাস্তার লোক থমকে যায়, পথিক পথ ভুলে যায়, চিত্রকর তুলিতে রঙ পরায়, বিদেশী আশ্রয় খুঁজে, যাযাবর আস্তানা গাড়ে, ক্রোড়পতিরা মাথা নত করে ধর্ণা দিয়ে পড়ে, লোভ দেখায় মুরজার মত ঐশ্বর্য্যশালিনী করে দিতে, ভদ্রমহিলারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, দুটি কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়, সুন্দরীরা ঈর্ষায় জ্বলে মরে, পদস্থ ভদ্রলোকরা অকারণে কারণ ঘটিয়ে আলাপ করতে চায়।···কি করে এত সুন্দর চিরযৌবন অটুট রূপরস নিয়ে সে দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তার উত্তর এখানে নয়। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন এর রহস্য। হয়ত' সে আকস্মিক, অঘটন, সৃষ্টিকর্ত্তার খামখেয়ালী ভুল; কিন্তু কল্পিতা নয়, অবাস্তব নয়। যাক্ সে কথা—

গঙ্গাবতী বাড়ী যাচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। এক হাঁটু জল শাঁ শাঁ করে চলছে, পদক্ষেপে ছপ্ ছপ্ করে শব্দ হচ্ছে। কর্দ্দমাক্ত জল বৈদ্যুতিক আলোকে যেন টুকরো টুকরো শুভ্র কাঁচের মত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গঙ্গাবতীর কাপড়-চোপড় কাদা জলে

কাল হয়ে গেছে। এলোমেলো জলহাওয়া বড় শীতল, বিশাল সমুদ্রের যেন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। সিক্ত অঙ্গে এক একটা ফুরফুরে হাওয়া দোল দিয়ে যায়—আর শীতে গা থরথরিয়ে কেঁপে উঠে। গঙ্গাবতীর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, শীতে হাত পা কাঁপছে, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে বাজছে, সে শুধু মেয়ের কথা ধ্যান করে এগুচ্ছে। হঠাৎ একখানা বলিষ্ঠ হাত তার কম্পিত হাত চেপে ধরলে। ভয়ে থমকে দাঁড়াল, ভীতাশ্চর্য্যনয়নে সুমুখে দেখল শ্যামজী উত্তপ্ত মরুর পিপাসা নিয়ে নির্নিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন—উঃ! কি ভয়ঙ্কর চাউনি, গঙ্গাবতীর গা শিউরে উঠল। মুহূর্ত্তে নিজকে দৃঢ় করে নিয়ে রুক্ষ কর্কশ স্বরে বললে—"ছিঃ! হাত ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি!"

হাত ছুটাতে পারলে না, মুক্ত করেও দিল না; বাঁধন দৃঢ় অথচ মৃদু।

শ্যামজী প্রাণের আবেগ ঢেলে বল্লেন—"তুমি কি পাষাণী!"

"আঃ! রাস্তার মাঝে কি মাতলামী করছেন, ছাড়ুন হাত।"

"হুঁ! আজ তোমার একটা উত্তর চাই! তুমি কিসের জন্য নিজেও ধ্বংস হচ্ছ, আমায়ও পুড়িয়ে মারছ? সতীত্বের ভয়? কিসের সতীত্ব! তুমি মূর্খ, লেখাপড়া শেখনি তাই সব ফাঁকি জুচ্চুরি ধরতে পার নি। কে তোমার স্বামী, তার কি পরিচয় বা তুমি দিতে পার?"

"ছাড়ুন বলচি—ভালয় ভালয়। আমার মেয়ের বড্ড অসুখ, বাড়ীতে কেউ নেই—"

"তোমার কি এক তিল বুদ্ধি নেই? নিজে নয় সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিলে—কিন্তু সন্তান। এদের হত্যা করবার কি অধিকার আছে তোমার। আজ আর কোন মানা শুনব না। আমার স্ত্রী নেই, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর আসনে বসাব; তোমার মেয়ের জন্য ভয় কর না, বৈগিত্রেয় মেয়েকে আমি নিজের সন্তানের মত দেখব শুধু একবার বল তুমি আমার।"

শ্যামজীর কথা শুনে ও হাব-ভাবে গঙ্গাবতী চঞ্চল হয়ে পড়ল। পাষণ্ডের সঙ্গে তর্ক করে পারবে না—কিন্তু রাহু-গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়াও কঠিন। এরা কুলি-মজুর, অশিক্ষিত, সংস্কারবদ্ধ, কবিতার ধার ধারে না, বুঝালেও বুঝে না, তাই ঔপন্যাসিক প্রেম যুক্তি-তর্ক শুনে ভড়কে যায়। এরা খোলাখুলি কথা বোঝে, জানে, উত্তরও দেয়—এদিক, কি ওদিক। যে ধরা দেবার সে ধরা দেয় লোভে বা মোহে পড়ে; কেউ বা অবস্থায় পড়ে ধরা দিতে বাধ্য হয়, কেউ আবার লোভ, মোহ, বাধ্যতামূলক অবস্থায় পড়েও ধরা দেয় না, ধরা দেবার পূর্ব্বে জীবন বিসর্জ্জন দেয় বা অপরকে খুন করে নিজের গরিমা রক্ষাও করে।···গঙ্গাবতী কোন উত্তর দিলে না, কিই বা উত্তর দিবে। একটি মাত্র উত্তর আছে কিন্তু তা যে কার্য্যত অসম্ভব। সে গরিব দুঃখিনী, নিঃসহায়—কিই বা করতে পারে। সে যা চায়, বলতে চায়—তার পরিণাম যে ভয়ঙ্কর। তার যে কেউ নেই, কেউ যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায় তবে কে তাকে বাঁচাবে, রক্ষা করবে? এ পর্য্যন্ত যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায় নি এই তার ভাগ্য, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের জোর। শ্যামজী যদি জোর করে ধরিয়ে দেন তবে সে কি করতে পারে, কে তাকে দুর্বৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করবে? জীনার স্বামী ছিল, ভাই বোন সবাই ছিল—কিন্তু কেউ কি তাকে রক্ষা করতে পারলে? না দুর্বৃত্তের বিলাসকুঞ্জ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলে? কেউ পারে নি, কুমার সাহেবের অর্থ ও প্রতিপত্তির নিকট আদালতের সূক্ষ্ম বিচার পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। জীনা রূপ যৌবন হারাল, কুমার সাহেব গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। জীনা স্বামী পরিত্যক্তা, সমাজ ত্যক্তা, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছে। কোন প্রতিকার কি হল?

সে ছোটলোকের মেয়ে, খেটে খায়। দৈহিক ও মানসিক অসীম শক্তি সে রাখে। ইচ্ছে করলে শ্যামজীকে দু'তিন ঘুসিতে কাত করে দিতে পারে—হয়ত ডাক্তার ডাকবারও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তার পর? সে কোথায় যাবে? কে তাকে স্থান দেবে? এ বিশ্ব জুড়ে কোথায়ও যে তার স্থান নেই, কাউকে যে সে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করবার যে আর কোন উপায়ও নেই। পোড়া রূপ যৌবন যতদিন পর্য্যন্ত আছে ততদিন যে তার নিষ্কৃতি নেই। একগণ্ডা সন্তানের জননী হল, মিলে গতর খাটাচ্ছে প্রায় সাত বছর যাবৎ—তবু না যায় রূপ, না যায় যৌবন। কিন্তু এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে বা কতকাল। যে হয় রক্ষক সেই সাজে সংহার-কর্ত্তা, যার পায় ক্ষুধা সেই চায় ক্ষুধা মেটাতে।

হঠাৎ কেঁপে উঠল যেন ধরণী, থমকে গেল পশু পক্ষী, ভয়ে চমকে উঠল মানব, বীভৎস রাগিণীতে মথিত হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। জনক মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আর্ত্ত-স্বরে চেঁচাচ্ছে 'বাবা! বা-বা!' বলে, জননী মৃতদেহ সাপটিয়ে ধরে করছে পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ। নীরোগ ছেলে সকাল বেলাও হেসেছিল, খেলনা নিয়ে খেলেছিল, মূক ভাষায় জনকজননীর সঙ্গে সোহাগ আবদার করেছিল। আফিম খাইয়ে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে গিলে চলে যায়, ফিরে এসে আর পেল না। জন্মের ঘুম ঘুমিয়েছে, আর জাগাতে পারছে না। জনক জননী! ঘুম চেয়েছিলে! এবার আর চিন্তা নেই, যুগ যুগান্তর ধরে ঘুমাবে। হায় রে! অভিশপ্ত কুলিমজুর! এমন করেই কি মরতে হয়!

'আমার মেয়ে! আমার সোনার মাণিক!' গঙ্গাবতী উন্মাদিনীর মত ছুটল। শ্যামজী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গঙ্গাবতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, একচুল নড়বার শক্তি নেই। মাতৃত্বের দীপ্তির নিকট চোখ ঝলসে গেল, শক্তি সামর্থ্য কামের অগ্নিদাহ জড় নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়ে গেল।

উন্মাদিনী ছুটেছে, ছুটেছে, কোন হুঁস নেই; শুধু বিভীষিকা—ভয়ঙ্কর অতীব ভয়ঙ্কর—মৃত্যুরাজ বহু পূর্ব্বে এসেছেন, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সে যেতে চায় না, প্রাণপণে মাকে ডাকছে, পারছে না চেঁচাতে, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সে বাড়ী পৌছতে পৌছতে মৃত্যুরাজ চলে গেল, শুধু একটি কথা, শুধু একবারের জন্য দেখতে দিলে না, চলে গেল।...গঙ্গাবতী দৌড়চ্ছে, হাঁপাচ্ছে, পা যেন চলে না, ভীষণ ভারী, দস্তার মত ভারী। পিছল রাস্তায় কতবার পড়ে গেল, কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। এক ধাক্কায় দোর ঠেলে উন্মত্তের মত ভীত রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে চেপে ধরে নিজেই অসহায়ের মত কান্না জুড়ে দিল। নিষ্ঠুরা জননী কি করেই বা প্রবোধ দেবে! এত বড় নির্দ্দয়তার কি কোন ওজুহাত আছে! তিন চার বছরের মেয়ে আজও হাঁটতে পারে না, ভাল করে বসতে পারে না, কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না, রোগে ভুগে ভুগে দড়ির মত শুকিয়ে যাচ্ছে। এত রোগা, এত দুর্ব্বল—তার ওপর সারাদিন খায় নি ভাল করে; কখন দুপুরে একটু বুকের দুধ চুষেছিল—সাত আট ঘণ্টার ক্ষুধায় নিজ্জীব হয়ে গেছে। পেট মেরুদণ্ডের সঙ্গে মিশে গেছে, মুখখানা মুমূর্ষুর মত শুষ্ক পাংশু হয়ে গেছে, বুক শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, আঁধার নির্জ্জন ঘরে ঝড় তুফানের ভয়ে প্রাণের স্পন্দন অনুভূতিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছে—জড় নিস্পন্দ মূক বধির—মরণ কান্নায় গলা ভেঙ্গে গেছে, গোঁ গোঁ করে গোঙানর ক্ষমতাও নেই আর। নির্দ্দয় জননীর কোলখানি পেয়ে কি করে জানাবে তার প্রাণের ভাষা। অন্তর বা কৈ? মাতৃস্তন হ'তে রক্ত চোষকের মত প্রাণপণে মাতার মধু চুষে নিচ্ছে। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায়, ভয়ে আশ মিটিয়ে চোঁ-চোঁ করে দুধ টানতে পারছে না, যেন মরুভূমিতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা পড়ছে টপ্-ট-প্ করে। মাতার ভাষা নেই, সান্ত্বনা নেই—আছে রোদন, বিলাপ—আছে কল্পনাতীত আবেশ। শিশু মূক, বধির, চেতনাবিহীন—আছে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস, যেন দম আটকে যাচ্ছে। ক্রমশঃ

সর্ব্ব-হারা

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ

অবসাদ আসে মোর সর্ব্ব অঙ্গ ছেয়ে।
জগতের রূপ মোরে মুখ-ভঙ্গী করি'
ব্যঙ্গ করে যেন; ঘ্রাণে মোর আসে ধেয়ে
জগতের সুরভি যা' পূতিগন্ধে ভরি'।
যে অমৃত জগতের মজ্জায় মজ্জায়
রুচি নাহি তাহে আর। অঙ্গের চপলা
উন্মাদ আবেগে ক্ষুণ্ণ লজ্জায় লজ্জায়
ফিরে যায় অনাহূত পরশ-বিফলা।
রঙের তুলিকা করে যে সুন্দর আঁকে
তৃণ-পুষ্প-বল্লরী-চারু-মঞ্জী-মঞ্জিমা
প্রাণের প্রাঙ্গণে, গগনের সারা ফাঁকে
লেপি দেয় নির্ণিমেষ নিবিড় নীলিমা,
তূলি গেছে খসি তার; বিপন্ন তন্দ্রিকা
রচিতেছে চারিধারে ধূসর ধূমিকা।

সঙ্গীত

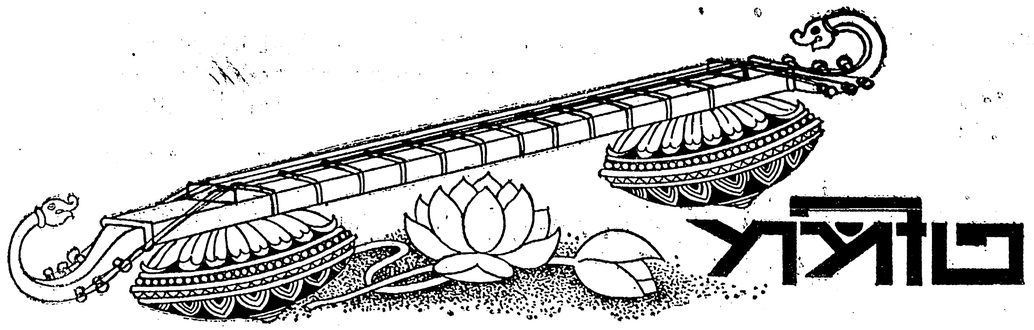

ভীমপলশ্রী মিশ্র—দাদ্রা

আজ যদি গো নীরব রহি।
গানের সুরে ডাকৃতে যদি
আঁখি-ধারা যায় গো বহি॥
ভুল বুঝো না, ওগো প্রিয়,
অঙ্গনে মোর চরণ দিও,
নীরবতার গভীর ভাষায়
শেষ কথা মোর যাব কহি'॥
আমার ঘরের প্রদীপখানি না হয় যদি জ্বালা,
অন্ধকারের অতল তলে গাঁথবো তোমার মালা।
তোমার আসার সে-লগনে,
যদি আমি রই স্বপনে,
মালাখানি নিও তুমি—
তার ব্যথা আর কত সহি?

কথা :—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ   সুর ও স্বরলিপি :—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

II পগা -া মা | গমা -পণা পা I মজ্ঞা -া মজ্ঞা | -া রা সা I
আ জ্ য দি০ ০০ গো নী ০ র ০ ব র

I ররা -ন্া -সা | -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া | রা সা -া I
হি০ ০ ০ ০ ০ ০ গা নে র্ সু রে ০

I সা পা পা | পক্ষা পা -া I পণা ণা ধা | ণা -া -া I
ডা কৃ তে য দি ০ আঁ খি০ ০ধা রা ০ ০

I পণা -র্সর্রা র্সা | ণধা -পদা পা II
যা০ ০য়্ গো ব০ ০০ হি

II { পা -া পা | মধপা মজ্ঞা মা I পা ণা -পা | -পনা র্সা র্সা I
ভু ল্ বু ঝ০০ না ০ ও গো ০ ০ ০ প্রি য়

I র্সা ণর্সা -র্জ্ঞা | র্রা জ্ঞর্সা -া I ণা র্সা ণা | -র্সা -া -া I
অং গ০ ০ ০ নে মো র্ চ র্ ণ ০ ০ ০

[পা পা -দা | দর্রা র্সা -া]
I ণর্সা -ণা -ধা | পা -া -া } I { পা পা -ধা | ণা র্সা -া I
দি০ ০ ০ ও ০ ০ নী র ০ ব তা য়্

I ণা ধা -ণা | ণপা ণা ণদা I পা -া -া | -া -া -া } I
গ ভী ০ র ০ ভা ষা ০ ০ ০ ০ য়্

I পা -া মধপা | মা মগা -া I গা সগা -মপা | মা পা -া II
শে য্ ক০০ থা মো র্ যা ব০ ০ ০ ক হি ০

II সা সা দা | দা দা -া I পা পা -া | পজ্ঞা -গা -জ্ঞা I
আ মা র্ ঘ রে র্ প্র দী প্ খা০ ০ ০

I গা -া -া | -া -া -া I ঋা গা -া | ঋগা -ঋজ্ঞা -গজ্ঞগা I
নি ০ ০ ০ ০ ০ না হ য়্ য০ ০ ০ ০ ০ দি

I গঋা -া -া | সা -া -া I সা -া সা | সন্‌া ধ্‌া -ন্‌া I
জ্বা ০ ০ লা ০ ০ অ ন্ ধ কা রে র্

I সা সমা -া | মা মা -া I মা -া মা | মা মা -া I
অ ত০ ল্ ত লে ০ গাঁ থ্ বো তো মা র্

I মগা -া মা | সা সমা মা I গা -া মা | গমা -পণা পা I
মা০ ০ ০ লা আ মি গাঁ থ্ বো তো০ ০ ০ মার্

I মজ্ঞা মজ্ঞা -া | রা -সা -া I
মা ০ ০ লা ০ ০

I { পা পা -া | মধপা মজ্ঞা -মা I পা -ণা -পা | না র্সা র্সা I
তো মা র্ আ০০ সা র্ সে ০ ০ ল গ নে

I র্সা ণর্সা -র্জ্ঞা | র্রা জ্ঞর্সা -া I ণা -র্সা -ণা | -র্সা -া -া I
য দি০ ০ ০ আ মি ০ র ০ ০ ই ০ ০

[পা পা -দা | দর্রা র্সা -া]
I ণর্সা ণা -ধা | পা -া -া } I { পা পা -ধা | ণা র্সা -া I
স্ব০ প ০ নে ০ ০ মা লা ০ থা নি ০

I ণা -ধা -ণা | ণপা ণা ণদা I পা -া -া | -া -া -া } I
নি ০ ০ ও ০ তু মি ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া মধপা | মা মগা -া I গা সগা -মপা | মা পা -া II II
তা র্ ব্য০০ থা আ র্ ক ত০ ০ ০ স হি ০

নোবেল পুরস্কার

কমলেশ রায়

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানে (Physics) ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে, স্যাড্‌উইক্ (Dr. J. Chadwick) এবং রসায়নে (Chemistry) ইরেণে কুরী ও তাঁহার স্বামী অধ্যাপক জোলিও (Irene Curie, Prof F. Joliot ফরাসী) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নতি অত্যন্ত ধারাবাহিক, এই কারণে স্যাড্‌উইক্ ও জোলিও-দম্পতির আবিষ্কারের কথা প্রথমেই বল্‌তে যাওয়ায় অসুবিধা ঘট্‌তে পারে। এঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'লে পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয় বলা প্রয়োজন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কণাদ এবং কোন কোনও গ্রীক দার্শনিক পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা ক'রেছিলেন। তবে সে মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত বিচার দ্বারা কখনও পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাল্টন (John Dalton) স্বীয় আণবিক মতবাদ বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ডাল্টন এবং পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের মতানুসারে প্রত্যেক বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি, প্রত্যেকটি অণু আবার এক বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের (যথা—হাইড্রোজেন, অঙ্গার, পারদ, লৌহ ইত্যাদি) পরমাণুর আকৃতি, প্রকৃতি, ভার ইত্যাদি বিভিন্ন; পরমাণুগুলি অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

আজ অবধি ৯২টি মৌলিক পদার্থ (Chemical Elements) আবিষ্কার হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সকলের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পরমাণুই জড়পদার্থের চরম অবিভাজ্য অংশ।

কেম্‌ব্রীজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড (Rutherford) দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে পরমাণুই বস্তুর চরম অবিভাজ্য অংশ নয়—প্রত্যেকটি পরমাণু ঋণাত্মক (negative) ও ধনাত্মক (positive) বিদ্যুৎ রেণুর সমষ্টি। ঋণাত্মকগুলি ইলেক্‌ট্রণ, ধনাত্মকগুলি প্রোটন। ইলেক্‌ট্রণ অপেক্ষা প্রোটন প্রায় ১৮৫০ গুণ ভারী, কিন্তু উভয়ের বিদ্যুৎ-পরিমাণ সমান, অবশ্য একটি ঋণাত্মক ও অপরটি ধনাত্মক।

রাদারফোর্ড ও বোরের চিত্র (Rutherford-Bohr model) অনুসারে এক একটি পরমাণুকে প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণের সৌরজগতের মত কল্পনা করা যেতে পারে। এক বা ততোধিক প্রোটনকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রণ প্রচণ্ডবেগে ঘুরে। এক একটি পরমাণুর আয়তন অনুপাতে তা'র কেন্দ্রীয় প্রোটন-সমষ্টি অত্যন্ত ছোট। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থানে সমজাতীয় (ধনাত্মক) প্রোটন থাকায় তা'রা বিকর্ষণ বলে (force of repulsion) ছেড়ে যেতে চায়। কিন্তু কেন্দ্রীণের (nucleus) চারি পাশে একপ্রকার বৈদ্যুতিক বেষ্টনী (potential barrier) থাকায় তা'রা সেটা অতিক্রম ক'রে সহজে নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারে না।

কেন্দ্রীণের মধ্যে অধিকাংশ প্রোটন থাকলেও কতকগুলি ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রণও থাকে এবং উদ্বৃত্ত ধনাত্মক প্রোটনীয় বিদ্যুৎই কোনও পরমাণু কেন্দ্রীণের বিশেষত্ব ; এর উপরেই পরমাণুর তথা মৌলিক পদার্থের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে। যদি কোনও মৌলিক পরমাণুর কেন্দ্রীণের ইলেক্‌ট্রণ বা প্রোটনের সংখ্যা কোনও উপায়ে পরিবর্ত্তন করা যায় তবে সে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হ'বে। এ যেন পুরাণ রসায়নবিদের (alchemist) কথার মত হ'ল। তাঁ'রা চেষ্টা ক'রতেন কি উপায়ে লোহা, তামা ইত্যাদিকে সোনায় পরিণত করা যায় (অবশ্য রাসায়নিক উপায়ে, পরশ পাথরের ছোঁয়ায় নয়)। ডাল্টনের আণবিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সে আশা লুপ্ত হ'ল ; কারণ তাঁদের মতবাদ অনুসারে পরমাণু অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু রাদারফোর্ডের আবিষ্কার ও কেন্দ্রীণ মতবাদের ফলে দেখা যায় সে আশা পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'লেও একেবারে অসাধ্য নয়। পারদ পরমাণুর কেন্দ্রীণ থেকে একটি প্রোটন দূর ক'রে দিতে পারলে বা তামার কেন্দ্রীণে ৫০টি অথবা লোহার কেন্দ্রীণে ৫৩টি প্রোটন বাড়িয়ে দিতে পারলে তা'রা সোনায় পরিণত হ'বে। তবে কেন্দ্রীয় ইলেক্‌ট্রণ বা প্রোটন পরিবর্ত্তন করা মোটেই সহজ কাজ নয়।

হেন্‌রী বেকেরেল ইউরেণীয়াম ধাতু থেকে তিন প্রকার রশ্মি স্বতঃই নির্গত হ'তে লক্ষ্য করেন। নির্গত রশ্মির একাংশ প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হিলিয়াম্ কেন্দ্রীণ (অর্থাৎ ৪টি প্রোটন+২টি ইলেক্‌ট্রণের সংবদ্ধ কণা), এর নাম আল্‌ফা রশ্মি (A-rays)। হিলিয়াম একপ্রকার গ্যাস। বেকেরেল আবিষ্কৃত রশ্মির আর এক অংশ অনুরূপ ধাবমান ইলেক্‌ট্রণ—বিটা রশ্মি (B-rays) ; এবং অপরাংশ রঞ্জন রশ্মি জাতীয় ক্ষুদ্রতরঙ্গ আলোক বিশেষ। আল্‌ফা ও বিটা 'কণিকা' বিশেষ, এ জন্য তা'দের "রশ্মি" বলা যুক্তি-বিরুদ্ধ, তবে শব্দটি সুপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছে। চুম্বকের প্রভাবে রশ্মিত্রয়কে পৃথক করা যায়। মিশ্র রশ্মি পথে চুম্বক শক্তি প্রয়োগ ক'রলে আল্‌ফা ও বিটা কণিকা পরস্পর বিপরীত দিকে ভ্রষ্ট (deflected) হয়, কারণ আল্‌ফা কণিকাগুলি হিলিয়াম কেন্দ্রীয় (ধনাত্মক) ও বিটা রশ্মি ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রণ সমষ্টি। কিন্তু গামা রশ্মি আলোকতরঙ্গ বিশেষ, ধন বা ঋণ বিদ্যুৎকণা নয়, অতএব সে সরলপথেই ধাবিত হয়, চুম্বক প্রভাবে পথ-ভ্রষ্ট হয় না।

ইউরেণীয়াম ভিন্ন হোরিয়াম, একটিনীয়াম বা রেডিয়ামে এইরূপ স্বতঃ বিচ্ছুরণশীলতা তীব্রভাবে দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিকীরণ ধাতুটির কেন্দ্রীণ চূর্ণ হওয়ার ফল। বিচ্ছুরণশীল কেন্দ্রীণ হ'তে এইভাবে অবিশ্রান্ত ইলেক্‌ট্রণ ও হিলিয়াম কেন্দ্রীণ নির্গত হওয়ার ফলে সে ক্রমশঃ নিম্ন শ্রেণীর ধাতুতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেণীয়াম ধাতু অতি ধীরে ধীরে সীসকে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে সকলেই পরমাণুর কেন্দ্রীণের স্বরূপ জানবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। নানা উপায়ে বিধ্বস্ত করে তা'কে পরীক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবন হ'চ্ছে। রেডিয়াম জাতীয় ধাতু নিসৃত আল্‌ফা কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী এবং প্রচণ্ড গতিশক্তিশালী। কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীণকে চূর্ণ ক'রবার একটি প্রধান অস্ত্র এই আল্‌ফা রশ্মি। তবে আল্‌ফা কণিকাগুলি ধনবিদ্যুৎযুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনীতে (Potential barrier) যথেষ্ট বাধা পায়।

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বোদে (Bothe) এবং গাইগের (Geiger) বেরিলীয়াম ধাতুকে আল্‌ফা রশ্মি দ্বারা চূর্ণ (bombard) করতে গিয়ে একপ্রকার অত্যন্ত গভীর ভেদক রশ্মি (highly penetrating rays) আল্‌ফা কণিকা আঘাতপ্রাপ্ত বেরিলীয়াম গাত্র থেকে নির্গত হ'তে লক্ষ্য করেন। বোদে, বেকের, কুরী ও জোলিও ঐ রশ্মি

পরীক্ষা ক'রলেন। তাঁ'রা সকলেই তা'কে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ রশ্মি বলে ভুল ক'রলেন।

রাদারফোর্ডের ছাত্র ও সহকর্ম্মী ডাঃ স্যাড্‌উইক্ দেখালেন এই রশ্মি 'কণিকা' বিশেষ এবং এই কণিকা ধন বা ঋণ বিদ্যুৎকণা নয়—একেবারে বিদ্যুৎশূন্য! এর নাম নিউট্রণ। এর গুরুত্ব প্রোটনের অনুরূপ, উপরন্তু কোনও প্রকার তড়িৎ সংশ্লিষ্ট না থাকায় কোনও কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনী তা'কে বাধা দিতে পারে না। এইজন্য নিউট্রণ সহজেই যে কোনও কেন্দ্রীণের মধ্যে বেগে প্রবেশ ক'রে তা'কে বিধ্বস্ত ক'রতে পারে। স্যাড্‌উইকের এই নিউট্রণ আবিষ্কার ভবিষ্যতে পরমাণু-বিজ্ঞানের কত যে জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রবে সে কথা এখন হয় তো কেউ কল্পনাই ক'রতে পারে না!

রসায়ন শাস্ত্রে ফরাসী অধ্যাপক এফ্ জোলিও ও তাঁ'র পত্নী ইরেণে কুরী-জোলিও "নোবেল পুরস্কার" পেয়েছেন। ইরেণে কুরী মাদাম কুরীর কন্যা। মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পেয়ঁা কুরি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রেডিয়াম আবিষ্কার ক'রে।

জোলিও দম্পতি কৃত্রিম উপায়ে সাধারণ ধাতুতে রেডিয়ামের অনুরূপ বিচ্ছুরণশীলতা (Radio-activity) প্রণোদিত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁ'রা রাদারফোর্ডের পরীক্ষা অনুযায়ী আল্‌ফা রশ্মি আঘাতে বোরণ, ম্যাগ্‌নেসীয়াম ও এলুমিনিয়ামের কেন্দ্রীণ বিধ্বস্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রছিলেন ;—ফলে আঘাত-প্রাপ্ত ধাতু থেকে প্রোটন, নিউট্রণ, গামা রশ্মি ইত্যাদি বহির্গত হ'চ্ছিল। অকস্মাৎ তাঁ'দের মনে হয়—দেখা যাক্ আল্‌ফা রশ্মি সরিয়ে নেওয়ার পরেও ধাতুগাত্র থেকে বিচ্ছুরণ পাওয়া যায় কি না। কি আশ্চর্য্য! সত্যই কিছু-কাল পর্য্যন্ত তা'রা বিকীরণশীল থাকে! এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রণোদিত বিচ্ছুরণশীলতায় রেডিয়াম ইত্যাদির প্রাকৃতিক বিচ্ছুরতার নিয়মসূত্রাদি বর্ত্তমান থাকে। বোরণ ধাতুতে প্রণোদিত বিকীরণশীলতার পরিমাণ অর্দ্ধেকে হ্রাস হ'তে ১৪ মিনিট, ম্যাগ্‌নেসীয়ামের ২·৫ মিনিট এবং এলুমিনিয়ামের ৩·২৫ মিনিট লাগে। প্রাকৃতিক বিচ্ছুরণ-শীল কতগুলি ধাতু অবশ্য এর তুলনায় অনেক বেশী স্থায়ী। রেডিয়ামের অর্দ্ধ হ্রাস কাল (half-value period) ১৬০০ বছর।

জোলিও দম্পতি আল্‌ফা রশ্মি আঘাতে কতকগুলি ধাতুতে বিচ্ছুরণশীলতা প্রণোদিত ক'রতে সর্ব্বপ্রথম সমর্থ হয়েছেন। পরে ফের্ম্মি (Fermi) ও তাঁ'র সহকর্ম্মীগণ নিউট্রণের আঘাতে সকল মৌলিক পদার্থেই সহজে বিচ্ছুরণশীলতা প্রণোদিত ক'রে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা ক'রেছেন। পূর্ব্বে স্যাড্‌উইক্ প্রসঙ্গে নিউট্রণের আবিষ্কারের কথা ব'লেছি ;—নিউট্রণে কোনও প্রকার বিদ্যুৎ না থাকায় সেগুলি অনায়াসে যে কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনী ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারে।

চিত্রগুপ্ত ও তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্য

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

চিত্রগুপ্তের নাম হিন্দুমাত্রেরই চিরপরিচিত। অতি পুরাকাল হইতে এই নাম হিন্দুর শ্রবণ-পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয় এবং সেই প্রতিধ্বনির ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা অজানা কাল্পনিক অনৈসর্গিক ভীতিব্যঞ্জক ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। হিন্দুসভ্যতার কোন স্মরণাতীত যুগে ইহার জন্ম, তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুর্ঘট ; তবে ইহা স্থির যে এই চিত্রগুপ্তের ভীতিব্যঞ্জক কাল্পনিকতার মধ্য দিয়া ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুজাতির যে জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে আজিও যেন বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে—হৃদয় একটা অননুভূতপূর্ব্ব অতীত গরিমায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর ঘূর্ণ্যমান কাল-চক্রনেমির নিষ্ঠুর বিবর্ত্তনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে হয় হিন্দুজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত গৌরব-গরিমামাখা স্বতঃবিকশিত সেই জ্যোতির্ম্ময় অতীত, বর্ত্তমানের স্বপ্ন ;—আর পরপদ-বিমর্দ্দিত পরমুখাপেক্ষী রুদ্ধ অন্ধকারে স্তব্ধ বর্ত্তমান, সেই অতীতের স্বপ্ন। হিন্দু-জাতি যখন যশাদ্রির অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সমস্ত জগতকে তাহার জ্ঞান-জ্যোতির অমোঘ আলোকে উদ্ভাসিত করে,

তখন প্রতীচ্যের উলঙ্গ আমমাংসভোজী যে অসভ্য বন্যজাতি, তদানীং বন্যপশু অপেক্ষা কোনও উচ্চ স্তরের জীব নামে পরিগণিত হইবার যোগ্য ছিল না—হতভাগ্য হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যের ফলে, কালচক্রের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে আজ সেই বন্যজাতির বংশধরগণ স্ফীতবক্ষে এই হিন্দুজাতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বিশ্বজগতে প্রচার করিতেছে যে হিন্দুজাতি মূর্খ—অজ্ঞান—তিমিরান্ধ—অসভ্য !—আর হতভাগ্য আমরা সেই বন্যজাতির মুখাপেক্ষী হইয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষীণ আলোকের আশায়, তাহারই চরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি! নিষ্ঠুর নিয়তির নিষ্পেষণে এই হতভাগ্য হিন্দুজাতির অতীতের গুণ-গরিমা যেরূপভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে, বোধ হয় এই সুবিশাল বিশ্ব-সংসারে অসংখ্য জাতির মধ্যে কোনও জাতির দুর্ভাগ্য তাহাকে অচিন্ত্যপূর্ব্ব অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নিপাতিত করিয়া এমন নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিতে পারে নাই।

প্রথমে আমি চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ও প্রচলিত আখ্যানগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, পরে ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচনান্তর আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রলয়কালে দিবা অথবা রাত্রি, আকাশ অথবা পৃথিবী কিছুরই অস্তিত্ব মাত্র ছিল না; তখন অন্ধকার বা আলোক অথবা অন্য কোনও পদার্থই সৃষ্ট হয় নাই; সমস্তই চিন্তাতীত কল্পনাতীত অনন্ত শূন্য—অনন্ত নাস্তিত্ব, যাহা আজকাল আমরা বিজাতীয় ভাষায় inconceivable nothingness বলিয়া থাকি। বিষ্ণুপুরাণে আমরা এই সত্যই পাই—

"নাহো ন রাত্রির্নভো ন ভূমি
নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

তখন কি ছিল ?—"প্রধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ।"
অর্থাৎ ছিল একমাত্র প্রধানিক ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম।

পদ্মপুরাণেও ঐ কথা—

"সৃষ্টেঃ প্রলয়াদূর্দ্ধং নাসীৎ কিঞ্চিৎ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞমভূদেকং জ্যোতির্ব্বৈ সর্ব্বকারকম্॥
নিত্যং নিরঞ্জনং শান্তং নির্গুণং নিত্যনির্ম্মলম্।
আনন্দস্য পুরং স্বচ্ছং যং কাঙ্ক্ষন্তি মুমুক্ষবঃ॥"

* * * * *

"সর্গকালে তু সংপ্রাপ্তে জ্ঞাত্বা তং জ্ঞানরূপকম্।
আত্মলীনং বিকারঞ্চ তৎ স্রষ্টুমুপচক্রমে॥"

সৃষ্টিপূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে কোনও পদার্থই বিদ্যমান ছিল না। অনন্তর সর্ব্বসৃষ্টিকারক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সমুদ্ভূত হইলেন; তিনি নিত্য, নিরঞ্জন, শান্ত, নির্গুণ, নিত্যনির্ম্মল, আনন্দনিকেতন, স্বচ্ছ; মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মের ধ্যানে নিরত থাকেন। সৃষ্টিকাল সমুপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ ও বিকারগর্ভ জানিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুণ্ডকোপনিষদে প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"

অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা ভুবনপ্রতিপালক ব্রহ্মা দেবতাগণের প্রথমেই প্রাদুর্ভূত হন।

সৃষ্টি-প্রকরণ আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, সুতরাং উহার নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের আলোচ্য চিত্রগুপ্তের সন্ধানে সৃষ্টিতত্ত্বের যতটুকু মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুর মধ্যেই আমাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত আছে যে পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকরণান্তর ধ্যান-নিমগ্ন হইলে, তাঁহার কায় হইতে বিচিত্রবর্ণ বিচিত্রগঠন এক মহাপুরুষ মস্যাধার ও লেখনী হস্তে নিঃসৃত হন। তদনন্তর ব্রহ্মার ধ্যানভগ্নান্তে, তিনি সম্মুখস্থ সেই বিচিত্রগঠন মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ঐ অপূর্ব্বদর্শন মহাপুরুষ সবিনয়ে করপুটে কহিলেন "প্রভো, আমি কি নামে বিশ্বসংসারে পরিচিত হইব কৃপা করিয়া তাহা বলিয়া দিন; আর আমাকে কোনও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমার জন্ম সার্থক করুন।" ব্রহ্মা স্বকায়-সম্ভূত পুরুষের মধুর বচনে পরিতৃপ্ত হইলেন এবং সানন্দচিত্তে বলিলেন—"তুমি আমার কায় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, এই হেতু তুমি 'কায়স্থ' বলিয়া খ্যাত হইবে, আর তোমার নামকরণ হইল 'চিত্রগুপ্ত'। মনুষ্যদিগের পাপপুণ্যের বিচারার্থ তুমি যমপুরে গিয়া বাস কর।" এই বাক্যের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা অনন্তশূন্যে অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি ঐ বিচিত্র মহাপুরুষ 'চিত্রগুপ্ত' নামে বিখ্যাত হইয়া যমরাজের লেখক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-রূপে নিযুক্ত রহিলেন। জীবের জীবনব্যাপী পাপ-পুণ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখাই ইঁহার প্রধান কার্য্য। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে তিনি মনুষ্যের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক; যিনি কর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ রাখিয়া থাকেন তিনি যে কর্ম্মফলানুসারে ভাবী শুভাশুভের ব্যবস্থা করিবেন, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে লিখিত আছে যে যমলোকের সন্নিকটে চিত্রগুপ্তপুর নামে একটি স্বতন্ত্র লোক আছে। তথায় পুণ্যাত্মা কায়স্থগণ তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। অনেকের মতে চিত্রগুপ্ত কায়স্থকুলের আদিপুরুষ; এই নিমিত্ত কোনও কোনও স্থানে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থগণের মধ্যে চিত্রগুপ্তের পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গোমন্তের অর্থাৎ বর্ত্তমান গোয়ার শঙ্খাবলী নাম্নী নদীর সন্নিকটে চিত্রগুপ্তের একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়।

কথিত আছে পুরাকালে সৌদাস নামে এক অতি দুরাচার নৃপতি ছিলেন। তিনি কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা সুসম্পন্ন করিয়া অনন্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। মহাবাহু ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের আরাধনা ও পূজায় ব্রতী হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হ'ন ও তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের প্রসাদেই তিনি ইচ্ছামৃত্যুরূপ অপার্থিব শক্তি লাভ করেন। মহাভারতে অবশ্য আমরা দেবব্রতের ইচ্ছামৃত্যুর অন্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি;—পিতৃভক্ত মহানুভব জিতেন্দ্রিয় শান্তনুনন্দন পিতৃ-সন্তোষবিধানার্থ

যে অমানুষিক স্বার্থত্যাগ ও চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করেন, তাহারই বিনিময়ে তিনি পিতৃ-আশীর্ব্বাদে ইচ্ছামৃত্যু শক্তি লাভ করেন।

বিশ্বকোষে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যরূপ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্র মথনোদ্ভব।"

বিশ্বকোষ সঙ্কলক বলেন যে এই শ্লোক দ্বারা বোধ হয় চিত্রগুপ্ত সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীসহ উত্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এরূপ প্রবাদও কোনও কালে প্রচলিত ছিল;—তবে অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আমরা এরূপ কোনও আখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না। এরূপও সম্ভব যে উহা কোনও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাংশ।

চিত্রগুপ্তের সহিত আলোক-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সেইজন্য চিত্রগুপ্তকে বুঝিবার নিমিত্ত আলোক-বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোক-বিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রতীচ্য জগতে প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডনিবাসী বৈজ্ঞানিক স্নেল্ (Snell) আলোক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এবং আলোকের পরাবৃত্তি, উহার গতি-বিবর্ত্তন ও পূর্ণ প্রতিফলন কি ভাবে সংসাধিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আবিষ্কার করেন। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল, যে স্বতঃই হউক বা পরতঃই হউক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ মাত্রই এক প্রকার দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকারাশি চতুর্দ্দিকে তীব্র বেগে বিকীর্ণ করে এবং ঐ কণিকা চক্ষুষ্মান্ জীবগণের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অক্ষিপটে প্রতিহত হইয়া, অক্ষি-পটস্থ স্নায়ুকোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করে। যেসব এই আলোক-কণিকা-মতাবলম্বীই ছিলেন এবং তাঁহার আবিষ্কার তাঁহার মৃত্যুর পর প্রচার-লাভ করে। বিশ্ববিখ্যাত নিউটন্ যদিও আলোক সম্বন্ধীয় একাধিক ব্যাপার অথবা ঘটনা আলোকের কণিকা-মতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হ'ন নাই, তথাপি তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কণিকা মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মতাবলম্বীগণ আলোকের এই কণিকা-মত অতি বিশদভাবে প্রচারিত করেন; ফলে শতাধিক বৎসর কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে এই ভ্রান্তিমূলক কণিকা মতই অচলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিউটনের নামোল্লেখের সঙ্গে এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে পাশ্চাত্য আলোক-বিজ্ঞানের একটি অতীব মূল্যবান আবিষ্কার—শুভ্রোজ্জ্বল সৌরকিরণরশ্মি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকের একযোগে সমুৎপন্ন। নিউটন্ কলমের ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে সপ্রমাণ করেন যে বেগুনী, নীল, আশমানি, হরিৎ, পীত, অরুণ ও রক্ত এই সপ্তবর্ণের বর্ত্তমান হেতু সূর্য্যকিরণ শুভ্রোজ্জ্বল পরিদৃষ্ট হয়। এই আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (খৃঃ ১৬৭২) সম্পাদিত হয়। অতি সামান্যরূপ পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুজাতি অতিমাত্র কবিতা ও কাব্যালঙ্কার প্রিয়—বেদ পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, এমন কি গণিত-শাস্ত্রে পর্য্যন্ত অজস্র কবিতা ও কাব্যরসের লহরীলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে সূর্য্যের অন্যতম নাম সপ্তসপ্তি ও সপ্তাশ্ব। সপ্তি শব্দের অর্থ ঘোটক। পুরাণকার বলেন—'যে রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করেন, তাহা সপ্ত অশ্ব দ্বারা পরিচালিত' অর্থাৎ একযোগে সপ্ত অশ্বের গতি দ্বারাই সূর্য্যালোকের গতিক্রিয়া সংসাধিত হয়;—যেখানেই সূর্য্যালোক সেই-খানেই তাহার বাহন সপ্তবর্ণ, যেখানে সূর্য্যরশ্মি সেইখানেই সপ্তবর্ণের সমাবেশ।—ইহাই আমাদিগের পৌরাণিক ঋষিবর্গের বৈজ্ঞানিক সত্যের কাব্যালঙ্কার সুশোভন ভাষা। প্রতীচ্যের এ ভাষা বুঝিবার অথবা উপলব্ধি করিবার শক্তিও নাই আর বাসনাও নাই, কারণ তাহা হইলে তাহাদিগের আবিষ্কারের মৌলিকত্ব নষ্ট হইয়া যায়—তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বীকার পাইতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহারা মাত্র সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই জ্ঞান পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই হিন্দুজাতির অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও পাশ্চাত্য জগতে ভ্রান্তিমূলক কণিকা-মত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে গ্রিমাল্ডি (Grimaldi), হুক্ (Hooke) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ আলোকের কম্পনগতি ও উর্ম্মিমত সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। অবশ্য আলোকের বেগ নির্ণয়কল্পে বহু গবেষণা এবং তন্নিরাকরণার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হয়। গ্যালিলিও (Galileo) এই কার্য্যে প্রথম পথপ্রদর্শক। রোমার অর্দ্ধবৎসর ব্যবধানে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ-কাল লক্ষ্য করিয়া আলোকের বেগ নির্দ্ধারণ করেন, পরে উনবিংশ শতাব্দীতে ফুকো (Foucault), ফিজো (Fizeau), ইয়ং (Young) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ উন্নত উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগ নির্ণয় করেন। স্থিরীকৃত হয় যে আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল—মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১ লক্ষ ক্রোশ। নিউটনের কণিকা মতানুসারে নিবিড় পদার্থে প্রবেশকালে আলোক কণিকার ঝোঁক্ বাড়িয়া যায় এবং ফলে নিবিড় পদার্থের মধ্যে আলোকের বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফুকো প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমাণিত করেন যে জলের মধ্যে আলোকের বেগ আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বেগ হ্রাস পাইয়া থাকে। ফুকোর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের আঘাতে কণিকামতের ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। Edwin Edser স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "The fact that light is transmitted more slowly in a highly refracting medium, such as water, than in air or in vacuum, gives us decisive evidence against the corpuscular theory of light. Our only alternative is to seek an explanation of the phenomena of light in terms of wave."

যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রিমাল্ডি এবং হুক্ আলোকের তরঙ্গমতের ইঙ্গিত অল্পাধিক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি পাশ্চাত্য

জগতে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হাইগেন্‌ই প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গমতের আবিষ্কারক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ব্বোক্ত ইয়ং নামক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এবং ফ্রেনেল্ নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক আলোকের এই তরঙ্গ তত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ করেন। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কোনও জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ অথবা অন্য কোনও কারণে যদি দুই সারি তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে ঐ দুই সারি তরঙ্গের মিলন-ক্ষেত্র নিস্তরঙ্গ হয়। একটি তরঙ্গের উর্দ্ধাংশ বা উর্ম্মিশির অপর তরঙ্গের নিম্নাংশ বা উর্ম্মিক্রোড়ের সহিত সম্মিলিত হইলে এইরূপ ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সহজেই বোধগম্য। কম্পন-সংঘাতে বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গের উদ্ভব হইতেই শব্দ-সৃষ্টি; শব্দে শব্দে সম্মিলনে এই ভাবেই নিঃশব্দতার উৎপত্তি হয়। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই এ সত্য বিশেষ ভাবে অবগত আছেন যে কোন বাদ্যযন্ত্রের দুইটি তার এক সুরে বাঁধা না থাকিলে, অর্থাৎ উভয় তারের 'কম্পন-সংখ্যা' ঠিক সমান না হইলে শব্দের বা সুরের স্পষ্ট উত্থান ও পতন পরিলক্ষিত হয়। বায়ুমণ্ডলে দুইটি তার বা দুইটি শব্দকেন্দ্র হইতে উত্থিত শব্দের তরঙ্গগুলির যখন শিরে শিরে অথবা ক্রোড়ে ক্রোড়ে মিলন হয়, তখন তরঙ্গের প্রবলতা ঘটে, ফলে শব্দের উত্থান বা শক্তিবৃদ্ধি অনুভূত হয়; আর যখন একের শির অন্যের ক্রোড়ের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন প্রবলতার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা বা নিঃশব্দতা সংঘটিত হয়। ইয়ং এবং ফ্রেনেল উনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন যে শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা যেরূপ প্রত্যক্ষ ঘটনা, আলোকে আলোকে অন্ধকারও ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ ঘটনা—উভয়ই তরঙ্গসংঘাতগত ব্যাপার।

আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দূরে কোনও শব্দ উত্থিত হইলে, ঐ শব্দ আমাদিগের নিকটে পৌঁছিতে অল্পাধিক সময় লাগে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা ও গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ ফিট্ § অর্থাৎ সহজ হিসাবে প্রায় ১১০০ ফিট্। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আলোকতরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল—এ কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একটি শব্দকেন্দ্র হইতে কোনও ব্যক্তি ১১০০ ফিট্ দূরে অবস্থান করিলে, ঐ কেন্দ্রোত্থিত শব্দতরঙ্গ শব্দোত্থানের মুহূর্ত্ত হইতে ১ সেকেণ্ড পরে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ১ সেকেণ্ড পরে ঐ শব্দ শ্রুত হয়; দূরত্বের পরিমাণ যদি উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা ততোধিক হয়, তাহা হইলে দূরত্বের অনুপাতে ঐ শব্দ যথাক্রমে দুই, তিন, চারি সেকেণ্ড, অথবা ততোধিক কাল পরে শ্রুত হয়; অতএব ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দের অস্তিত্ব বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান থাকে, কেবলমাত্র তাহার অনুভূতি হয় দূরত্বের অনুপাতে। আলোকের ব্যাপারও ঠিক ঐরূপ—পার্থক্যের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গ বায়ু আশ্রয় করিয়া প্রধাবিত হয়, আর আলোক তরঙ্গ প্রধাবিত হয় ব্যোমপথে;—এ পার্থক্য সাধারণের গ্রাহ্যনীয় বিষয় নহে, ইহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয় মাত্র। দর্শনীয় পদার্থ হইতে আলোক-তরঙ্গ সমুত্থিত অথবা প্রতিফলিত হইয়া যখন আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তখন অক্ষিপটে দর্শনীয় পদার্থের চিত্র বা প্রতিচ্ছবি পড়ে এবং ফলে ঐ পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। যদি কোনও চক্ষুষ্মান্ জীব দর্শনীয় পদার্থ হইতে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ দর্শনীয় বস্তু আবির্ভাব হইবার ১ সেকেণ্ড পরে উহার চিত্র ব্যোমপথে তাহার অক্ষিপটে পৌঁছিবে। যদি দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তদনুপাতে কালের পরিমাণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনারা অনেকেই জানেন আলোক সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট ৮ সেকেণ্ড সময় লাগে।

এক্ষণে বোধ হয় সহজেই বোধগম্য হইবে যে হিন্দুজাতির চিত্রগুপ্ত কি। আমরা জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে জীবলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সৎ বা অসৎ, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়, প্রশংসার্হ বা নিন্দার্হ—যে কোনও রূপ কর্ম্ম নিষ্পাদন করি, আলোক-তরঙ্গের সাহায্যে ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে তাহার স্বরূপ চিত্র গুপ্তভাবে রহিয়া যায়। যদি এই ভূলোক-নিবাসীর কর্ম্মাকর্ম্মের চিত্র অবলোকন করিবার নিমিত্ত লোকান্তরে কেহ থাকেন—যদি অনন্তশূন্যে অনন্তকাল কোনও চক্ষুষ্মান্ তাঁহার চিরজাগরিত নেত্রের নির্ণিমেষ দৃষ্টি পাপপুণ্যের লীলাক্ষেত্র এই ভূলোকের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকল কর্ম্মাকর্ম্মের—সকল পাপ-পুণ্যের স্বরূপ চিত্র আলোক-তরঙ্গ ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে সেই অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন চক্ষুষ্মানের চক্ষে পৌঁছাইয়া দিবে। যদি আমাদিগের জীবনের পর—যদি মৃত্যুর পরপারে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, যদি ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে জীবাত্মার গতি অপ্রতিহত থাকে—যদি এই নশ্বর দেহের চক্ষু দুইটি চিরমুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার দৃষ্টিশক্তি চিরজাগ্রত না হয়, তাহা হইলে আমরাই অনন্তশূন্যে ব্যোমপথে দেখিব ইহজগতে আমাদিগের কর্ম্মজীবনের গুপ্ত চিত্র কত হীন—কত ঘৃণিত—কত ভয়ঙ্কর। যদি আত্মার অনুভূতি থাকে, তাহা হইলে হয় তো এই আত্মা অনন্তকাল অনন্তশূন্যে অনন্ত অনুতাপের নীরব হাহাকারে দিগন্ত প্লাবিত করিবে। এক্ষণে সহজেই অনুমেয় যে ইহজগতের কর্ম্মাকর্ম্মের অনন্তশূন্যস্থিত গুপ্তচিত্রই হিন্দুদিগের চিত্রগুপ্ত।

কাহারও কাহারও মনে হয় তো স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি আলোকের সাহায্যেই কর্ম্মাকর্ম্মের স্বরূপ চিত্র আকাশপথে অনন্তশূন্যে রহিয়া যায়, তাহা হইলে নিশীথ অন্ধকারের আবরণে শত অপকর্ম্ম করিয়াও চিত্রগুপ্তের অমোঘ চিত্রাঙ্কনবিদ্যার কঠোরহস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে। প্রশ্নটি আপাতসুন্দর ও মনোরম হইলেও অতি সামান্য চিন্তার সাহায্যেই ইহার সহজ নিরাকরণ সুসিদ্ধ হইতে পারে। তরঙ্গমত ও কম্পনবাদ দ্বারা ইহার সুচারু সমন্বয় হয়, কিন্তু সে জটিল তত্ত্বের অবতারণা করিয়া এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই; যে হেতু অতি সহজ ও সুবোধ

§ ফার্ণহিট্ ৩২° ডিগ্রি উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে শব্দগতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯৩ ফিট।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র তরফদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শক্তির সাহায্যে এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায়। এই পৃথিবীতে কোন বিষয়েই পূর্ণত্বের অভাব। এখানে পূর্ণ অন্ধকার অথবা পূর্ণ আলোক বলিয়া কিছু নাই। জীবজগতে দৃষ্টিশক্তির প্রাবল্যানুসারে আলোক এবং অন্ধকারের নামকরণ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ যাহাকে অন্ধকার আখ্যায় আখ্যায়িত করেন একটি সুস্থ সবল বালকের দৃষ্টিতে তাহা আলোক সঙ্কুল; আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যের চক্ষে যাহা ঘোর অন্ধকার, মার্জ্জার, মুষিকাদির দৃষ্টিতে তাহা আলোকময়;—মনুষ্যের আকর্ণবিস্তৃত সুবিশাল নেত্রদ্বয় তথায় কার্য্যকরী না হইলেও, মুষিকের ক্ষুদ্র চক্ষু সেই অন্ধকারে ক্ষুদ্রতম খাদ্যকণাটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহা হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে আমরা যাহাকে অন্ধকার আখ্যায় আখ্যায়িত করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা আলোকশূন্য নহে; সুতরাং অন্ধকারের অন্তরালে আমরা যে কার্য্য করি, তাহারও স্বরূপ চিত্র চিত্রগুপ্তের অনন্ত আকাশরূপ বিশাল চিত্রশালায় স্থানলাভ করে। বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরাজ্য বড় কঠিন স্থান, এ রাজ্যে ফাঁকি চালাইবার উপায় নাই।

আর একটি মাত্র প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমি আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইতিপূর্ব্বে আমরা পুরাণ হইতে দেখিয়াছি যে চিত্রগুপ্ত যমের প্রধান কর্ম্মচারী। যম শব্দের অর্থ সংযম। এ পৃথিবীতে সংযম হইতেই সৎকর্ম্মের উৎপত্তি, আর অসংযম হইতেই অসৎকর্ম্মের আবির্ভাব। যিনি অনন্ত সংযমী তিনিই যম; সেই হেতু হিন্দুশাস্ত্রে চিত্রগুপ্ত যমের প্রধান কর্ম্মচারী। এক্ষণে স্থির-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, জড়বাদী গর্ব্বিত পাশ্চাত্যজগতে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার মাত্র বিগত দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে তত্ত্ব হিন্দু ঋষিগণের যে অপরিজ্ঞাত ছিল না, চিত্রগুপ্ত তাহার অন্যতম নিদর্শন। পাশ্চাত্য জগত জড়বাদী—জড়ই তাহাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রাণ;—আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের সুদূরপরাহত। বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকাশ, আত্মজ্ঞানের অপরূপ অভিব্যক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় অপূর্ব্ব সমন্বয়—এই পরমুখাপেক্ষী অধঃপতিত হিন্দুজাতির অতীত ইতিহাসের প্রতি ছত্রে বর্ণে বর্ণে যেরূপ সমুজ্জ্বল-সুবর্ণভাতিতে প্রতিভাত, তাহার কণামাত্র ভাতি এ সুবিশাল জগত তলে কোনও দেশে কোনও জাতির ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতির জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের অচিন্তনীয় সমন্বয়ে যে উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণ প্রভাব ছিল, তাহার কণামাত্র লাভ এই তামস-মলিন গর্ব্বিতবুদ্ধি স্থূল জড়বাদী জাতির পক্ষে পঞ্চ সহস্র বৎসর পরেও সুদূর পরাহত। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ভ্রান্ত আর্য্য সন্তান! তোমার সকলই ছিল—সকলই আছে, তবে কেবল ভস্মস্তূপে আবৃত!

ভস্মাবৃত বহ্নি যথা পাংশু-আবরণে
লুকাইয়া রাখে
আপন দাহিকা শক্তি অতি সংগোপনে,
সেই মত আছে
মোহ-আবরণে ঢাকা ভারতের প্রোজ্জ্বল মহিমা।

একবার আলস্য-মোহ-ভ্রান্তি দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া সমবেত চেষ্টায় ঐ ভস্মাচ্ছাদন বিদূরিত কর—সমবেত ফুৎকারে তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব বহ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাও—দেখিবে তাহার লেলিহান শত শিখা তোমার শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া সমুজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত প্রভাষিত করিতেছে; সে জ্ঞানগরিমার অমোঘ ছটায় তুমি ধন্য হইবে—সমস্ত জগতবাসীকে ধন্য করিবে—আর বিশ্বনিয়ন্তার অজস্র আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তোমার শিরে বর্ষিত হইবে।

রূপদক্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভাবকে এরা ফুটায় রঙে ভাষায়,
কালকে রাখে কালির রেখায় ধরি।
অনন্তকে অসীম ভালবাসায়,
প্রকাশ করে ধ্যানের ছবি গড়ি।

২

অকূলকে হায় আনতে কূলের কাছে
যুগযুগান্ত চেষ্টা করে তা'রা
অপরূপকে ধরতে রূপের মাঝে
বসে থাকে তন্দ্রা অলস হারা।

৩

চঞ্চল ভাই রাখতে চাওয়া ধরে
বিজ্ঞান জ্ঞান শিল্প-কলার মূল,
এ কাজ সুধার কারবারীরাই করে
অরসিকে পায় না ইহার কূল।

৪

সাগর মথি এরাই সুধা তোলে
বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম যে লয় কাড়ি,
অনুরাগে স্বরগ দুয়ার খোলে,
এরাই জমায় রূপ সাগরে পাড়ি।

ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালার তরুণ শিল্পীর অবদান

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর-এস্

নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশ পলিমাটি দিয়ে গড়া। অতি প্রাচীন-কাল থেকেই এ দেশের ভাস্কর ও স্থপতি পাথরের অভাব যথেষ্ট অনুভব করে এসেছে। উড়িষ্যার মন্দিরের মত বিরাট অভ্রভেদী পাষাণ দেউল বাঙ্গালা দেশে বিরল। যে কয়েকটি ছোট ছোট নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তা সবই

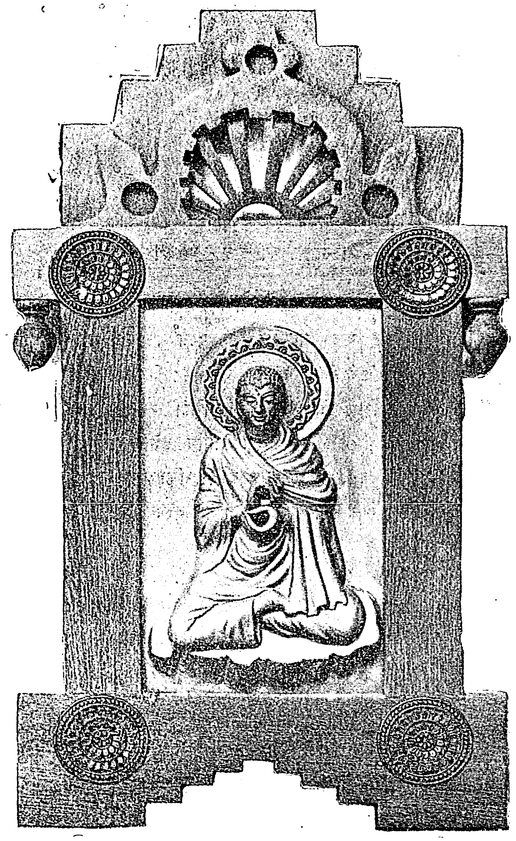

ধ্যানী-বুদ্ধ —মনোরঞ্জন

কীর্ত্তি রেখে গেছে। কিন্তু সে সব কাল পাথরের ফলক-গুলি রাজমহল পাহাড়ের খনি থেকে আহরণ করা। বাঙ্গালী শিল্পী চিরকালই এই পাথরের অভাব পূরণ করতে চেয়েছে দেশের মাটি দিয়ে। প্রাচীন বাঙ্গালী কলাবিদ্ মৃন্ময়শিল্পে যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল আজও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—অতীত যুগের পাহাড়পুর ও মহাস্থানের অতুলনীয় মন্দিরে, গৌড়পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মস্‌জিদে ও

বুদ্ধদেব ও সুজাতা — মনোরঞ্জন

পশ্চিম রাঢ়ভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। অবশ্য অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল ও সেনরাজাদের আমলে বিখ্যাত শিল্পা ধীমান্ ও বিতপালের নেতৃত্বে বাঙ্গালী ভাস্কর অসংখ্য দেবদেবীর অপরূপ পাষাণ মূর্ত্তিতে তাদের অক্ষয়-

মথুরাপুর বিষ্ণুপুর প্রভৃতি সারা বাঙ্গালাব্যাপী অসংখ্য ভগ্নদেউলে। দেবমানবের বিচিত্র লীলায়, পশুপক্ষীর অপরূপ সমাবেশে ও পুষ্পলতার সুচারু সজ্জায় সেকালের প্রত্যেক মৃত্তিকাফলকটি অভিনবরূপে সজ্জিত।

জাতীয় আত্মবিস্মৃতির গভীর তমসাচ্ছন্ন যুগের পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নূতন বাঙ্গালায় নূতন কলাশিল্প গড়ে উঠ্‌ল—প্রাচীন ভারতের অজন্তা ও ইলোরা, মুঘল ও রাজপুতানার অমর শিল্পের আদর্শে। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথিতনামা ছাত্র দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দৃষ্টি ভাস্কর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হল প্রথম। ভাস্কর্য্যে তাঁর

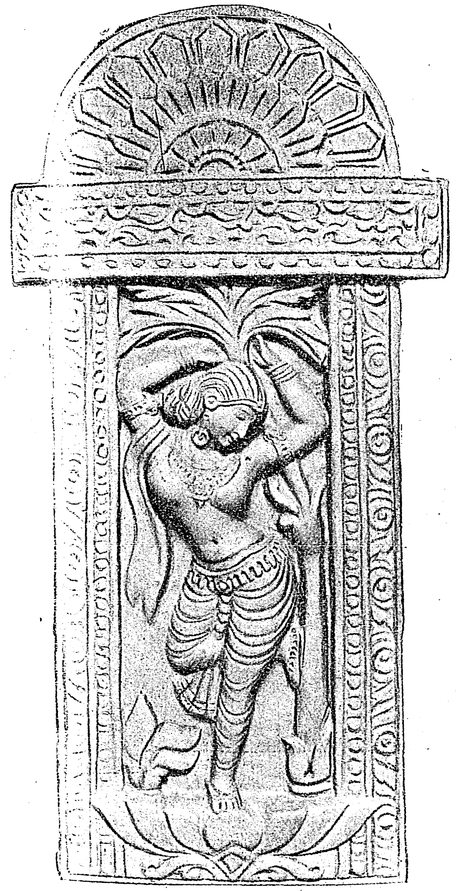

নর্ত্তকী —মনোরঞ্জন

নৈপুণ্য এখন সর্ব্বজনবিদিত। কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ নিতাই পালের পুরাণ ঢঙ্গে গড়া মৃন্ময়মূর্ত্তি আজকাল শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বৈদেশিক প্রভাবান্বিত ঐীসীয় পদ্ধতি অনুসারে গড়া নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন নরনারী মূর্ত্তির নিকৃষ্ট অনুকরণগুলির বিষম মোহ থেকে যে ক'জন নবীন বাঙ্গালী শিল্পী আমাদের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি ধীরে ধীরে ফেরাতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কুমিল্লাবাসী শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ভৌমিক অন্যতম। ইনি কোনও শিল্পাচার্য্য বা শিল্পায়তনের সাহায্যে নিজের রসানুভূতি পরিপুষ্ট করবার সুযোগ পান নি। স্বাধীন ত্রিপুরান্তর্গত উদয়পুরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সংস্পর্শে এসেই সবপ্রথম ইনি ভারতের অতীত আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালার নিজস্ব চিরপুরাতন মৃৎশিল্পের সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

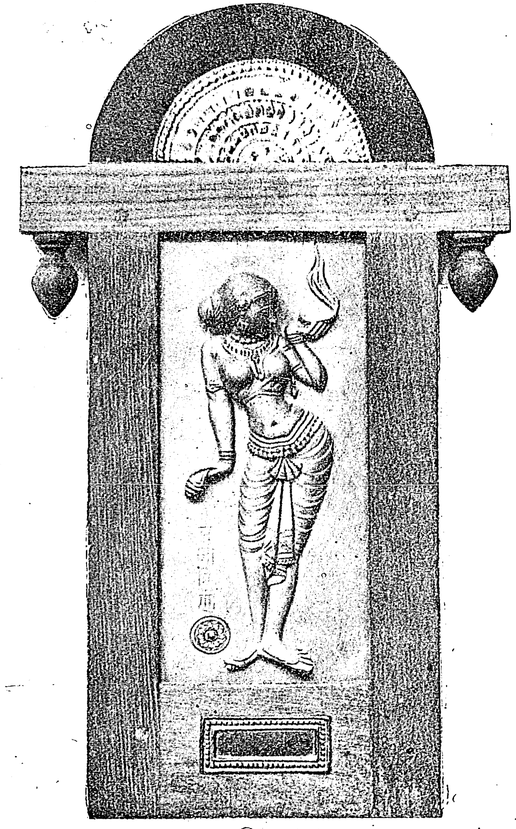

মন্দির পথে —মনোরঞ্জন

তিনি এই ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন তাঁর তৈয়ারী কতকগুলি মূর্ত্তিফলক দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সবগুলিই অর্দ্ধচিত্র বা relief work এবং মাটি বা প্ল্যাষ্টারের সঙ্গে সিমেণ্ট মিশিয়ে তৈয়ারী। এর মধ্যে "বসন্ত-উৎসব" নামে চিত্রটিই সবচেয়ে প্রশংসনীয়। নব বসন্ত সমাগমে

পুষ্পিত তরুতলে নৃত্যমুখর আনন্দ-উছল রসবিভোর মূর্ত্তিগুলির সমাবেশ বাস্তবিকই সুন্দর। প্রথমেই মাঝখানের দেবমূর্ত্তির পরিপাটি বলিষ্ঠ দেহকান্তি, সুললিত সুঠাম দেহ-যষ্টি আমাদের চোখে পড়ে। শিল্পী তাঁহার দিব্যশ্রী, সুষমা ও লালিত্যটুকু সুন্দর করে মনোহারী করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই সুস্থদেহ, বলিষ্ঠ-কান্তি, গৌরবপুর্ণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল পুরুষমূর্ত্তির রূপ-কল্পনায় বেশ একটু দেবোচিত শান্ত অথচ মধুর ভাব আছে। প্রতিমূর্ত্তিটির দুটি হাতের সুললিত গতিভঙ্গী ছন্দবন্ধতা আর সমস্ত শরীরে সচঞ্চল গতির লীলা বড়ই রমণীয়। তাকে ঘিরে

বসন্ত-উৎসব —মনোরঞ্জন

সুকৌশলে সংস্থাপিত পরিপূর্ণ-যৌবনা তরুণীদলের লীলা ভঙ্গী ও ছন্দমাধুরীও যথার্থ উপভোগ্য। তাদের দেহের সুগঠিত সুগোল সৌন্দর্য্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঋজুসঞ্চালনের ভঙ্গীতে, সুচারু বর্ত্তুলরেখার সুললিত গতিলীলায়, নৃত্যের আবর্ত্তনে, মধুর ঝঙ্কারে ও ঐক্যতানের স্পর্শে একটা মোহিনী শক্তি আছে। চিত্রটি আরও মনোহারী হয়ে উঠেছে পুষ্পিত তরুশাখার আন্দোলন ও সজীব মূর্ত্তিসমূহের প্রত্যেক অবয়ব পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি করেছে বলে। নৃত্যের আনন্দ-উন্মাদনা প্রকাশিত হয়েছে নানা বক্র ও নমনীয় রেখার প্রাচুর্য্যে, রস উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে। কিন্তু নৃত্যরত মূর্ত্তিগুলির উদ্দামতাহীন মধুর সংযত ভাব বিশেষ লক্ষণীয়। এই ধরণের সাবলীল ছন্দ ও লীলায়িত রেখাবলী, আলোছায়ার অপূর্ব্ব সম্পাত ও নারীরূপের রমণীয় পরিকল্পনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন অমরাবতীর মর্ম্মরপটে উৎকীর্ণ বিচিত্র-রূপসম্ভার। যদিও আলোচ্য চিত্রটি বৃহৎ নয় তবুও বিষয় সংস্থাপন ও গঠনের গুণে এতে বিশালত্বের স্পর্শ আছে।

"পূজারিণী" চিত্রে দেখতে পাই অতি সন্তর্পণে চলেছে নবযৌবনশ্রীর স্নিগ্ধ দীপ্তি নিয়ে একটি তন্বী তরুণী। একটি হাতের লীলাভঙ্গীতে কম্পিত দীপশিখা, অপরটি শঙ্খ আশ্রয় করে নিম্নে প্রসারিত। সমস্ত মূর্ত্তিটি একটু সলজ্জ, মধুর ও সঙ্কোচের ভাবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শিল্পী বড় কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন ভক্তিনম্র পূজারিণীর সংযত ভঙ্গী, স্তম্ভিত গতি ও সুমধুর ভাবটি। তার সুকুমার সুললিত উন্নত গঠন ও কল্পনার রূপরসটি বেশ স্নিগ্ধ সংযমের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তরুণীর দেহলতার মসৃণ

সরস সুগোল অঙ্গলীলা প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব্ব সূক্ষ্মরেখার সুষমায়, শিল্পীহস্তের দরদী পরশে। তার অভিনব রূপকল্পনা ও ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা পরিস্ফুট হয়েছে সাবলীল গ্রীবাভঙ্গে, নয়নের অভিষিক্ত ভাবে, মনোরম বেশবিন্যাসে ও হস্তপদের স্নিগ্ধ সঞ্চালনে। সমস্ত চিত্রে একটি নারীসুলভ কমনীয়তা ও কোমলতার ছায়া কল্পনাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অলঙ্কারহীন সরল ঐশ্বর্য্যে মূর্ত্তিটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি ও শিবনটরাজের নৃত্যমূর্ত্তি—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পবুদ্ধি ও রসানুভূতির শ্রেষ্ঠ দান।—বুদ্ধের জীবনকে আশ্রয় করে শ্রীমান মনোরঞ্জন যে কয়েকটি প্রচেষ্টা করেছেন তা শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। বুদ্ধের বেশবিন্যাসে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান। এইরূপ বিশেষ বেশসজ্জারীতি ও পিছনে বটবৃক্ষের কারুকার্য্য আমাদের চৈনিক আদর্শের কথা মনে করিয়ে দেয়। জানি না শিল্পীর এই বিশেষ অনুভূতি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত। "নিবেদন" চিত্রে বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের দীর্ঘ সরল আকৃতি বটমূলগুলির লম্বিত সমান্তরাল রেখাবলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা স্থির নিশ্চল নীরবতা সৃষ্টি করেছে। এই পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যকে মধুর করে তুলেছে পদপ্রান্তে ধূলি-লুণ্ঠিতা অজন্তা-অনুপ্রাণিত নিবেদিতার কুসুমপেলব দেহের কোমল লীলায়িত রেখাবলী ও ভক্তিরসাপ্লুত করুণ রূপমাধুর্য্য। অন্য চিত্রে এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে অপর একটি নতজানু ভক্তিমতী লাবণ্যময়ীর ঊর্দ্ধমুখী নিবেদনের আকুল প্রার্থনায়। শিল্পী দিতে চেষ্টা করেছেন তথাগতের স্মিত বদনে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি। এই দিব্যভাবকে দেবত্বের স্পর্শ যখন দিতে পারবেন, তখনই হবে শিল্পের সার্থকতা।

এই তরুণ শিল্পীর শিল্প সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—যা তাঁর মূর্ত্তিগুলিকে আরও বেশী শোভন ও সুরুচিপূর্ণ করে তুলেছে। ফ্রেমের পরিকল্পনায় তোরণ অথবা চৈত্যগবাক্ষ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের অলঙ্কারগুলির ব্যবহারে যে কৌশল ও চাতুর্য্য দেখিয়েছেন সেটা তাঁর বিশেষত্ব। এ কথা বলা যেতে পারে যে মৌলিক রচনাপ্রসূত নয়নাভিরাম ফ্রেমগুলি রূপ-সৃষ্টির কোঠায় গিয়ে পৌঁছেচে। কারুশিল্পকে চারুশিল্পে পরিণত করবার স্পর্দ্ধা রাখা কম সাহসের কথা নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন ভৌমিক

প্রাচীন ভারতের রূপতত্ত্বকে কিরূপে অনায়াসে আধুনিক রুচিমার্জ্জিত সমাজের উপযোগী করতে পারা যায় আমাদের নবীন ভাস্কর তার নানারূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর অভিনব কলার উত্তরোত্তর সাফল্য ও পরিণতি কামনা করি।

গল্প

বোহিমিয়ান

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বাবা ছিলেন কেরাণী, আমিও তাই ! ··

কাজেই আমাদের জীবন চলিয়াছে ঠিক একই ধারায়। ঠিক একই ভাবে প্রতিটি দিনের সুরু হয়। আর একই ভাবেই হয় তার শেষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে আসে মাঝে মাঝে ছেলেপুলেগুলির অসুখ-বিসুখ, মাসের শেষে টানাটানি— আর নয় তো জামাতা বাবাজির শুভাগমন।

কিন্তু কোন রকমে দিন কাটাইয়া দিতেছি।···যে বাড়ীতে থাকি সেখানে আমারই মত আর পাঁচ ছয়টি পরিবার পাশাপাশি থাকিয়া এমনইভাবে দিন কাটাইয়া দেয়। পাশাপাশি ঘরগুলির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছি মাত্র কয়েকটি চটের পর্দ্দা টানাইয়া—তা ছাড়া এই পুরাতন আবদ্ধ বাড়ীটির এত বন্ধনের মাঝেও আমরা পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত !···

মাঝে মাঝে কল ও জল লইয়া আমাদের মধ্যে যে বচসা হইয়া গিয়াছে, তাহা অতি সামান্যই ! আমাদের মধ্যে সহজ সম্প্রীতিকে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সামনের ঘরের সান্ন্যাল-গিন্নির সহিত আমার গিন্নির বড়ই ভাব—কাজেই সান্ন্যাল মহাশয় হইয়াছেন আমার পরম বন্ধু !

* * * *

এ বাড়ীর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে ! এতদিন যে ভাবে কাটিয়াছে আজ যেন তার মধ্যে কেমন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সবাইয়ের দৃষ্টি একদিকেই ধাবিত হইতেছে !···

নীচের ঘরের নবাগত ভাড়াটিয়াদের লইয়া গিন্নির সহিত সান্ন্যাল-গিন্নির কানাকানি চলে দিবারাত্র। তারই দু’ একটা কথা কানে আসিয়া পৌঁছায়।

—যাই বল ভাই, আমার কিন্তু ও রকম হাসি ভাল লাগে না। চেনা নেই, শোনা নেই, আমার সঙ্গে আলাপ করবি তা অত হাসি কেন ? কি জানি বাপু, আমার যেন কেমন লাগে—

—কিন্তু অত হাসলে কি হবে ? কি ব্যাপার ওদের জান না ? শোন কথা তবে।—আমি বেশ নজর করে দেখেছি, সেবার তিন দিন ওদের আর হাঁড়ি চ’ড়ল না। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা ছেলেটা কোথা থেকে ফিরে এসে বউটাকে ইসারা করে কি বল্‌ত, আর বউটা আস্তে আস্তে উঠে এগিয়ে তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। জল খেয়ে ছেলেটা হাত পা মেলে বিছানায় শুয়ে পড়ত।·· শেষে তিন দিনের দিন বিকাল বেলা ছেলেটা কোথা থেকে দুটা রুমালে করে বাঁধা কি সমস্ত এনে হাজির ! পকেট থেকে ঝন্‌ঝন্‌ করে কতকগুলি টাকা বার করে বউটার হাতে দেয়। বউটাও আনন্দে দিশেহারা ! তখুনি উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপিয়ে ফেললে। তার পর রাত দুটা পর্য্যন্ত দু’জনে কি গল্প !···ওদের ছোট্ট মেয়েটাকেও ঘুমুতে দেয় নি একটুও।···

আবার শোন—সে দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি কোথায় সেজেগুজে বেরুলেন, শুনলুম নাকি কোথায় ‘মিটিঙে’ না কিসে যাওয়া হচ্ছে। মাগো—যাদের পেটে ভাত নেই—তাদের আবার এত সখ কিসের ?

হঠাৎ সিঁড়িতে সান্ন্যাল-মশায়ের চটির শব্দ হয়। কাজেই উহাদের কথোপকথন মাঝে আধপথে যবনিকা টানিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।—

* * * *

ব্যাপারটা অবশ্য খুবই সামান্য !···

কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে কেমন একটা ঔৎসুক্যের

সৃষ্টি হইয়াছিল। ওদের ছোট্ট মেয়েটি ঘরের ভিতর খেলিয়া বেড়ায়। ছুটিয়া যায়, বল লইয়া লোফালুফী করে। খেলিতে খেলিতে বলটি আসিয়া আমাদের দালানে পড়ে।

সান্ন্যাল মশায়ের ছোট ছেলে টুনি আসিয়া সেটি ধরে। ধরিয়া বলে—আর দেব না ! আমায় একবার খেলতে দেবে বল, তবে দেব !

ছোট মেয়েটি অবাক হইয়া যায়। ভয়ে সে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মুখটি মলিন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সান্ন্যাল গিন্নি আসিয়া বলটি আপনার ছেলের হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার গালে একটি থাপ্পড় দিয়া বলেন—হতভাগা ছেলে, ফের পরের জিনিসে হাত দিবি ? দেখিস না দেমাকে ফেটে পড়েন, ওদের সঙ্গে আবার মেশে ?

ব্যাপার দেখিয়া মেয়েটি ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। বলটি কোথায় পড়িয়া রহিল কে জানে !

* * * *

সকালবেলা ছেলেটির সহিত মুখোমুখি !

দেখিয়াই হাসিয়া ফেলে। নমস্কার করিতে করিতে আর কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলি—আলাপ করবার সুবিধে হয় নি, ভাল আছেন ?

ছেলেটি বলে—এই এক রকম কেটে যাচ্ছে !

বললুম—করা হয় কি আপনার জানতে—

ছেলেটি বলে—নিশ্চয় জানতে পারেন। এই একটা ছোট কম্পানীর ‘সেলিং এজেণ্ট’। সামান্য কাজ। আচ্ছা নমস্কার !

তাহার পর ছেলেটি চলিয়া যায়। আমিও উঠিয়া পড়ি। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবার সময় একবার উহাদের ঘরের দিকে চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসি। দেখি বউটি তখন একটি ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁটাইতে বসিয়াছে। ঈষৎ টানা ঘোমটাটি হাওয়ায় উড়িয়া গিয়াছে। মুখখানিতে একটু ক্লান্ত অবসাদ। কিন্তু আশ্চর্য্য—ঘরের জিনিষ পত্রগুলি কেমন শ্রীমণ্ডিত, সুচারুরূপে গুছান। বুঝিলাম দারিদ্র্যকে যদিও উহারা আমরণ জীবনের সম্বল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার নিকট একান্তভাবে তাহারা আত্ম-সমর্পণ করে নাই। নিত্য দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও কোন রকমে আপনাদের লক্ষ্মীছাড়া করিয়া তুলিতে উহাদের বাধে।···

আফিস যাইবার পূর্ব্বে খাইতে বসিয়াছি, গিন্নি আসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গা ‘কুইন্’ মানে কি ?

আমি বলিলাম—কুইন্ ? ওঃ ‘কুইন্’ মানে রাণী। কিন্তু কি হয়েছে তাতে ?

গিন্নি ততক্ষণে উধাও হইয়াছেন। বারান্দা হইতে একবার উঁকি দিয়া সান্ন্যালগিন্নিকে বলিতে থাকেন—জানলে দিদি, ‘কুইন’ মানে রাণী !

তাহার পর সান্ন্যালগিন্নি ঠেস দিয়া বলিতে থাকেন—কিন্তু রাণী মা কি উপোস দেয় ভাই ? শুনি নি কখনও—

দু’পক্ষই হাসিয়া ওঠে।

বেশ বুঝিতে পারি উহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। উহাদের ছোট্ট ঐ মেয়েটি ‘কুইন !’ কি ভালবাসে উহারা ওকে ! দারিদ্র্যের একটিও উত্তাপরশ্মি গায়ে লাগিতে দেয় না। নিজেরা কিছু খাক না খাক– মেয়েটাকে খাওয়াইবার কামাই ছিল না কোন দিন।

* * * * *

দেখিয়া মনে হইল গিন্নি আমার উপর সে দিন ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। ঝড়ের মত আসিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—আচ্ছা তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল তো—চাকরী বাকৃরি ছেড়ে দিয়ে কি এই বাড়ীতে বসে থাকবে ?···

আমি বলিলাম—বা রে ! আজ যে মুসলমানদের পরব, আজ ছুটি, জান না ?

গিন্নি বলেন—মুচুরমানদের পরপ ! সে তো মহরম কবে হয়ে গেছে। আমি বুঝি বুঝতে পারি না ? আমার সঙ্গে চালাকি ? আচ্ছা বেশ, তাই যদি হয়—এই নাও জামা, বেরিয়ে পড় সুধীর খোকা হয়েছে, ‘নৈষ্টী’ থেকে দেখে এস কেমন আছে। তা বলে বাড়ীতে বসে থাকতে দেব না। মাগো ! মেয়েটার যা চালচলন। আমার ওসব ফিরিঙ্গিপনা ভাল লাগে না বাপু। ওরা যদি না উঠে যায়, আমরা উঠে যাব।···বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে একটু লজ্জা নেই !··· আর তোমারই বা দিন দিন কি আক্কেল হচ্ছে বাপু, ছেলে-পুলে আছে—তোমার কেবল দিনরাত্তির হাঁ করে চেয়ে বাড়ীতে বসে থাকা।···

গিন্নির সহিত পারিয়া উঠি না—তাই জামা গায়ে দিয়া নৈহাটী চলিলাম।—

* * * * *

রবিবার গুলায় কিন্তু বাড়ীতে থাকিতে হয়।

দেখি ন'টা দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া ছেলেটি বাহির হইয়া যাইবার পর বউটি ঘুমন্ত মেয়েটাকে পিঠে করিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায় এবং ঘণ্টা দুয়েক পরে এক পোঁটলা রেশমী কাপড় সুতা ছিট্ প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত দিন ধরিয়া সেইগুলি দিয়া ছোট ছোট বাহারি জামা তৈয়ারী করে। সন্ধ্যায় ছেলেটি আসিয়া আবার সেই তৈয়ারী জিনিসগুলি লইয়া বাহির হইয়া যায়—একটু রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসে।

আর একদিন সান্যালগিন্নির বক্তৃতা সুরু হয়। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করেন—জানলে বউ, আমার কথাটা এমন কি খারাপ হয়েছিল বল না? আমি কি বলেছিলুম জান? বলেছিলুম—হ্যাঁ গা, তোমার ঐ ঘুমন্ত মেয়েটাকে অমন কাঁধে করে নিয়ে যাও কেন? রেখে গেলেই তো পার? আমরা রয়েচি, একবার একবার কি আর দেখতে পারব না?

বললে—না আপনাদের কষ্ট হবে—। তখন আমি বললুম—আমাদেরও তো ছেলেপুলে রয়েছে বাছা? তখন হতচ্ছাড়া মেয়েটা কি বললে জান? বললে—না আপনাকে দেখে ও কেঁদে উঠবে? আপনি যা মোটা!···

শুনলে দেমাকের কথাটা একবার? মনে হ'ল ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিই। এ সমস্ত কিন্তু ভাল লক্ষণ মনে হয় না বাপু! আমি বলি কি—

অনুচ্চারণীয় শ্লেষ বাক্যটি অনুচ্চারিত থাকিয়া যায়। মেয়েটি বাহির হইতে বেড়াইয়া আসে। বেশ বুঝিতে পারি কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু উহা শুনিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ও যেন কেমন ক্লশ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। দেখিতে পাই ওর চাহনির পশ্চাতে যেন এক অন্তর-জোড়া অশ্রুর সাগর দুলিতেছে!

* * * * *

শীতকালের সকাল।

উঠিতে একটু বিলম্ব হয়। কে দরজার শিকল নাড়া দিয়া ডাকিতে থাকে। বলি—কে সান্যাল মশাই?

হ্যাঁ—একটু তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।···

হুড়কা খুলিয়া বাহির হইয়া আসি। সান্যাল মশাই ডাকিয়া লইয়া যান—আরে আসুন দেখুন কাণ্ডখানা একবার!

একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখি—নূতন ভাড়াটিয়াদের ঘর একদম শূন্য! তাহারা নাই!

সান্যাল মশাই বলিতে লাগিলেন—দেখলেন ব্যাপারটা ভাড়া মেরে দিয়ে পালিয়েছে!

বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া গেল। বলিলাম—ওরা কি তাহলে এমনই লোক নাকি?

সান্যাল মশাই অবজ্ঞার সুরে বলিতে লাগিলেন—তা না তো আবার কি? হালচাল দেখেই আমি তো আগেই বলেছিলুম। কিন্তু এখন আমাদের না ফ্যাসাদে ফেলে। বাড়ীওলা এসে না আমাদের ধরে—না বলে আমাদের সঙ্গে সড় করে করেছে।···

যথাসময়ে বাড়ীওয়ালা সামন্ত মহাশয় আসিয়া পৌঁছাইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—আমিও চালাক ছেলে মশায়—নতুন লোক দেখে এক মাসের ভাড়া আগে নিয়ে রেখেছিলুম। যাক ভালই হোল, এবার নতুন ভাড়া বসাব।

সান্যাল মশাই বলিতে আরম্ভ করিলেন—আপনি তো তা হলে চালাক ছেলে মশাই! কিন্তু আমাদের ঘটি বাটিটাও তো আছে। সে গুলা আর নিয়ে ভাগ্‌তে কতক্ষণ। দেখি একবার গিন্নিকে জিগ্‌গেস করি—সমস্ত ঠিক আছে কিনা!

জীবনানন্দ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মরি নাই আমি মরি নাই
আজি যে আবার পৃথিবীর প্রেম
গগনের নীল আলো চাই।
আজি যে প্রাণের বাজাইয়া বাঁশি
মরণেরে যত যাব উপহাসি',
জাগাবো ঘুমের বালা;

খেজালির বনে শরত-উষায়,
ফাগুনে বসিয়া বকুলের ছায়
রসিয়া রসিয়া চরম নেশায়
গাঁথিয়া পরিব মালা।

মধনের তারা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
স্বপনের স্রোত আসিবে ভিড়িয়া,
আকাশের নীল চিরিয়া চিরিয়া
ফুটাবো সোনার ছবি,

বেহাগে দীপকে ললিতে বাহারে
ঠোঁটের হাসিতে নয়ন-আসারে
সাজায়ে ফিরিব প্রাণ-বঁধুয়ারে
জীবনের মহাকবি।

মরি নাই আমি মরি নাই
ওগো ও তরুণ ওগো ও তরুণী
হাতে মোর হাত রাখ ভাই।
আজি ধমনীর শোণিতে জোয়ার
দিকে দিকে যত ভাঙে শিলাভার,
এক হ'য়ে যায় যত ঘর বার
একটি চরম হাঁকে।

ওই যে সুমুখে স্বপনের রাণী
আঁচল দোলায়ে চলে সুর টানি'
ডেকে ডেকে যায় দিয়া হাতছানি
জীবনের প্রতি বাঁকে।

তারি সাথে সাথে কণ্ঠের গান
উচ্ছ্বসি' ওঠে আকুলিয়া প্রাণ,
রূপের সায়রে করি' সুখ-স্নান
স্বর্ণ-গরিমা রথে
ষোড়শ বাজির বন্না বাগায়ে
প্রেম হাসি শোক অশ্রু জাগায়ে
চলিব কনক কিরীট লাগায়ে
জীবনের মহাপথে।

ওগো তরুণ তরুণী ভাই
তোমাদের সাথে সাথী আছি আমি
জীবনের জয় সদা গাই।
ধমনীতে যত শোণিতের দোল
ধরণীর বুকে তোলে হিল্লোল,
মানবের যত খল কলরোল
বক্ষে পড়িবে আসি',
পৃথিবী জুড়িয়া ভবনে ভবনে
প্রাণের শঙ্খ লগনে লগনে
সন্ধ্যা উষায় শয়নে স্বপনে
বাজাবে পথের বাঁশি।

সেই বাঁশরির সুরের নেশায়
ধূলি-তলে-তলে অঙ্কুর গা'য়
শিহরণ লাগি' পল্লব-কায়
জাগিবে অরিন্দম,
গগনে যখন গোধূলি-বেলায়
আধ জাগরণ আধ ঘুমে ছায়
ধরণীর হিয়া গভীর মায়ায়
ছাবে এ-হৃদয় মম।

ওগো তরুণ তরুণীদল
তোমাদের সাথে সাথী আজি আমি
নেচে যাব হেসে খলখল্

সিন্ধুর বুকে সমীর-দোলায়
ঊর্ম্মিবালারা যেথায় খেলায়
সেইখানে আমি চড়িব ভেলায়
বাজায়ে প্রাণের বাঁশি,

তুফানের সাথে করি' কাড়াকাড়ি
ঝঞ্ঝার রোলে দিব জয়-পাড়ি
বজ্রের বোলে যত নভচারী
হাসির অট্টহাসি।

আবার যখন জোছনা-জোয়ার
ছেয়ে যাবে দিক এপার ওপার,
ক্ষেপণীর তালে মৃদু ঝঙ্কার
তরুণী-কণ্ঠ সম

ফুটিবে, লুটাবে নীল কুন্তল
ঊর্ম্মিবালারা গাহি ছল ছল্,
পদতলে পড়ি' সিন্ধু অতল
রহিবে অধীনতম।

ওগো তরুণ তরুণী ভাই
এসো আজি এসো হাতে রাখি হাত
অজানার পানে চ'লে যাই।
সন্ধ্যার কোলে একটি তারায়
যে-সুর বাজিয়া আকাশে হারায়
সেই সুর তুলি' প্রাণের ধারায়
চলিব নিরুদ্দেশে,

সমীরণ সাথে যার কানাকানি
নয়নের পাতে তারি মায়া টানি'
প্রাণ-যমুনায় নব স্রোত আনি'
পঁহুছিব সেই দেশে ;

নব পুলকের আলোর জোয়ার
ছেয়ে দেবে যত ঘর আর বার
পরিহাস যত হবে জিত হার
শেষ এক পরিহাসে,

ঝড়ের মাতনে, জোছনা-ধারায়,
মেঘের প্রলয়ে, শারদ-মায়ায়
দেখিব গভীর মরম-ছায়ায়
বসি' কে যে এক হাসে।

মরি নাই আমি মরি নাই
আজি যে আবার পৃথিবীর প্রেম
গগনের নীল আলো চাই।
আজি মোর প্রাণ বাজাইয়া বাঁশি
মরণেরে যত চলে উপহাসি',
দিকে দিকে ছায় রূপকথা রাশি
জাগায়ে ঘুমের বালা,

শেফালির বনে শরত-উষায়
ফাগুনে বসিয়া বকুলেয় ছায়
রসিয়া রসিয়া চরম নেশায়
গাঁথিয়া পরিছে মালা ;

নয়নের তারা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
স্বপনের স্রোত আসিছে ভিড়িয়া
আকাশের নীল চিরিয়া চিরিয়া
ফুটিছে সোনার ছবি,

বেহাগে দীপকে ললিতে বাহারে
ঠোঁটের হাসিতে নয়ন-আসারে
সাজায়ে ফিরিছে প্রাণ-বঁধুয়ারে
জীবনের মহাকবি!

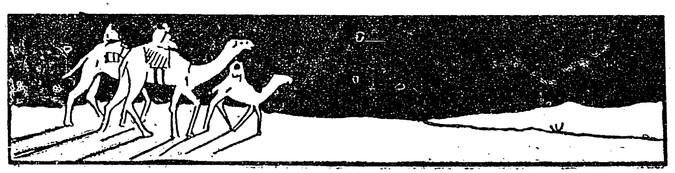

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করব, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহেন ;—উচ্চ উপাধি দূরে থাকুক—ইংরাজী বর্ণমালার সহিতও কোনদিন তাঁহার পরিচয় হয় নি। কিন্তু তিনি বিশ্বের মহাবিদ্যালয়ে—বিশ্বনাথের কাছে উচ্চ—বহু উচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি আমার গ্রামবাসী, আজীবন সুহৃদ ও সখা, আমরণ বন্ধু ; এই জন্যই যে এত কথা বললাম তা নয়—সত্যসত্যই তিনি বাংলাদেশের একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনন্য-সাধারণ বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সিদ্ধ-সাধক ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনামাত্রই করেন নাই, তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীশ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব।

পূর্ব্বেই বলেছি, শিবচন্দ্র আমার গ্রামবাসী ছিলেন। গ্রামের এক প্রান্তে আমার বাড়ী ও অপর প্রান্তে শিবচন্দ্রের বাড়ী ছিল না। তিনি আমার নিকট প্রতিবেশী ছিলেন—তাঁদের বাড়ী ও আমার বাড়ীর মাঝখানে একখানি মাত্র বাড়ী ; সুতরাং বলতে গেলে আমরা এক বাড়ীরই ছেলে ছিলাম।

বাংলাদেশের দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং নিতান্ত অখ্যাত-নামা আমি, এই তিনজন একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করি। আমি জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র, শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের—২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।

তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শিবচন্দ্র আমার ঠিক দু' মাসের ছোট, অক্ষয় আমার ছ' মাসের ছোট ছিলেন। তাই আমি শিবচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের দাদা ছিলাম।

এখন যেমন সকলে আমাকে সুধু "দাদা" বলে ডাকেন—শিব-অক্ষয় আমাকে তা বলে ডাকতেন না। তাঁরা ডাকতেন 'জল-দা' বলে।

শিবচন্দ্রের পিতৃদেব চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ মহাশয় আমাদের অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁকে কাকা বলে ডাকতাম। তিনি গল্প করতেন যে, নবদ্বীপে তিনি আঠার বৎসর সুধু কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন—আর কিছু পড়েন নি। কিন্তু এই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন উপলক্ষে তাঁর অধ্যাপকেরা তাঁকে সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ করে দিয়েছিলেন। কি সুন্দর ছিল তখনকার শিক্ষা-পদ্ধতি! আর অধ্যাপকগণের ছিল কি অপূর্ব্ব মনীষা!

শিবচন্দ্র আর আমি, একসঙ্গেই খেলাধূলা করতাম—আমাদের বাড়ী যে পাশাপাশি। অক্ষয়কুমারকে আমরা একআধ-মাসের জন্য বছরে সঙ্গী পেতাম। তাঁর পিতৃদেব পূজনীয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয় রাজসাহীতে চাকুরি করতেন, অক্ষয়কে সেইখানেই থাকতে হোত।

সেকালের পদ্ধতি অনুসারে নানা অনুষ্ঠান করে পুরোহিত মহাশয় আমাদের হাতে-খড়ি দেন নি। আমারও নয়—শিবচন্দ্রেরও নয়। শুনেছি অনুষ্ঠান সবই হয়েছিল, পুরোহিত মহাশয়ও পূজা-অর্চ্চনা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য কাঙাল হরিনাথ। তিনিই দুই মাস আগে-পিছে আমাদের দুই জনের বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। আর সেই সাধক-প্রবরের শুভ সূচনার ফলে একজন হলেন সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, আর একজন হলেন—অ-সিদ্ধ অ-পক্ক আমি ;—এক ঝাড়ের বাঁশেই দেবপূজার পুষ্পপাত্রও হোল এবং হাড়ীর ঝাঁটাও হোল।

কোন্ বছরে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে আমরা কুমারখালি বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশলাভ করেছিলাম তা আমার মনে নেই। মনে থাকবারও কথা নয়!

পাড়াগাঁয়ের গরীবের ছেলে, দুবেলা যার অন্ন জোটেনি তার সম্বন্ধে এ-সব কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্য কারও মাথা-ব্যথা হতে পারে না। শুনেছি, আমাদের যখন চার পাঁচ বছর বয়স, তখন শিবচন্দ্র ও আমি বাংলা স্কুলে প্রবেশ করি। (আমাদের দুজনের কেউই গুরুমশায়ের পাঠশালায় প্রথম শিক্ষা লাভ করি নি—একেবারে সোজা 'বর্ণপরিচয়' হাতে করে বাংলা স্কুলের ছাত্র হয়েছিলাম।) কাঙাল হরিনাথের কাছে শুনেছিলাম—আমিই আগে স্কুলে যাই, তার মাস দুই তিন পরে শিবচন্দ্র স্কুলে ভর্ত্তি হন।)

দুই বছর কি আড়াই বছর আমরা একসঙ্গেই পড়েছিলাম। তার পরে এক আশ্চর্য্য ঘটনায় শিবচন্দ্রকে বাংলা স্কুল ত্যাগ করতে হয়েছিল। শিবচন্দ্রের পিতা—আমাদের চন্দ্রকাকা অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন। সেই সময় একদিন চন্দ্রকাকা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি পড়ছিস রে শিব?

শিবচন্দ্র বললেন, "ডুবালের গল্প।"

"ডুবালের গল্প। সে আবার কি রে? দেখি।" এই বলে তিনি বইখানি হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে বইখানি দূরে নিক্ষেপ করে বল্লেন—"এই সব বুঝি পড়া হয়? দেশে আর মানুষই নেই, মহাপুরুষও নেই, পড়িস কি না ডুবালের গল্প। যাঃ, কাল থেকে তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না, এই ডুবালেই দেখছি দেশ ডুবালে।"

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কায। পরদিন থেকেই শিবচন্দ্র আর বাংলা স্কুলে গেলেন না। পরবর্ত্তী জীবনে অনেক স্থানে অনেক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র তাঁর পিতার সেই কথা কয়টি ভোলেন নি। যখন তখনই বলতেন—এই ডুবালেই দেশটা ডুবালে।

দেশ ডুবেছে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু এই ঘটনা থেকেই আমরা ভবিষ্যতের অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্রকে পেয়েছিলাম। তা না হলে হয়ত আর দশজনের মত শিবচন্দ্রও হয় আমাদের মত দু-কুড়ি সাতের মানুষ হতেন, নয় তো কিঞ্চিৎ স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে বসতেন, আর শ্রাদ্ধ-সভায় গিয়ে অপরের দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক মাথা নেড়ে আবৃত্তি করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জাহির করতেন।

স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে শিবচন্দ্র বাড়ীতে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাপ বা পিতামহের কাছে পড়া তাঁর হয়ে উঠল না। এই যে ভট্টাচার্য্যি বংশ—এর একটা সুখ্যাতি আছে। এ বংশের লোক যেমন তেজস্বী তেমনি দুর্দ্দমনীয়। শিবচন্দ্রের পিতা এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। শিবচন্দ্রও ছেলেবেলা থেকে পিতার এই গুণ লাভ করেছিলেন। বাল্যকালে তিনি যেমন দুর্দ্দান্ত তেমনি একগুঁয়ে ছিলেন। কোন কার্য্যে একবার 'না' বললে এই ভট্চায-নন্দনকে কেউ 'হাঁ' বলাতে পারতেন না,—এমন কি স্বয়ং কাঙাল হরিনাথও না। এমন দুর্দ্দমনীয় একগুঁয়ে ছেলের পাঠ পিতার কাছে বেশী দিন চল্‌ল না।

চন্দ্রকাকা তাকে নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দিলেন। অপূর্ব্ব মেধাবী শিবচন্দ্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণ, স্মৃতি ও দর্শনে বিশেষ অধিকার লাভ করলেন। কিশোর শিবচন্দ্রের এই অনন্য-সাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁর অধ্যাপকেরা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি হবেন, এ ভবিষ্যদ্‌বাণীও করেছিলেন। শিবচন্দ্রের কাছেই শুনেছি—তিনি যখন নবদ্বীপের টোলে অধ্যয়ন করতেন, তখন তাঁর সতীর্থগণের মধ্যে কেউই তাঁকে তর্কে পরাস্ত করতে পারত না। সেই সময়েই তিনি সংস্কৃতে ও সুললিত সাধু বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শিক্ষা করেন।

নবদ্বীপের পাঠ শেষ করে শিবচন্দ্র কাশীতে বেদান্ত পড়তে যান, কিন্তু সেখানে আর তাঁর বেদান্ত পড়া হোল না। যে তন্ত্রশাস্ত্র পুরুষানুক্রমে তাঁদের বংশে অল্পবিস্তর অধীত হয়ে আসছিল, সেই তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের সুপ্ত স্পৃহা শিবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগরূক হোল। চন্দ্রকাকার মুখেও শুনেছি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন হয়েছিলেন। যুবক শিবচন্দ্রের হৃদয়ে তন্ত্রালোচনার বাসনা বলবতী হোল। পূর্ব্বপুরুষগণের সাধন-মার্গ অনুসরণ করবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন। কাশীতে সে সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রের যাঁরা অধ্যাপক ছিলেন, যাঁরা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করতেন, শিবচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে মিশে গেলেন। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই কাশীতে তাঁর সুনাম প্রচারিত হোল, সু-বক্তা বলে

তাঁর প্রতিষ্ঠা হোল। তার পরই কাশী ত্যাগ করে তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র ঘরে ফিরে এলেন এবং পরম উৎসাহে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করলেন, তন্ত্র-তত্ত্বের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব নিতে আরম্ভ করল। তিনি সেই শিষ্যদের নিয়ে পঞ্চমকার সাধন আরম্ভ করলেন।

শিবচন্দ্রের সঙ্গে এই সময়ে আমার ধর্ম্মমতের পার্থক্য উপস্থিত হোল। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। (আমি তন্ত্র-শাস্ত্র পড়ি নি, এখনও তার কিছুই জানি নে; কিন্তু তা হলেও আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছিনে যে আমি তন্ত্র-শাস্ত্রের বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমি তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের সাধন কি, তা জানিনে। কিন্তু ঐ পাঁচটি ম-আদি নাম শুনে তখনও শিউরে উঠতাম—এখনও উঠি। রক্তবস্ত্র-পরিহিত সিন্দুর চর্চ্চিত-ললাট হাতে-গলায় এক রাশ মালা—এ মানুষ দেখলেই আমি দশ হাত দূরে সরে দাঁড়াতাম, এখনও দাঁড়াই। ও মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার তো করেই না, ত্রাসের সঞ্চার করে। আমি চোখ বুঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা স্মরণ করে কেঁপে উঠি।)

শিবচন্দ্র তন্ত্রের কথা আমাকে বোঝাবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা আমাকে কত পড়তে দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সেই তন্ত্র-মন্ত্র আমার মাথার ভিতর ঢোকাতে পারেন নি।

শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও আমি—এই তিনজন এক সঙ্গেই কাঙালের চরণপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলাম। শিবচন্দ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের ক্রিয়া-কলাপে সিদ্ধিলাভ করলেন। অক্ষয়কুমার তন্ত্র-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের পাশ দিয়েও গেলেন না। আর আমি যা হলাম তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। (বড় দুঃখেই এক সময় কাঙাল হরিনাথ বলেছিলেন—এই তিনটিকে মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার তো রকম দেখছিনে। তিনটি তিন রকম হোল। একজন হোল ফিকির, আর একজন হোল ফকির, আর একজন হোল মুসাফির। তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে—অক্ষয়কুমার উকিল হয়ে ফিকিরবাজ হলেন, তান্ত্রিক শিবচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন—ফকির হলেন; আর আমি মুসাফির হয়ে হিমালয়ে চলে গেলাম। কিন্তু কাঙাল হরিনাথের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অক্ষয়কুমার ও শিবচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্বের গৌরব ষোল আনা রক্ষা করে অমর-ধামে চলে গিয়েছেন।)

পূর্ব্বেই বলেছি—আমার সঙ্গে ধর্ম্মমতের ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শিবচন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিগূঢ়তর হয়ে পড়েছিল। তাঁর সেই রক্তবস্ত্র ভেদ করে এক পবিত্র মন্দাকিনীর প্রবাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হোত। তখন আমি ভুলে যেতাম যে শিবচন্দ্র তান্ত্রিক, আর আমি কিছুই না। শিবচন্দ্র যখন তাঁর গৃহে মাতা সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, আমি তখন তার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম, কায়মনোবাক্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলাম। এই যে পরস্পরে মতান্তর—এতে কখন মনান্তর হয় নি।

কলিকাতা হাইকোর্টের সেই সময়ের প্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন উডরফ শিবচন্দ্রের কাছেই তন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি শিবচন্দ্রের তন্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন তিনি এ-দেশে ছিলেন নানা ভাবে শিবচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। শিবচন্দ্রের তন্ত্র-তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ সার জন উডরফ ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এ-দেশে থাকতেই শিবচন্দ্র সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। এই সংবাদ শুনে মহামতি উডরফ তাঁর সংস্কৃতের অধ্যাপক অধুনা পরলোকগত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে শিবচন্দ্রের বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কুমারখালিতে পাঠিয়ে দেন। অবসর গ্রহণ করে বিলাতে গিয়েও তান্ত্রিক-শ্রেষ্ঠ মহামতি উডরফ শিবচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রের কথা বিস্মৃত হন-নি। সর্ব্বদাই তাঁদের সংবাদ নিতেন এবং সাময়িক সাহায্যও করতেন।

শিবচন্দ্র যে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সাধু ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার শক্তি সত্য সত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল; তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটি পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চল্‌তি

ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধু ভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সে কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করবেন। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শিবচন্দ্র ও পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি বাংলাদেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বান ডাকিয়ে এনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব (culture) সেই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর গীতা ও কৃষ্ণচরিত্র সেই সময়েই প্রকাশিত হয়। সে যুগ যেন বাংলা ভাষার একটা প্লাবনের যুগ—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের একটা প্রবল প্রচেষ্টা।

শিবচন্দ্র অনেক বক্তৃতা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন—সে সকলই পরম উপাদেয়; কিন্তু তাঁর তন্ত্র-তত্ত্বই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি যে কত গান লিখেছেন তার সংখ্যা করা যায় না। সেগুলি সাধকের অমূল্য রত্ন। এখনও আমাদের দেশের বহু লোক কাঙাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীত ও শিবচন্দ্রের মাতৃমহিমা গান করে থাকেন। এখনও শিবচন্দ্রের গৃহে মা সর্ব্বমঙ্গলার পূজা হয়। এখনও বাড়ী গেলে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মাতা সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন করে আসি। মন্দিরের পার্শ্বে যে বিল্বমূলে শিবচন্দ্রের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়েছিল, সেইখানে বসে তাঁর কথা স্মরণ করে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করি।

এইবার শেষ কথা।—শিবচন্দ্রের দেহাবসানের কথা বলেই আমার এই স্মৃতি-তর্পণ শেষ করি। মাতা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের পাশেই ছোট একখানি বাগান ছিল, এখনও আছে। সেই বাগানের বেড়া বাঁধবার জন্য একদিন মজুররা কতকগুলি বাঁশ কেটে ফেলে রেখেছিল। শিবচন্দ্র সেইখান দিয়ে যেতে তাঁর পায়ে একটা বাঁশের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বিঁধে যায়। পরদিনই পা ফুলে ওঠে ও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বলেন ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়েছে। তাঁরা তিন চার দিন ঔষধ ও প্রলেপের দ্বারা ঐ বিষের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ডাক্তারেরা তখন তাঁহার পায়ের কিয়দংশ কেটে বাদ দেবার প্রস্তাব করেন—শিবচন্দ্র তাতে সম্মত হন নি, তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনবার প্রস্তাবও তিনি অস্বীকার করেন; বলেন—মায়ের মন্দির ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। মন্দির পার্শ্বের সেই বিল্বমূলে যেন তাঁর দেহাবসান হয়।

আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। এই সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হই। দশদিন পর্য্যন্ত গ্রামের নরনারী সকলে মিলে শিবচন্দ্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিটে মন্দির-পার্শ্বস্থ বিল্বমূলের আসনে শিবচন্দ্রের দেহাবসান হ'ল। তাঁর আজীবন সঙ্গী আমি তাঁর শেষ নিশ্বাস বের হতে দেখলাম।

রাত্রি কেটে গেল। প্রত্যুষে গ্রামের সকলে শিব-চন্দ্রের নশ্বর দেহ গৌরী নদীর তীরে চিরদিনের জন্য চিতাভস্মে পরিণত করে ফিরে এলাম। আজ ২৩ বৎসর পরে আমার চির-সুহৃদ সিদ্ধ সাধক আবাল্য-বন্ধু শিবচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ করলাম। শিবচন্দ্রের প্রতিকৃতি এই মাসের প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইল।

বড়দা

শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পও নয়, কথিকাও নয়, আমাদের দুর্ভাগ্য কেরাণী-জীবনের আনন্দোজ্জ্বল একটা অধ্যায়, আমাদের হাওড়া-শিয়াখালা লাইনের ন'টা চুয়ান্নর বড়দার কথা।

বড়দার আসল নাম নবগোপাল বাড়ুয্যে, শিয়াখালার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। পড়াশুনায় মাথা আছে দেখে তাঁকে তাঁর বাবা লোকের কথা উপেক্ষা ক'রে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বড়দা ওখানে এক কায়স্থ ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলেন। গাঁয়ের প্রবীণরা ওঁর বাবাকে "গুরুবাক্য না শুনে কানে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে" এমন ধারা শোনাতে আরম্ভ ক'রলেন যে তিনি হ্যাঁচকা টানের ঠেলায় কাশীতে এক শিষ্যের বাড়ীতে গিয়ে বাঁচেন।

বড়দার কিন্তু রোখ হ'ল গাঁয়ে বাস ক'রতে হবে, যে ক'রেই হ'ক। শ্বশুরের বারণ সত্ত্বেও সস্ত্রীক গাঁয়ে এলেন। গাঁয়ের লোকরা ক্ষেপে উঠ্‌ল, একঘরে ক'রলে—ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রলে। বড়দা দু-পয়সার যায়গায় চার পয়সা খরচ করে নেপথ্যে কাপড়ও কাচালেন, চুলও কাট্‌লেন। বৌদি অন্নপূর্ণা দেবীও সাধারণের সঙ্গে পুকুরঘাটে একসঙ্গে যাতায়াত ক'রতেন এবং যাবতীয় কটাক্ষবাণ হাসি মুখে শুনে আস্‌তেন।

বড়লোকের মেয়ের এমন ধারা জেদ কেন, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়েছিল। প্রবীণরা বল্‌তেন এ নাকি গাঁয়ের মাথা খাবার জেদ, আচারনিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পল্লীর মধ্যে অনাচার ঢুকিয়ে দেবার জেদ।

গাঁয়ের লোকরা বিপদে পড়্‌ল, এরা কোন কথা নিয়ে মাথা ঘামান না—তর্ক করেন না। সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিতেন।

(২)

দিন কেটে চল্‌ল। গাঁয়ের দুঃখ বাড়্‌ল, দারিদ্র্য বাড়্‌ল এবং প্রবীণরাও একে একে গত হ'লেন। বড়দা এবং বৌদির বাবা বৌদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সহজ এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ভাল ক'রেই শিখিয়েছিলেন, কাযেই গাঁয়ের ঘরে ঘরে বৌদির ডাক পড়্‌তে দেরী হ'ল না এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর ম্লেচ্ছের অখ্যাতিটা চাপা পড়ে গেল। চাষা-ভূষার ঘরে বড়মা ব'লে তিনি মস্ত একটা সম্মানের পদ লাভ করলেন। গরীবের ঘরে শোকে দুঃখে বড়মাই সব থেকে বড় আত্মীয়া হ'য়ে উঠ্‌লেন। বড়দাও কালের গতিতে তাল রেখে ন'টা চুয়ান্নর ডেলি-প্যাসেঞ্জার হ'য়ে শ' তিনেক ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নিলেন।

প্রথম দিন দেখি ন'টা চুয়ান্ন এসে দাঁড়াতেই বছর চল্লিশ বয়সের মোটা-সোটা ফর্সা এক ভদ্রলোক ট্রেণ থেকে কাঁচা-পাকা-দাড়ি সমেত চশমা আঁটা মুখ বের ক'রে—বিচিত্র নামের লিষ্টির একটা ছড়া কেটে হাঁকলেন। অমনই চারদিক থেকে রব উঠ্‌ল "এই যে বড়দা সব আছি।" আমি তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের ওঠবার ব্যাপার দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বড়দা আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "ও গোপাল! দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে কেন বাপ্? এদিকে আয়"—ব'লেই হাত বাড়িয়ে জানালা গলিয়ে আমায় টেনে তুল্‌লেন। দেখ্‌লাম বুড়া হলেও হাতের কব্জীটা আমার পায়ের গোছের মত। আমায় বল্‌লেন "বাপধন! ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের কাছে প্রবেশের পথ হিসেবে যে জানালা দরজায় কোন ভেদাভেদ নেই—তা আজ থেকে জেনে রাখ।" কথাটা খুব সত্য।

গাড়ীতে উঠে দেখি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকা কারও কুষ্টিতে লেখে নি। তাস, পাশা, দাবা, যাত্রার হাফ আখড়াই চলেছে এমন ভাবে—যে গাড়ী দাঁড়িয়েছে বারোয়ারী বৈঠকখানায়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল বরিঝাটির কৈলাস দত্তের খবরের কাগজ মারফত মজার মজার খবর শোনান। শোনাবার আগ্রহের আতিশয্যে পড়ার রকম ও ভুলপ্রমাদগুলি আরও মজাদার হ'য়ে

উঠ্‌ত। মনে আছে কৈলাস একদিন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"বড়দা বড়দা মজার খবর অশনি নিপাত।"

বড়দা চশ্‌মা কপালে তুলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমনভাবে ব'লে উঠলেন "অশনি নিপাত? বলিস্ কি কৈলেস? মানে বজ্রপাত বন্ধ তা'হলে?"—যে কৈলাস পর্য্যন্ত না হেসে থাক্‌তে পারে নি। কৈলাস ভুল সংশোধন ক'রে পড়্‌ল "অশনি নিপাত নয়, অশনি পাত।"

বড়দা—"ও পাত নিপাত একই, তারপর?"

কৈলাস পড়্‌তে লাগ্‌ল "গতকল্য অশনি পাতের প্রচণ্ড নিনাদে রামপুরহাটের জনৈক গোয়ালার এগারটি দুগ্ধবতী গাভী দড়ি ছিঁড়িয়া উধাও। অদ্যাবধি কোন সংবাদ-পত্র পাওয়া যায় নাই।"

বড়দা—"সংবাদ-পত্র না পাওয়া যাক্ চিঠিপত্র অন্ততঃ একখানাও পাওয়া গেছে কি?"

আমরা হেসে অস্থির, কৈলাস বল্‌লে "ও! সংবাদ-পত্র নয়, সংবাদ।"

বড়দা—"ও একই; সংবাদ-পত্র না হ'লে সংবাদ পাবে কি ক'রে লোকে।"

চণ্ডীতলার পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন "কাগজওয়ালাদেরও খেয়ে-দেয়ে কায নেই। গরু পালাল—খবর, তাও কাগজে লিখ্‌তে হবে?"

বড়দা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন "হবে না কেন শুনি? এগারটি দুগ্ধবতী গাভীর যায়গায় একটি পুত্রবতী বধূর নিরুদ্দেশ সংবাদ শুন্‌লে দেশশুদ্ধ লোক মিলে হৈ-হৈ কর্‌তে ত? আরে বামুন পণ্ডিত! তুমি গোয়ালার দুঃখ কি বুঝ্‌বে? ঐ যে তোমাদের শাস্ত্রে আছে—দেশে দেশে কলত্রানি, দেশে দেশে চ বান্ধবা, তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র দুগ্ধবতী গাভী—"

আমরা বড়দার নজিরের বাকীটা হাসির রোলে আর শেষ হ'তে দিই নি। পণ্ডিতমশায়ের মত ব্যক্তিও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারেন নি। গাম্ভীর্য্য রাখার জো এখানে একেবারে ছিল না। বড়দার চোখের চাউনি, ব্যাখ্যা, বিচার—বৈজ্ঞানিক laughing gasএর থেকেও ভয়ানক ছিল।

বড়দার মিনিটে মিনিটে ডাক্ পড়্‌ত সালিশি করতে—কোন অর্ব্বাচীন কোন প্রাচীনকে তাস খেল্‌তে ব'সে চোখে ধুলা দেবার চেষ্টা করছে, কে বেহাগে ভৈরবীতে খিচুড়ি পাকাচ্ছে। নিতাই একদিন আমার পরম পূজনীয় জেঠামশায়কে তাসে হাজারের খেলা দেখাতে চাওয়ায় জেঠামশায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ভুলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "বাঁড়ুয্যে, তোমার নিতের সাহস দেখ? আমায় হাজারের খেলা দেখাতে চায়?" বড়দা বল্‌লেন "সাহস হবে না কেন ব্রজ, ওই নিতের পিতে ওর বে'তে ওর শ্বশুরকে দু-হাজার একএর খেলা দেখিয়েছেন—তাতেই ভদ্রলোক সেই থেকে ফেরার।" এমন কাজির বিচারে কেউ না হেসে থাক্‌তে পারে নি। আর একটা অভিযোগ মেটানর নমুনা দিই। বলুহাটির সঙ্গীববাবুর গলাটা ছিল একটু চড়া রকমের। বাকি সামান্য পথটুকুতে তাঁর "কচে-বার" "ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যাক্কা" প্রভৃতির হুঙ্কারে পথের গরুবাছুরগুলি পর্য্যন্ত চম্‌কে ওঠার যোগাড়। তাঁর প্রসঙ্গে পণ্ডিতমশায় একদিন বড়দাকে বল্‌লেন "বাঁড়ুয্যে, তুমি এক সময় ওকে ওরকম চেঁচাতে বারণ ক'র। হাজার হ'ক কোম্পানীর গাড়ী। অমন ষাঁড়ের মত গলা।" মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড়দা বল্‌লেন "ওটা হ'ল ওর প্রাক্তন, পূর্ব্ব জন্মের জিনিষ। আরে, আর জন্মে ঐ ত তোমাদের হিতোপদেশের সঞ্জীবক ছিল—যার নাদ শুনে সিংহেরও—তোমার কি বলে—পিলে চম্‌কে উঠেছিল। ওর রাসনামে উঠ্‌ল 'স', বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

হাসির রোল উঠ্‌তে সঞ্জীববাবু বল্‌লেন "আমি কি একটু বেশী চেঁচাই বড়দা?"

পণ্ডিতমশায় বল্‌লেন "বাবা! তোমার বিনতি দেখে প্রণতি জানাচ্ছি—ওর নাম কি একটু বেশী?"

বড়দা হেসে বল্‌লেন "শোন তবে গলার কথা বলি। আমি বছর কতক আগে একবার কাশী গিয়েছিলাম—"

কৈলাস জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় ছিলেন? হাতীফটকায় নিশ্চয়?"

বড়দা—"না ষাঁড়্‌ফট্‌কা—"

সবাই বল্‌লে "সে আবার কি বড়দা—?"

বড়দা—"যায়গাটার নাম বাইরে বাঙ্গালীটোলা, কাশীতে ষাঁড়ফটকা। অর্থাৎ ওখানে গিয়ে ষাঁড়ফটকা না হ'য়েছেন এমন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিরল। তার পর শোন। একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়েছি, সাড়ে ন'টা হবে। তন্দ্রাও এসেছে—এমন সময় মনে হ'ল পৌনে তিন ডজন সঙ্গীর

বাজখাঁই গলায় একসঙ্গে তারস্বরে চীৎকার ক'রছে। কদিন আগে ডাকাতি হ'য়ে গেছে; ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লাম। এমন সময় সাম্‌নের ঘর থেকে বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হ'য়ে বল্‌লেন "জেগে আছেন নাকি?" বল্‌লাম "জেগে উঠেছি।" বল্‌লেন "শুন্‌ছেন একবার তালখানা? লালাবাবুর মত গলা মশায় বাঙ্গালা মুলুকে মেলবার নয়।" আমি বল্‌লাম "রামচন্দ্র! ও তাল ঐ পিলেরগীর দেশে জান-মারা ব'লে অস্ত্র আইনে আট্‌কে যাবে যে।" কে বা শোনে কার কথা, ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন "এই শিবের স্তব, আহা! উনি এমন তন্ময় হ'য়ে গান, যে বাঙ্গালীটোলার প্রত্যেক বাড়ী থেকে স্পষ্ট শোনা যায়।" আমি বল্‌লাম বাঙ্গালীটোলা ত ছার, ও তাল কৈলাসে স্বয়ং মহাদেবের কান পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে নিশ্চিত। আসার সময় তাঁকে জিজ্ঞেসা ক'রেছিলাম "আচ্ছা লালাবাবু, এ গান নিজেই শিখেছেন—না ওরও গুরু কেউ ছিলেন?" ভদ্রলোক মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লেন "ছিলেন বৈ কি; গুরু নইলে কি সাধনা হয়? উনিও ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি একজন অবতার বিশেষ ছিলেন; তাঁরই একটা কি সুরে ত ওবাড়ীর খিলেনটা চিড় খেয়ে র'য়েছে। আহা গেল বছর তিনি দেহ রক্ষা ক'রেছেন মশায়, একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেছে মশায় এ দেশের" ব'লে চোখ মুছ্‌লেন—আমিও দেখাদেখি মুখ মুছলাম; গুরুদেবের চিড় খাওয়ান সুরের কথা শুনে ঘেমে ওঠার যোগাড় আর কি। ভাবলাম দেহরক্ষা ক'রে বাড়ীওয়ালা আর বাসিন্দা উভয়কেই রক্ষা ক'রেছেন। বলাই বাহুল্য পণ্ডিত মশায়ের অভিযোগের সমাধান হ'য়ে গেল।

(৩)

এ সব মজ্‌লিশি ব্যাপার ছাড়া বড়দা'র আরও কায ছিল। বিয়ে পৈতের দিন দেখা, বিপদে আপদে সাহায্য করা, সামাজিক ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, পথের যাত্রীদের কে আসে নি, তার অসুখের খবর নেওয়া—ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া আদি ক'রে কত আর ব'লব। এ সব ওই "দেখ্‌ছেন ত?" "শুন্‌ছ ত?"—"এদিকে মুখ বাড়াবেন ত" র ফুরসতে চল্‌ত। ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর খুব হাতযশ হ'য়েছিল। এমন কি ওঁর আফিসের এক বুড়া সাহেবের হাতে পর্য্যন্ত অর্শের আংটি স্থান পেয়েছিল এবং তাঁরই কল্যাণে বহু মায়ে-খেদান বাপে তাড়ান স্কুল-পালান ছেলের এবং অনেক গোবরগণেশের অন্নসংস্থান হ'য়েছিল।

আফিস ফেরতা মজ্‌লিশ আরও জমে উঠ্‌ত, বিশেষ ক'রে কৈলাসের দৌলতে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টিতে কথাবার্ত্তা জম্‌ছিল না, কৈলাস বলে উঠ্‌ল "বড়দা, এবার হোমরুল হবে।" বড়দা ঘোর নৈরাশ্যের ভাব দেখিয়ে দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বল্‌লেন "আ পোড়া কপাল! এবার খালি হোমরুল? বৃষ্টি বাদ্‌লা দেখে আশা হ'য়েছিল বুঝি ভাল জামরুল হবে, তা শেষে কিনা হোমরুল? কপাল আর কাকে বলে!" বলাই বাহুল্য আমাদের নুয়ে পড়া মন আবার হাসির ফোয়ারায় সতেজ হ'য়ে উঠ্‌ল।

আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ক্লান্তি কোথা দিয়ে ভুলে গেলাম।

(৪)

বড়দার গাঁয়ের বারোয়ারী হ'ত ওঁরই বাড়ীর সাম্‌নে; ওখানকার লোককে বল্‌তে শুন্‌তাম "এ আমাদের বারোয়ারী নয়, বড়বাবু বড়মার কায। সত্যই তাই। বড়দা বৌদির অক্লান্ত চেষ্টায় কোন কাযেই বারোয়ারীর অসংযত ব্যাপার বিন্দুমাত্র দেখা যেত না—মনে হ'ত তাঁদেরই ঘরের কাজ। গাঁয়ের লোক গরীব বটে, কিন্তু এইসব উৎসবে চাল ডাল তরিতরকারী ইত্যাদি ক'রে জিনিসপত্র তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দিয়ে যেত। উৎসবের নাচ গান প্রভৃতি—যে গুলিতে বেশী পয়সার খেলা—সে গুলি বাদ্ পড়লেও খাওয়া দাওয়ার ভেতরে আনন্দ কারুর কম হ'ত না। বারোয়ারীর কথা বাদ দিলেও দেখেছি যে যা পেয়েছে, নতুন গাই বিয়ালে দুধ, নতুন গুড়ের সন্দেশ, তরিতরকারি মাছ আদি ক'রে নানা জিনিস নানা অছিলায় ওঁদের দিয়ে গেছে। ছুটিছাটার দিনে আমরা প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে যেতাম। অন্নপূর্ণার অন্নসত্রের প্রসাদ এবং বড়দার রসেভরা কথা শুনে কৃতার্থ হ'য়ে আসতাম। বড়দা আর বৌদির মতন মানুষ দেখে আমি ভাবতে পারতাম না এঁরা কি দিয়ে তৈরী। কেমন ক'রে এতখানি আত্মবিস্তার ক'রেছেন। অবস্থা ওঁদের এমন কিছু নয়; বড়দা সামান্য মাইনের

কেরাণী। কিন্তু মাটির বাড়ীখানি কি সুন্দর সাজান; ফল ফুলের গাছে বড়দার মস্ত নেশা ছিল; নিজে হাতে যে বাগান ক'রেছিলেন তা দেখবার মত। দান খয়রাতের ত অন্ত ছিল না। এমনই ক'রে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বড়দা নটা চুয়ান্নর দাবার চাল, তাসের হাজার, কৈলাসের হোমরুল, আশু মোক্তারের সুরের খিচুড়ির সালিশি ক'রে রোগের দাওয়াই, সময়ের নির্ঘণ্ট এবং বেকার সমস্যার সমাধান ক'রে, আমাদের দুর্ভাগ্য ডেলিপ্যাসেঞ্জারকুলের গ্লানি মুছে দিয়ে এসেছেন। গাঁয়ের লোকের উৎসবে অভাবে অভিযোগে বুক দিয়ে খেটেছেন এবং গাঁয়ের সর্ব্ববিধ মঙ্গলাচরণে, রোগের সেবায়, কৌলিক আচারে, অন্নপূর্ণাদেবীও বড়দার অনুকুল কায ক'রে জীবন কাটিয়ে আস্‌ছিলেন।

(৫)

তারপর দুর্দ্দিনের ঝড় এসে আমাদের এই ছায়া-ফলদাতা, আমাদের ক্লান্তিহরা বিরাট মহীরূহকে একদিন এমন প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল, যে সে বেগ সহ্য না ক'রতে পেরে এতদিনের পুরাণ বৃক্ষ ধরাশায়ী হ'ল। বৌদি অন্নপূর্ণার অন্নসত্রের হাট ভেঙ্গে একদিন চলে গেলেন। সে আঘাতের পর বড়দা একটা মাস বেঁচেছিলেন, আমাদের সঙ্গে হেসে কথা ক'য়েছিলেন—কিন্তু সে হাসির উৎসস্থল যে শুকিয়ে এসেছে তা আমরা বুঝতে পারতাম। থেকে থেকে তিনি বিমনা হ'য়ে পড়তেন, কিন্তু কখনও রুদ্ধ ঘরে ব'সে হাহাকার করেন নি। তখনও কোন চাষা আলুর ক্ষেতে জল বাঁধ্‌ছে না, কার কপির ক্ষেতে পোকা লাগ্‌ছে, কার অসুখ, কার বিসুখ—সব খবরই রাখ্‌তেন। ছুটির দিনে আমরা আরও সকাল সকাল যেতাম। বড়দা বলতেন "তোমাদের বৌদি তোমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে রেখে গেছেন। ঐখানে চিঁড়ে আছে, ঐখানে গুড় আছে, ঐটাতে কলা আছে, এবার নিজে হাতে নিয়ে খেতে হবে এই যা।" তারপর বল্‌লেন "যাবার সময় বল্‌লে, যা রেখে গেলাম তাতেই সংসার চলে যাবে।"

বৌদির শেষ কথাটার ইঙ্গিত সেদিন বুঝলাম—যখন ঠিক এক মাস পরে রেখে যাওয়া জিনিষপত্তর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দা ভোরবেলা আহ্নিক ক'রতে ক'রতে দেবলোকে চলে গেলেন। সকালে হারাণ ঘোষাল ডাকতে এসে দেখ্‌লে বড়দা কথা কইছেন না, চোখ বুঁজে ব'সে আছেন। তখনই হৈ চৈ ক'রে লোক জড় ক'রলে। বড়দা মানুষের ডাককে কখনও পূজার নীচে স্থান দেন নি। ডাক যখনই কানে গেছে তখনই সাড়া দিয়েছেন। তা পূজাই কি আর অন্য কাযই কি? কাযেই হারাণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি খবর পেয়ে আফিস কামাই ক'রে এসে দেখি, অর্দ্ধেকেরও বেশী ডেলিপ্যাসেঞ্জার জীবন মরণ চাকুরি উপেক্ষা ক'রে এসে হাহাকার ক'রছে। সঞ্জীববাবুর উচ্চরোলের কান্নায় আজ আর পণ্ডিতমশায়ের রাগ নেই, তিনিও কাঁদ্‌ছেন। পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে প'ড়েছে, ইতর ভদ্র মেয়ে পুরুষ কেউ বাদ নেই। ফিরে দেখি নটা চুয়ান্নর বুড়ো মুসলমান ড্রাইভার হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। তারও মুখে বড়দার গুণপনার কথা—কবে তার ছেলে যেতে যেতে বড়দার ওষুধে বেঁচেছে, কবে তিরিশ-টাকার জন্য জেলে যাবার দাখিল হ'তে বড়দা সে টাকা দিয়ে বাঁচিয়েছেন তাকে।

আশে পাশে কেবল বড়দার গুণের কথা, বৌদির কথা। মেয়ে মহলে কে যেন সুর ক'রে ক'রে কাঁদ্‌ছিল "আহা মাটির মানুষ ছিল গো বড়বাবু—"

মনে হ'ল খুব খাঁটি কথা; বড়দা বড়মানুষ ছিলেন না, মহাত্মাও ছিলেন না, ছিলেন মাটির মানুষ। মৃত্তিকাজাত মহীরুহের মতই শ্যামল পত্রপল্লবের ছায়ায় এত লোককে প্রাণপণে সকল গ্লানির সকল দুঃখের হাত থেকে ছায়া ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর সরসতা সত্যই মাটির সরসতার মত প্রাণদায়িনী ছিল। হে ভগবান্! তোমার মাটির পৃথিবীতে এমনই ধারা ক'জনা মাটির মানুষ সৃষ্টি ক'রে তাপক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ দূর কর।

পম্পেয়াই ও ভিসুভিয়স

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাস্তার ধারে একটি বাড়ীতে আমরা ঢুকলাম। বাড়ীর সবই আছে শুধু অনেকাংশের ছাদ নাই। পম্পেয়াইএর বাড়ীগুলির গঠনভঙ্গী প্রায় একরকম, অবশ্য ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী অল্প-স্বল্প ইতর-বিশেষ আছে। সদর দরজার পর প্রথমেই একটি উঠান, উঠানের চারধারে ছোট ছোট জানালাবিহীন ঘর। ঘরগুলি থেকে পরচালা নেমে এসে উঠানের চারদিকে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে কিন্তু মাঝখানটি খোলা। এই দিক দিয়ে বৃষ্টির জল এসে উঠানের মাঝে মর্ম্মর চৌবাচ্চায় জমা হ'ত। পরিষ্কার পানীয় জলের এখানে অভাব ছিল, তাই এই ব্যবস্থায় জল সংগৃহীত

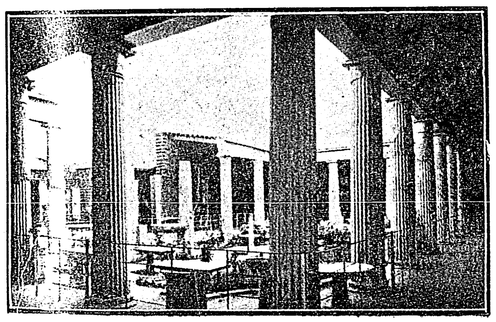

ভেতির বাড়ীর অলিন্দ ও বাগানের একাংশ

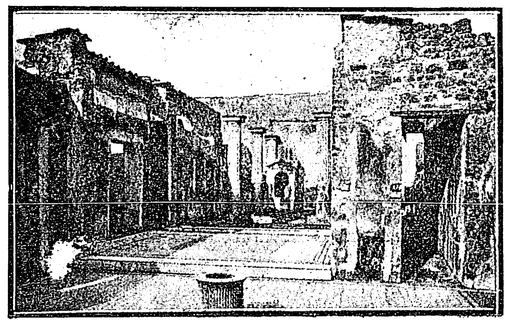

বিয়োগান্ত কবির গৃহ

হ'ত। প্রথম চত্বরে সাধারণতঃ টাকা-কড়ি নেওয়া দেওয়া ও বৈষয়িক কাজকর্ম্ম চ'লত। এর পরের চত্বরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। তার পরে বেশ সুবিন্যস্ত বাগান। এই বাড়ীটির অনেকগুলি ঘরের দেওয়ালের রং ও মেঝের মোজায়েক চিত্রগুলি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ভোজনের মর্ম্মর টেবিল ও অন্যান্য পাথরের আসবাবের কিছু কিছু এখনও ইতস্তত পড়ে আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই গৃহ দেবতার জন্য একটি পৃথক ঘর ছিল। দেবতার বেদীর নীচে অনেক বাড়ীতে সাপ আঁকা আছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই ক্রীতদাসদের যাওয়া আসার জন্য বাড়ীর পাস দিয়ে একটি পৃথক গলি পথ ছিল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকবার অধিকার তাদের ছিল না।

একটি বাড়ীতে এক লৌহ ফটকের কাছে একটি সমগ্র ক্রীতদাস পরিবারের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। যে দিন ভিসুভিয়াস রুদ্রদেবের ক্রুদ্ধ ইঙ্গিতে খণ্ড প্রলয়ের উদ্দেশ্যে মেতে উঠেছিল, সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ধনীরা যখন প্রাণ নিয়ে সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও তারা নিজের প্রাণের মূল্য দিয়ে ক্রীতদাসদের প্রাণের বেদনা বোঝে নি। অনেক পরিবার সদর দরজায় চাবি দিয়ে ক্রীতদাস পরিবারকে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। সেই সব হতভাগ্য পরিবারদের অনেকে একত্র পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাদের অস্থি-চর্ম্ম বহুদিন ভস্মস্তূপের মাঝে লীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ওপরের ছাই ওপরেই চাপে ও জলে জমাট বেঁধে গিয়েছিল (ভূমিকম্প ও ভস্মবৃষ্টির অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি হয়)। পরে বৈজ্ঞানিকেরা কৌশলে জমাট বাঁধা ছাইএর মধ্যে প্যারিস প্লাষ্টার (কাদা-মাটি) ঢেলে দিয়ে ভেতরের মূর্ত্তিগুলি যে ভঙ্গীতে মারা গিয়েছে তাদের

অবিকল ছাঁচ তুলেছে। এই ছাঁচগুলির কয়েকটি এমন নিখুঁত রূপ নিয়েছে যে তাদের দেহের প্রতি রেখায়, প্রতি ভঙ্গিমায় মরণোন্মুখ জীবগুলির মৃত্যু-যন্ত্রণা পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। একটি পরিবার, একটি একক পুরুষ ও একটি কুকুর, তাকে বোধহয় তাড়াতাড়ির মধ্যে মনিব খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, এমনই ছাঁচের মূর্ত্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এর পর "হাউস অব ভেতি" (House of Vetti), হাউস অব ফাউন (House of Foun), হাউস অব ল্যাবিরিন্থ (House of Labyrinth), হাউস অব গোল্ডেন কিউপিড (House of Golden Cupid), হাউস অব সিলভার ওয়েডিং (House of silver ওয়েডিং) "হাউস অব পান্সা" (House of Pansa)

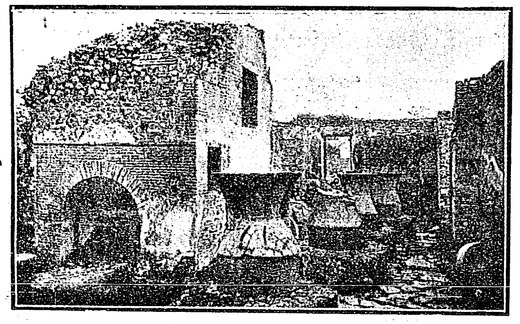

পাথরের জাঁতা ও রুটি সেঁকবার উনুন

প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বড় বাড়ী দেখলাম। সবগুলির বিশেষ বিবরণ আজ তিন বছর পরে সঠিক মনে নাই। সবগুলিতেই অল্প-বিস্তর রং, চিত্র-শিল্প ও মর্ম্মরের কাজ দেখেছিলাম এইটুকুই মনে আছে। তবে এদের মধ্যে আজও বিশেষ ভাবে মনে আছে 'হাউস অব ভেতি'। এটিকে বর্ত্তমানে গাছপালা দিয়ে ও পুনর্নির্ম্মাণ করে পূর্ব্বে যেমন ছিল কতকটা তেমনি করা হয়েছে। বাড়ীটি দোতালা। দু-হাজার বছর আগেকার হলেও বাড়ীটি আজকের বিংশ শতাব্দীর যে কোনও লোক বাস করবার জন্য পছন্দ করবে—শুধু নীচের ঘরে কয়েকটা জানালা ফুটিয়ে নিলেই হবে। এই বাড়ীটির প্রধান দরজার পাশে একটি কুলঙ্গীর মধ্যে একটি অশ্লীল চিত্র আছে—সেটি বর্ত্তমানে একটি কাঠের ছোট দরজা দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। এমনই অশ্লীল চিত্র পম্পেয়াইএর অনেক বাড়ীতে আছে; বিশেষ করে ব্যক্তিগত স্নানাগারগুলিতে এদের বাহুল্য চোখে পড়ে। এ বাড়ীর স্নানাগারেও অনেকগুলি অশ্লীল চিত্র আছে। বাড়ীর রক্ষককে কিছু বকশিস্ দিলে সে সব ঘরগুলি যত্ন করে দেখায়, সাধারণতঃ এই চিত্রগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই নিয়ম।

'হাউস অব ভেতির' ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড উদ্যান ও ফোয়ারা; একটি ঘরের সমস্ত দেওয়ালে আগাগোড়া বিভিন্ন রংএর ছবি আঁকা আছে। এটি নাকি ভোজনশালা ছিল। এই বাড়ীটিকে এখন এক বিরাট শ্মশানের মধ্যে ছোট্ট সজীব রঙ্গীন গোলাপ মনে হয়। চতুর্দ্দিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে এক বিরাট শ্মশান—তার মাঝে এই বাড়ীটি প্রাণের স্পন্দন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

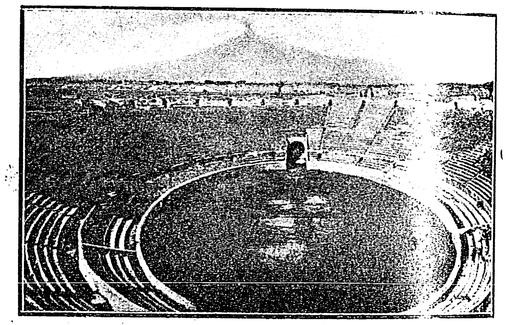

এম্পি-থিয়েটার

এই বাড়ীটি থেকে আবার প্রধান রাস্তায় (via di nola) এসে একটু পশ্চিমে যেতেই বাঁয়ে পড়ে সাধারণ স্নানাগার ও তার পাশে ভাগ্যদেবীর মন্দির। মন্দিরটির মধ্যে এখন দ্রষ্টব্য কিছু নাই তবে স্নানাগারটি এখনকার প্রধান দ্রষ্টব্যের অন্যতম। স্নানাগারটির তিনটি অংশ। একটিতে খুব গরম জল (Caldarium), অপরটিতে মৃদু গরম জল (tepidarium), তৃতীয়টিতে ঠাণ্ডা জলের (Frigidarium) চৌবাচ্ছা ছিল। এ ছাড়া একটি প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা উঠান আছে সেখানে স্নানের পূর্ব্বে নাগরিকরা ব্যায়াম ক'রত। এখানে এখনও একটি পাথরের বড় গোলা (সাধারণ ফুটবলের আকারের) পড়ে আছে। ইচ্ছে ক'রলে নড়িয়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করা যায়। মনে হ'ল আগেকার লোকরা সত্যই ঢের বেশী শক্তিসম্পন্ন

ছিল, নইলে অত ভারী পাথরের বল নিয়ে খেলা করা সহজসাধ্য নয়।

এখানকার দেওয়ালের কয়েকটি চিত্র এখনও বেশ চমৎকার আছে। ছাদের খিলানের নীচে এ্যাপোলো, কিউপিড প্রভৃতির কয়েকটি চিত্র শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এর গরম জলের ঘরটির দেওয়াল বরাবর ফাঁপা। কয়েক জায়গা ভেঙ্গে যাওয়ায় এর গঠনভঙ্গী দেখা যায়। এই ঘরের পাশেই আগুন জ্বালাবার ঘর। সেখান থেকে গরম হাওয়া এই ঘরের দেওয়াল ও মেঝের তলা দিয়ে চালান হ'ত এবং গরম জল চৌবাচ্চায় পাঠান হ'ত। পরে সেই হাওয়া ও জল ক্রমশঃ অল্প ঠাণ্ডা হলে মৃদু-গরম জলের ঘরে পাঠান হ'ত। মেয়েদের ঘরের দেওয়ালে

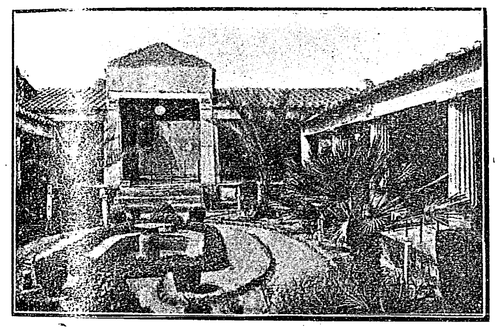

একটি আংশিক পুনর্গঠিত বাড়ী (House of gilded loves)

কাপড়-জামা রাখবার হুকগুলি পুরুষদের চেয়ে যে খাটো এ তারই প্রমাণ।

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে চোখে প'ড়ে একটি মস্ত তোরণ। এই তোরণটি পার হ'য়ে সামনেই পড়ে 'ফোরাম'। 'ফোরামে' বাজার হাট ব'সত—লোকরা অবসর সময়ে জটলা করত, পাশেই ছিল বিদ্যালয়, কাজেই ছুটির সময় নিশ্চয়ই ছেলেরা এখানে হুড়োহুড়ি বাধাত। রোমায় যে সব রাজাদেশ প্রচারিত হ'ত তার প্রতিলিপি এখানের দেওয়ালে ও থামে লেখা হ'ত। এমন প্রতিলিপি খননের ফলে পাওয়া গিয়াছে। এর পাশে কোন ব্যক্তিগত বাড়ী নাই; চারদিকেই মন্দির, বিচারালয়, বাজার ইত্যাদি। এর আয়তন ৪৬৭ × ১২৬ ফিট। এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটির চারদিকে পাথরের থাম ছিল, তার ওপর দোতলা বাড়ী ছিল। ওপরের তলার কোন চিহ্ন এখন নাই; শুধু তিনটি সিঁড়ি ও কয়েকটি খিলানের দাগ থেকে দোতলার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের ছোট ছোট থাম

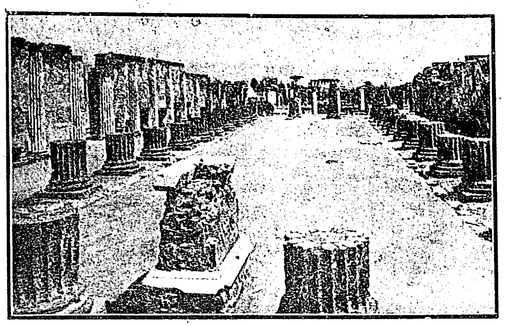

সমগ্র ব্যাসিলিকা

পড়ে আছে—এগুলির ওপর আগে বিখ্যাত লোকদের ও প্রজানুরঞ্জক রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি থাকত। পরে সে গুলি স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে। এটির প্রবেশ পথের দু-পাশের দুটি স্তম্ভ দেখিয়ে গাইড বোল্লে পূর্ব্বে এখানে সামনা-সামনি দুটি দেব-দেবীর মূর্ত্তি থাকত; তাদের ভেতরে দুটি নল

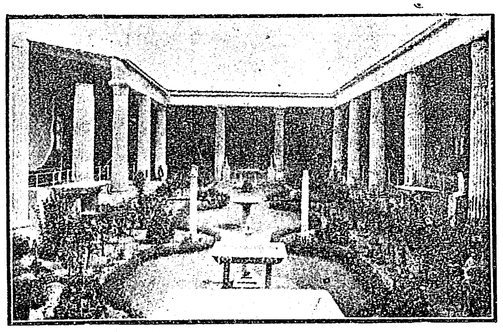

ভেতির বাড়ীর উদ্যান

মুখ পর্য্যন্ত ছিল, নলের অপরদিক লুকান থাকত পুরোহিতের ঘরে। পুরোহিতেরা দূর থেকে সেই নলের মধ্য দিয়ে নানা জটিল বিষয়ের উত্তর দিয়ে ও গুরুতর সমস্যার সমাধান করে লোক ঠকিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার ক'রত। ফোরামের উত্তর দিকটা প্রায়

জুড়ে আছে একটি বিরাট মন্দিরের উঁচু পাদপীঠ। মন্দিরটি এখন নেই, কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ থেকে মন্দিরটির পূর্ব্বাকার অনুমান করা শক্ত নয়। এটি জুপিটারের মন্দির বলে খ্যাত। এর উঁচু বেদীমূল থেকে নাগরিক-

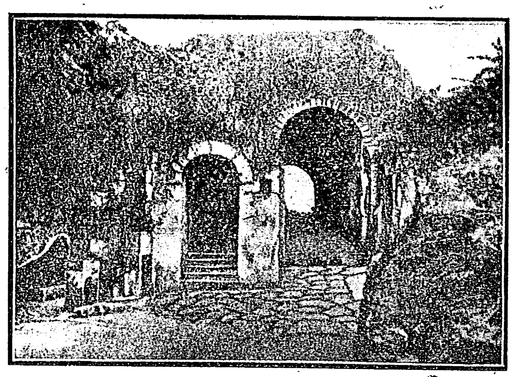

সমুদ্র তোরণ—এর কাছেই যাদুঘর

শ্রেষ্ঠরা বক্তৃতা দিতেন। ফোরামের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সাধারণে তা শুনত। মন্দিরে তিনটি বেদী আছে—একটি জুপিটারের, দ্বিতীয়টি জুনোর এবং তৃতীয়টি মিনার্ভাদেবীর। এর পাশেই সহরের ধনাগার ছিল। ফোরামের পাশেই বাজার। (এ জায়গাটি এখন শিক দিয়ে ঘেরা আছে।) বাজারের খিলানওয়ালা ঘরগুলি

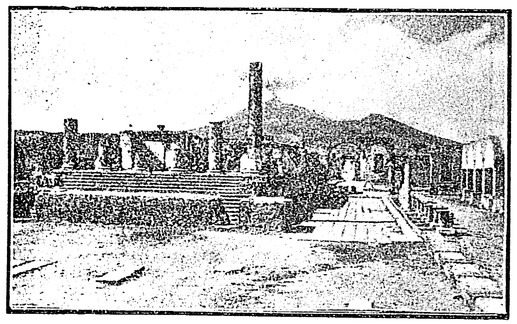

ফোরামের একাংশ—জুপিটারের মন্দির, ডানদিকে বাজারের একাংশ।

এখনও আছে। দোকানগুলির প্রায় সবই উত্তর-মুখো—বোধ হয় তরিতরকারী এবং মাছ মাংস যাতে রৌদ্রে নষ্ট না হয় এই জন্যই এ ব্যবস্থা। বাজারের পাশেই ভেসপেসিয়ানের (Vespasian) মন্দির দ্রষ্টব্য। এখানে একটি বেদী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মর্ম্মরের বেদীটি এমন অক্ষত ও সুন্দর—যে দেখে মনে হয় এইমাত্র বুঝি কোন শিল্পী সেটিকে তৈরী করেছে। এর একদিকে পুরোহিত, ছেত্তা, ভৃত্য, বাদক প্রভৃতি বলির সমসাময়িক সকলের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত, অপরদিকে বলির পাত্র কলসী ইত্যাদি ও বলির সময়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খোদিত আছে। অপর দু-দিকে একটি ওকের (oak) মালা আছে। ফোরামের দক্ষিণে তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ী আছে। একটি 'কমিটিয়াম' (Comitium), এখানে সহরের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব চ'লত—কারণ রোম সাম্রাজ্যের অধীনে পম্পেয়াই একটি স্বয়ংশাসিত সহর ছিল। অপরটি নাকি কাপড়ের বাজার ছিল। এখানে যে সব লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় Eumachia নামে এক ধনী

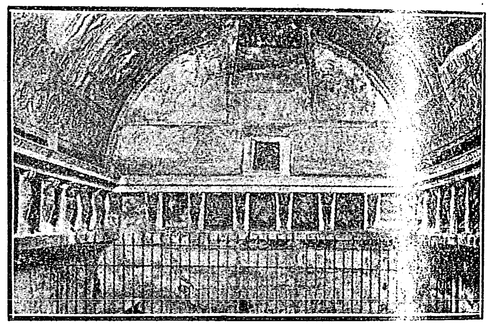

ফোরাম স্নানাগারের মৃদুগরম জলের ঘর

পুরোহিতপত্নী এটি নির্ম্মাণ করান। এই বাড়ীগুলি এখন ইটের কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এর আশে পাশের প্রচুর মার্ব্বেল দেখে মনে হয়, পূর্ব্বে এগুলি মার্ব্বেলমোড়া ছিল।

এই বাড়ীগুলির পাশে, ফোরামের কাছেই একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা চোখে পড়ে। লম্বা চারকোণা একটি প্রকাণ্ড হলঘর; চারধারে বড় বড় থামের ওপর ছাদ ছিল। এর নাম ব্যাসিলিকা (Basilica)। নামটি গ্রীক, গঠন-পদ্ধতিও গ্রীসীয় (Helenistic)। পূর্ব্বে এখানে কেনা-বেচার কারবার (Exchange) চ'লত, পরে কিন্তু এটি বিচারগৃহে রূপান্তরিত হয়। এর একদিকে উঁচু একটি বেদী আছে, যেখানে বিচারকরা বসিতেন। এর নীচে একটি ছোট ঘরে বিচারকদের আসন ও আসবাবপত্র

রাখা হ'ত। সেকালের কুঁড়ের বাদশারা ফোরাম আর ব্যাসিলিকায় সময় কাটাত। ব্যাসিলিকার দেওয়ালে দুহাজার বছর আগেকার মানুষ অনেক কিছু মনের কথা লিখে গেছে—যে অভ্যাস আজও মানুষের মনের অন্তরতম কোণে লুকান আছে। একটি এমনি লেখার বাংলা তর্জ্জমা—"আমি আশ্চর্য্য হই হে দেওয়াল; এই সব আজগুবি লেখা বুকে নিয়ে আজও তুমি দাঁড়িয়ে আছ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত হও নি।" এমনি একটি লেখার নীচে ৭৮ খৃঃ পূর্ব্ব তারিখ দেওয়া আছে (প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা ব্যাসিলিকা খৃঃ পূর্ব্ব দুই শতাব্দীতে নির্ম্মিত)। ব্যাসিলিকা আর ফোরামের মাঝে ছ'টি প্রকাণ্ড থাম, এদের মধ্যের লোহার ফটকগুলি রাত্রে বন্ধ করা হ'ত। আটাশটি

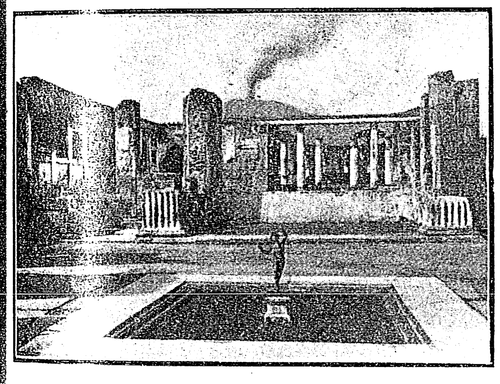

'হাউস অফ্ ফাউন'—পিছনে ধুমায়মান ভিসুভিয়স

স্তম্ভের ওপর এর ছাদটি ছিল, স্তম্ভগুলির শুধু মূলদেশ এখন আছে। কোন কোনটির ওপরের অংশ পাওয়া গেছে। ব্যাসিলিকার মাঝের অংশে ছাদ ছিল না, চারধারে চালার মত আচ্ছাদন ছিল। পম্পেয়াইএর মধ্যে সম্ভবতঃ ব্যাসিলিকাই সবচেয়ে বড় অট্টালিকা ছিল। ব্যাসিলিকার উত্তরে "ষ্ট্রাডা মেরিণা" (Strada Marina), রাস্তার অপর পাশেই 'অ্যাপোলোর' (Apollo) মন্দির। এটিও একটি প্রকাণ্ড অঙ্গনের একদিকে—এর বেদী, সিঁড়ি ও সামনের দুটি স্তম্ভ প্রায় অক্ষত। বেদীটি মার্ব্বেলমোড়া; দেওয়ালগুলিও যে মার্ব্বেলমোড়া ছিল, তার চারপাশে ছড়ান প্রচুর মার্ব্বেল ফলক থেকে বোঝা যায়। ফোরাম ও অ্যাপোলোর মন্দিরের মাঝে শুধু কয়েকটি মাত্র থামের ব্যবধান। এখান থেকে আর একটু পশ্চিমে গেলেই এখানকার ছোট্ট যাদুঘর। এখানে পম্পেয়াইএ প্রাপ্ত তৈজসপত্র, নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ ও আসবাব এবং কয়েকটি মৃতের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি আছে। পম্পেয়াই এর বড় এবং ভাল শিল্পগুলি নাপোলীর ন্যাশান্যাল যাদুঘরে আছে।

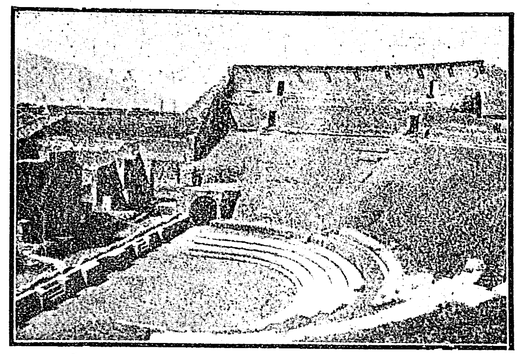

রঙ্গালয় (বড়)

এখানকার যাদুঘরের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি সোজা ব্যাসিলিকা ও ফোরামের মাঝ দিয়ে গোটা সহরের বুক চিরে চলছে তার নাম "ষ্ট্রীট অব এবানডান্স" (Street of Abbondanzh)। বলা বাহুল্য পম্পেয়াইএর বাড়ীঘর

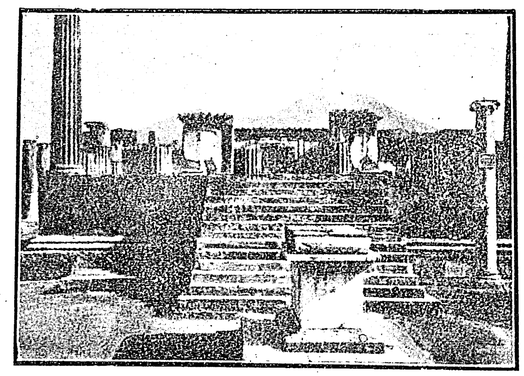

এ্যাপোলোর মন্দির

ও অন্যান্য রাস্তার নামের মত এ নামটিও এর পূর্ব্ব নাম নয়—আবিষ্কারকদের মনগড়া নাম মাত্র।

এই রাস্তাটি ধরে পূর্ব্বমুখে অনেকটা এলে বাঁ দিকে রাস্তার ধারে একটি ঝর্ণা পড়ে; সেখানে খোদিত একটি নারীমূর্ত্তি থেকেই রাস্তাটির বর্ত্তমান নামকরণ। এই রাস্তার

ধারেই 'ষ্ট্যাবিয়ান স্নানাগার" (Stabion Bath)। ফোরামের স্নানাগারের মত এখানেও ঠাণ্ডা, মৃদু গরম ও খুব গরম জলের ব্যবস্থা ছিল, তবে বাড়ীটির গঠন ভঙ্গী (plan) কিছু পৃথক। এখানে স্ত্রীলোকও পুরুষদের পৃথক

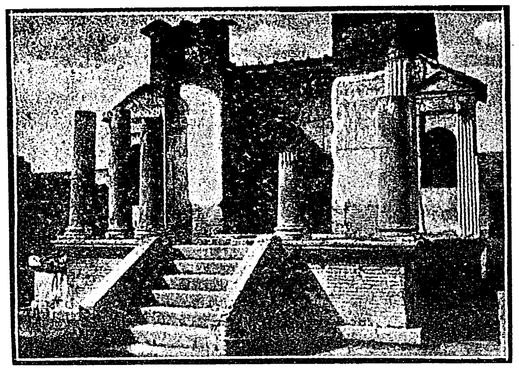

আইসিস মন্দির

প্রবেশ পথ ও পোষাক ছাড়বার ঘর আছে—কিন্তু স্নানের চৌবাচ্চা এক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যা চলছে তখনও তাই ছিল। এটির সামনেই একটি বাড়ীতে একটি মর্ম্মর টেবিল উল্লেখযোগ্য। ষ্টাবিয়ান স্নানাগারের পাশের রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে ষ্টাবিয়ান রাস্তা (Via di Stabia)।

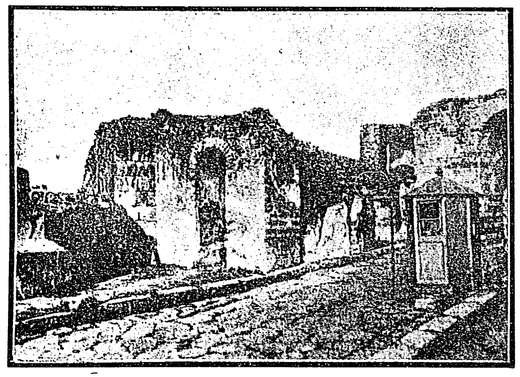

ডোমিটিয়ান রোড ও হারকিউলেনিয়াম তোরণ

এর পরে থেকে "নূতন খননকার্য্য বিভাগ" (New Excavations) পড়ল—এখানে ফটো নেওয়া নিষিদ্ধ। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখান থেকে বেশ বৃষ্টিও সঙ্গ ধরলে। মাথার ফ্রেন্টের হ্যাটের কার্ণিস বেয়ে বেশ জলধারা গড়াতে লাগল; ওভারকোটটা তখনকার মত ওয়াটারপ্রুফের কাজ চালালে। আমরা রীতিমত তাড়া-তাড়ি পা চালালাম। এদিকে এ্যাবাণ্ডান্স ষ্ট্রীট অনুসরণ করে খননকার্য্য চলেছে। কয়েকটি দোকান ছাড়া এদিকে বেশী কিছু আবিস্কৃত হয় নাই। কয়েকটি বাড়ীতে ক্রীতদাসদের বন্ধনের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি লোহার জিনিষ পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমিত হয়েছে সেগুলি ক্রীত-দাসদের বাড়ী ছিল। এইগুলির কাছেই রঙ্গালয়, যেখানে ক্রীতদাসদের প্রাণের বিনিময়ে পম্পেয়াইএর নাগরিকরা আনন্দ উপভোগ ক'রত। সহরের দক্ষিণদিকের দুটি রঙ্গালয় এবং অপেক্ষাকৃত দূরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এ্যাম্পি-থিয়েটার উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বের রঙ্গালয় দুটি একবারে

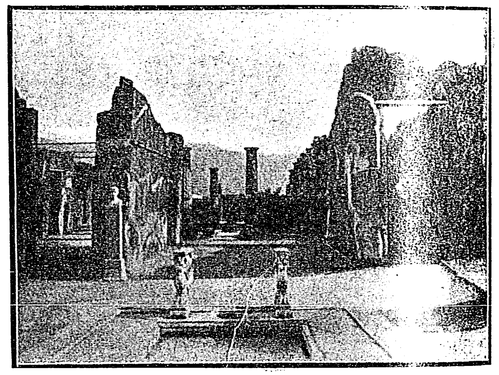

House of Rufus—একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ

পাশাপাশি—একটিতে পাঁচহাজার দর্শকের আসন ছিল, অপরটিতে মাত্র পনরশ' দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমটি সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রত, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মকলাজ্ঞানসম্পন্ন সুধীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল। বৃহত্তর রঙ্গালয়টির কোন ছাদ ছিল না। অর্দ্ধবৃত্তাকারে তিনটি চত্বরে অনেকগুলি বসবার আসনের শ্রেণী তিন-দিক ঘিরে ছিল; একদিকে রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চের সামনের পর্দ্দা ওপর থেকে প'ড়ত না, নীচে থেকে উঠত। মঞ্চের মেঝে কাঠের ছিল। ছোট রঙ্গালয়টি আগাগোড়া ঢাকা ছিল, এ থেকে অনুমিত হয় এখানে সূক্ষ্ম যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপ চ'লত। দুটি রঙ্গালয়েরই বসবার আসন মর্ম্মরমণ্ডিত ছিল। রঙ্গালয় দুটির আশে পাশে আর

কয়েকটি ছোটখাট দ্রষ্টব্য ছিল, কিন্তু বরুণদেব বাদ সাধায় এবং প্রায় দু'তিনঘণ্টা ঘুরে ক্লান্ত হওয়ায় আমরা ফিরলাম। এ্যাম্পি-থিয়েটার দেখা হ'ল না। রোমার এ্যাম্পি-থিয়েটারের (কলোসিয়াম) চেয়ে এটি ছোট, এখানে বিশ হাজার দর্শকের আসন ছিল। তবে এটি নাকি এই ধরণের রঙ্গালয়ের প্রাচীনতম; এর আয়তন ৪৬০ × ৩৪৫ ফিট।

বৃষ্টি বেশ জোর আসায় ফিরবার পথে আমরা একটি বাড়ীর বারান্দাওয়ালা রোয়াকে আশ্রয় নিলাম। বাড়ীটি দেখে মনে হ'ল যেন কেউ বাস করে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করায় সে আর একটি লোককে ডেকে বাড়ীটির তালা খুলে দেখাতে অনুরোধ ক'রলে। বাড়ীটি খুল্লে দেখা গেল

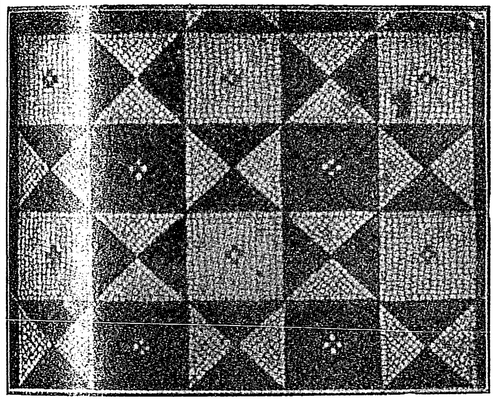

একটি বাড়ীর মোজায়েক করা মেঝে

সেটি পূর্ব্বে বেশ্যালয় ছিল। চার কি পাঁচটি অতি ছোট ছোট কুঠরী—প্রত্যেকটিতে একটি পাথরের বেদী, বোধ হয় তার ওপর শয্যা পাতা থাকত। প্রত্যেক ঘরের দরজার ওপর বিভিন্ন ভঙ্গীর কামশয্যা চিত্রিত; যার যেমন অভিরুচি সেই মত কুঠরী সে দখল ক'রত। বাড়ীতে ঢুকেই একটি দরদালান, দরদালানের দুধারে এই কুঠরীগুলি—আর ঠিক সামনেই একটি পাথরের বেদী, এখানে ব'সত বাড়ীওয়ালী মাসী তার সুরার পশরা সাজিয়ে। ঠিক এর পাশেই ছিল একটি গুপ্তদ্বার—পুরোহিত, বিচারক, নগরপাল প্রভৃতি পদস্থ ও গণ্যমান্যের জন্য—যারা সমাজের দণ্ডবিধাতা অথচ যাদের অন্তরে অতি সাধারণ মানবের হৃদয়বৃত্তি অহরহ খেলা করে। দুহাজার বছর আগের চেয়ে বাড়ীটির চেহারা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নি। বাড়ীটির ছাদ, বারান্দা, মেঝে প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে অথবা মেরামত করা হ'য়েছে—কিন্তু নাই তার অধিবাসীরা, যারা শুধু উদরান্নের জন্য নিজেদের দেহ ও যৌবনকে শতশত লোলুপ দৃষ্টির সামনে মেলে ধ'রত, যারা কত আকাঙ্খিত জনের কাছে হয়ত শুধু পেয়েছে একটা ঘৃণ্য জ্বালাময়ী দৃষ্টি, হয়ত বা আন্তরিক অনিচ্ছায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে আকাঙ্খিতের মত্ত খেয়ালের পায়ে। যারা এখানে থাকত পরের তৃপ্তির জন্য, সারাজীবন ধরে নিজেদের অন্তরে অতৃপ্তির বোঝা ব'য়ে—আজ তারা সেখানে নাই, তবু মনে হ'ল তাদের রুদ্ধ-ক্রন্দন মথিত কাষ্ঠহাসির চাপা আওয়াজ

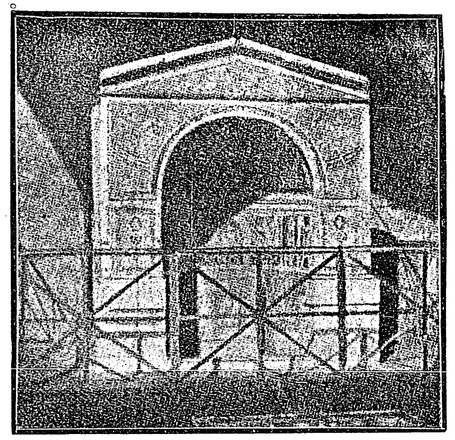

এ্যাপোলোর মন্দির

আজও সেখানে বুঝি বাজছে; এখনি বুঝি পুরোহিতশ্রেষ্ঠ গুপ্তদ্বার দিয়ে ছোটবড়র এই মহামিলন ক্ষেত্রে এসে হাজির হবেন।

বৃষ্টি একটু ক'মলে আমরা ষ্টেশন মুখে রওনা হ'লাম। ব'লে রাখা ভাল বৃষ্টির জন্য এখানকার একটি দ্রষ্টব্য 'ষ্ট্রীট অব টুম্বস' (Street of Tombs) অর্থাৎ 'কবরের রাস্তা' দেখা হয় নি। এখানে অনেকগুলি সমাধি ও স্মৃতিফলক আবিস্কৃত হ'য়েছে শুনলাম।

ষ্টেশনের ভোজনশালায় মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। ফিরবার ট্রেণের কিছু দেরী ছিল—ফিরবার মুখে ভিসুভিয়াস দেখে যাব ঠিক ছিল।

আমি যখন গিয়েছিলাম (১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী) তখন

সুপ্ত ভিসুভিয়স হঠাৎ আবার জেগে উঠেছিল। ভিসুভিয়স প্রথম ক্ষ্যাপে ৭৯ খৃঃ অব্দে, যখন পম্পেয়াই সমাধিস্থ হয়। তার আগেও ৬৩ খৃঃ অব্দে পম্পেয়াই একবার ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হয় ভূমিকম্পে, কিন্তু সেবার বাইরে ভিসুভিয়স রুদ্রমূর্ত্তি ধরে নাই। ৬৩ খৃঃ অব্দে পম্পেয়াইএর বহু বাড়ী ধ্বংস হয়; সেগুলি পুনর্নির্ম্মাণের সময় আবার ভিসুভিয়াস ক্ষেপে উঠে তাকে শ্মশানে পরিণত

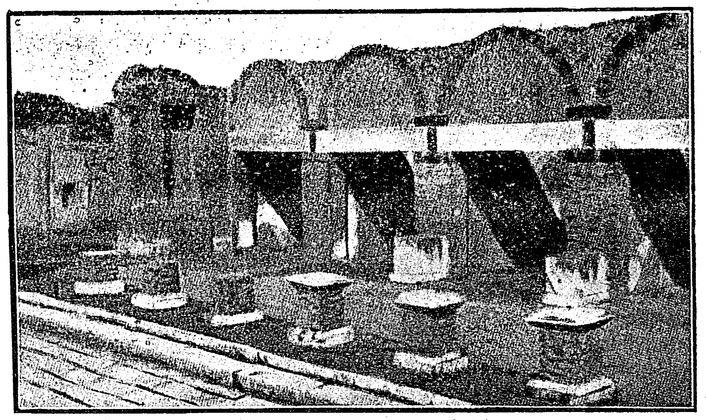

বাজারের দোকান ঘর]

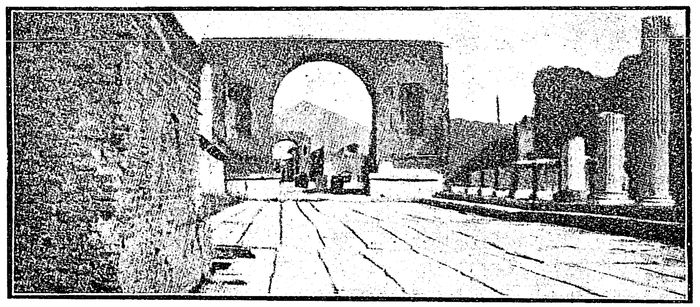

ফোরামের পথে তোরণ

করে; কাজেই পম্পেয়াইএর অনেক বাড়ীই ৬৩ খৃঃ অব্দের খুব আগের নয়, যে গুলি ৬৩ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পের পরও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু সেই গুলি থেকে আমরা খৃঃ পূর্ব্ব আমলের স্থপতিশিল্পের পরিচয় পাই। পম্পেয়াই ধ্বংসের আগেও ভিসুভিয়সের ধূম্রবপুর শীর্ষদেশ থেকে অবিরাম গতিতে ধূমশিখা উঠত এবং ধ্বংসের পরও সে ধূমরেখা বন্ধ হয় নি। নীল আকাশের কোলে ভিসুভিয়াসের চূড়ার গহ্বর থেকে অনন্ত শূন্যে শুভ্র ধূমশিখা অবিরাম গতিতে এঁকে বেঁকে উঠ্‌ছে—যেন বিরাট বিশ্বদেবতার মন্দিরে অনির্ব্বাণ ধূপদানী। ১৯০৬ সালে আবার একবার ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস জেগে ওঠে এবং তার গায়ে যে সব গ্রাম ছিল তার কয়েকটি নিশ্চিহ্ন করে। তবু আশ্চর্য্য এই যে আজও বহু ছোট ছোট গ্রাম এই সর্ব্বনেশে রাক্ষসের বিরাট বপুর ওপর গ'ড়ে উঠেছে। বেদের ছেলে যেমন সাপ দেখলে ভয় করে না—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ভয়ঙ্করের ভীষণতা যায় কমে—এখানকার লোকগুলিও তেমনি ধুমায়মান ভিসুভিয়াসকে ভয় করে না; তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে তার গায়েই বাসা বেঁধেছে। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবার সুপ্ত সিংহ গর্জ্জে উঠেছিল—তবে এবারের গর্জ্জনেও বর্ষণে বিশেষত্ব ছিল। সম সাময়িক সমস্ত কাগজে সে সময় ইউরোপে বিশেষ আলোচনা ও গবেষণা চলেছিল। এবারের আওয়াজ ছিল অভিনব, ভাষায় অবর্ণনীয়; অগ্ন্যুৎপাতের সময় আকাশে মুহুর্মুহু বিচিত্রবর্ণের অগ্নিশিখার অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এত বর্ণবৈচিত্র্য এর আগে নাকি ভিসুভিয়াসে কখনও দেখা যায় নি। বৈজ্ঞানিকেরা পাগলা ভোলার এই অভিনব খেলায় একবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বহু বৈজ্ঞানিক নানা যন্ত্রসাহায্যে আগ্নেয়গিরির একবারে মুখে গিয়ে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সন্তোষজনক কোন কৈফিয়ৎ কাগজে প্রকাশিত হয় নি। যতবারই অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে—নূতন নূতন মুখ সৃষ্টি হয়েছে। এবারের মুখটি প্রথমে দু' ফিট পরিধির ছিল, পরে তার ব্যাস দশ ফিট হয় (দু' তিন দিনের মধ্যে)। এ সম্বন্ধে প্যারীর "ডেলী মেল" পত্রিকায় যে সংবাদ ও চিত্র বেরিয়েছিল পাঠকদিগকে তার কিয়দংশ উপহার দিলাম।

Naples, Sunday
(5. 2. 33)

Vesuvius, the great Italian volcano, which after two years of absolute repose, is again presenting a wonderful sight is puzzling scientists and delighting thousands of spectators....The coloured lights are a new phenomenon of the volcano...The flaming gases from the various minerals in combustion, were shooting hundreds of feet up from the active core. This incandescent light, he said, changed from vivid green to soft purple and then suddenly there would be a sudden rush of gas and vapour and scarlet glow would illuminate the sky for miles around....

ভীষণ ভিসুভিয়াসের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পম্পিয়াই-এর ওপর তাকালাম। রিমি ঝিমি বৃষ্টির আবরণের অবগুণ্ঠনে আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেন পুরাতন পম্পেয়াই জেগে উঠল। তার বর্ত্তমান রূপ গেল দূরে, তার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যপট ছায়াছবির মত বৃষ্টির পর্দ্দার আড়ালের মাঝে পড়ল ঢাকা। ইতিহাসের পাতা থেকে অতীত হ'য়ে এল বর্ত্তমান। সহরটি এখনও এত সম্পূর্ণ ও অতীতের পরিচয় বর্ত্তমানের মাঝেও এত সুস্পষ্ট যে

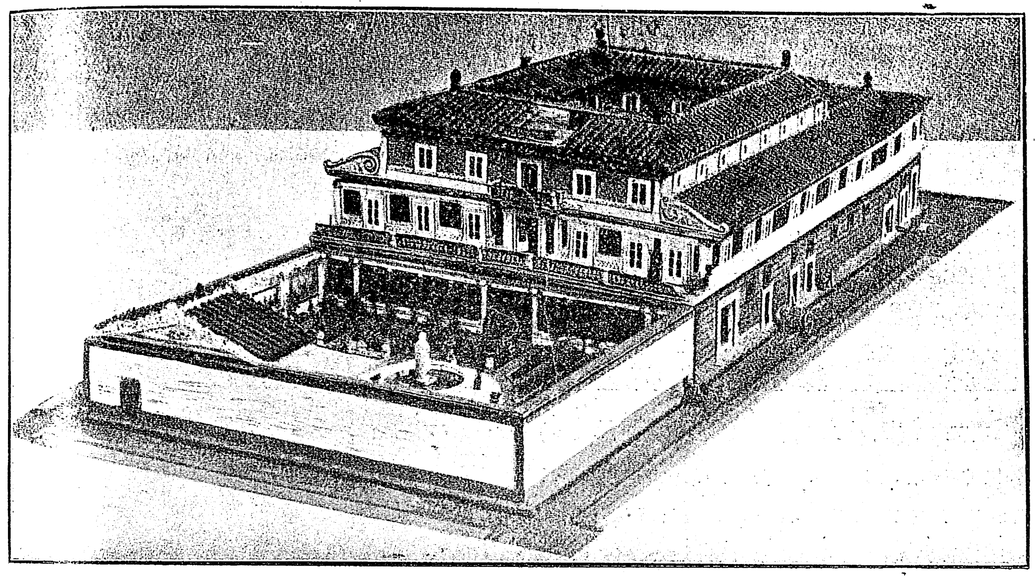

বৈজ্ঞানিকের বাড়ীর (House of Scientist) একটি চমৎকার মোজায়েক করা ফোয়ারা

অতীতকে কল্পনার চোখে দেখতে কষ্ট হয় না। লম্বা সাদা 'টোগা' (Toga) পরা পুরুষের দল অলস মন্থর গতিতে

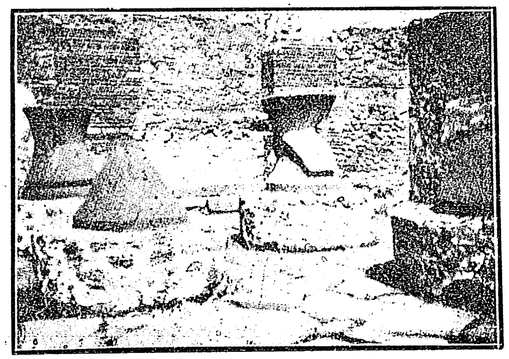

পম্পেয়াই এ প্রাপ্ত পাথরের জাঁত

রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে চলেছে, দোকানে জিনিষ কিনছে, চা খাচ্ছে, ফোরামে পরস্পর গল্পগুজব করছে, নয়ত

জুপিটারের মন্দির চত্বর থেকে সহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের প্রদত্ত বক্তৃতা শুনছে। মেয়েরা তাদের বিচিত্রবর্ণের 'পাল্লা' (Palla) প'রে শুভ্র পোষাক পরিহিত পুরুষদের মধ্যে

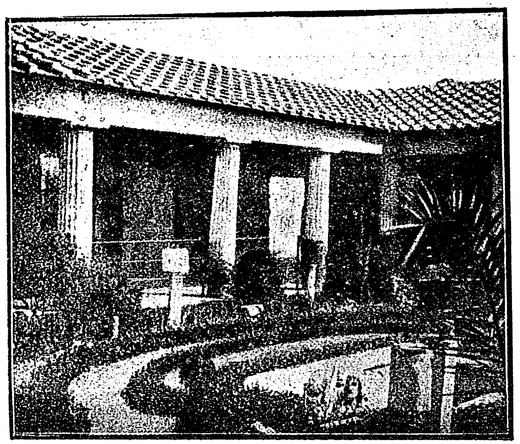

গোল্ডেন কিউপিডের বাড়ীর একাংশ (পুনর্নির্ম্মিত)

লীলা-চঞ্চল গতিতে ঘুরে বেড়িয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছে। সদর রাস্তা কয়েকটিতে অশ্বযান প্রচণ্ড শব্দে ছুটছে, বাকী রাস্তাগুলিতে ক্রীতদাস-বাহিত পাল্কী (এখানকার মত ঢাকা

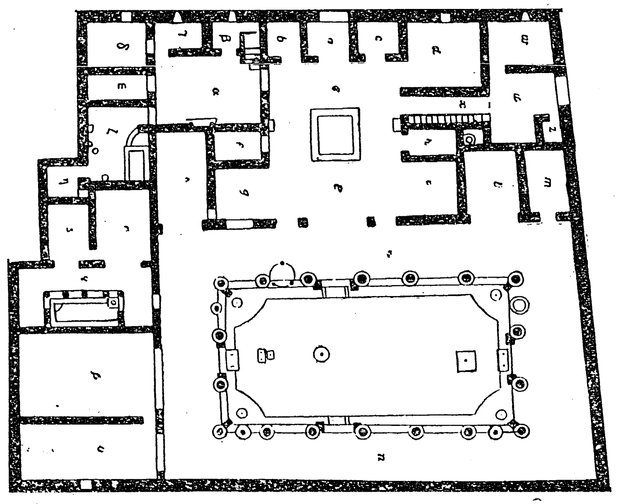

'হাউস অফ ভেতি'র প্ল্যান

নয়) সুন্দরী ধনীতনয়াকে নিয়ে চলেছে। শুভ্র মর্ম্মরের মন্দির, ফোরাম ও ব্যাসিলিকার মাঝে বহু ধনীর বিচিত্র প্রাসাদ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে টলমল ক'রছে—মেঘমুক্ত নীলাকাশ থেকে অবারিত সূর্য্যালোক এসে তাদের ওপর দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে ঠিক্‌রে পড়ছে। তখন মেয়েরা ছিল সাধারণতঃ দুশ্চরিত্র, কারণ জীবন সংগ্রাম ছিল সহজতর, অলস মনগুলিকে নিযুক্ত করবার মত অন্য কাজ যথেষ্ট ছিল না, তাই তাদের মন ছিল বিপথগামী। তখনকার দিনে 'নৃত্য' সন্দেহের চোখে লোকে দেখত, যারা নাচত সাধারণে তা'দিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। বিবাহ-বন্ধন এ সময়ে ছিল শিথিল ; পাঁচ বৎসরে আটটি স্বামীর গলায় বরমালা দিয়েছে এমন নারীর কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এ্যাম্পি-থিয়েটারে হতভাগ্য ক্রীতদাসদের প্রাণের বিনিময়ে উন্মত্ত জনতা আনন্দ উপভোগ ক'রত। এই পাশবিক উত্তেজনার প্রভাব নারী ও পুরুষদের সমাজ-জীবনেও পড়েছিল—তাদের কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

স্নানাগারগুলিতে যথেষ্ট ভিড় জ'মত। সারাদিন কাজকর্ম্মের পর লোকগুলি প্রথমে গরম ঘরে ঢুকে, খুব খানিকটা ঘেমে নিত, তার পর গরম জলে স্নান ক'রে পরে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় মনের আনন্দে সাঁতার দিত।

রঙ্গালয় দুটিতে প্রত্যহ সাধারণ ও সুধী দর্শকদের ভিড় জ'মত। বড়টিতে সাধারণতঃ বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হ'ত, ছোটটিতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আলাপ চ'লত। তখনকার দিনে অভিনয়ে পুরুষেরাই নারীর অংশ গ্রহণ ক'রত। নটের জীবন সম্মানার্হ ছিল না।

পম্পেয়াই ধ্বংসের পর দীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, বহু শক্তিমান সম্রাট ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতন হ'য়েছে, মানুষ সভ্যতার লক্ষ্যে অনেকখানি ধাপ এগিয়ে গিয়েছে—কিন্তু তবু সেই বাদল দিনে মুক্ত মাঠের মাঝে ষ্টেশনের চালায় ব'সে মনে হ'ল এই দীর্ঘ ঊনিশ শতটি বছরে মানুষ শান্তির পথে কতদূর এগিয়েছে! সভ্যতার লক্ষ্য শান্তি ও আনন্দ, কিন্তু পম্পেয়াইএর লোকগুলির চেয়ে আজ আমরা কতটুকু বেশী সভ্য, অর্থাৎ বেশী শান্তি ও আনন্দের অধিকারী। স্বীকার করি তখন ক্রীতদাসের প্রতি অমানুষিক

নিষ্ঠুরতা ছিল, পারিবারিক জীবন হয়ত এখনকার চেয়ে শ্লথ ছিল, হয়ত পুরুষ ও নারীরা অধিকতর চরিত্রহীন ছিল, সূক্ষ্ম কলাশিল্প বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক পেছিয়েছিল কিন্তু তবুও শান্তি কি কম ছিল? আজ সভ্য মানুষকে সারা দিন রাত তার জীবিকার্জ্জনের জন্য যে অপরিসীম পরিশ্রম ক'রতে হয়, যে দুশ্চিন্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয় তার চেয়ে তখনকার জীবন ঢের বেশী সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সভ্যতার ফলে আজ একটা জাত অপর একটি জাতিকে যেমন নির্ম্মমভাবে হত্যা

গৃহদেবতার বেদী

ক'রতে শিখেছে, তখনকার দিনে মানবহত্যা এমন ব্যাপক-ভাবে করা সম্ভব ছিল না। যানবাহনে ও জীবনযাত্রার উপকরণে হয়ত বর্ত্তমানে মানবজাতি এই ঊনিশ শ' বছরে অনেকখানি এগিয়েছে কিন্তু যতটুকু সে এগিয়েছে তার কাছ থেকে শান্তি ও আনন্দ ঠিক ততখানি দূরে সরে গেছে।

ষ্টেশনে একটি ছোট্ট দোকান আছে ; সেখানে পম্পেয়াইএ প্রাপ্ত অনেক জিনিষের নকল প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় হয়। আমি ২৫ লিয়ার দিয়ে এখান থেকে একটি "নৃত্য-পরায়ন ফাউনের" (Dancing Faun) ধাতুমূর্ত্তি কিনলাম।

ট্রেণ এসে প'ড়ল। আমরা ভিসুভিয়াসের ষ্টেশনে নামলাম। এখান থেকে আর একটি বৈদ্যুতিক ট্রেণে ভিসুভিয়াসের গা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। এ

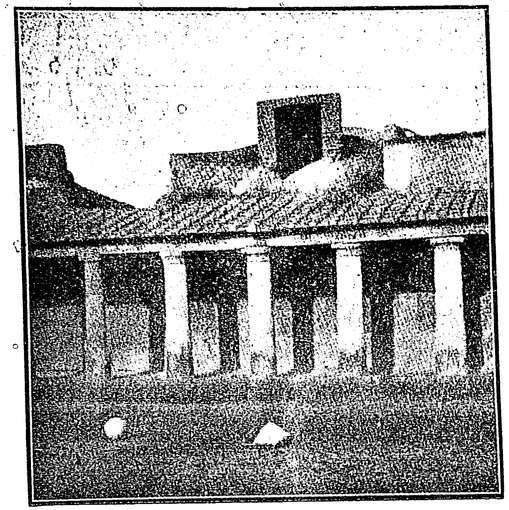

ষ্টাবিয়ান স্নানাগারের পূর্ব্বাংশ (সামনে পাথরের গোলা)

ট্রেণটি উঠবার সময় এমন মাথা উঁচু করে ওঠে যে নীচে না তাকিয়েও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ট্রেণটা উঁচুতে

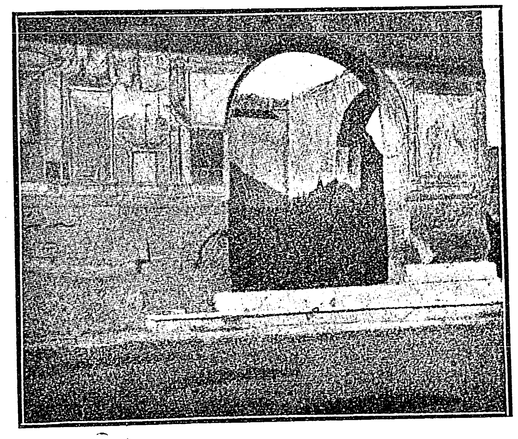

ষ্টাবিয়ান স্নানাগারের ভিতরের দেওয়াল

উঠছে। মাঝখানে একটা ষ্টেশন থেকে আর একটা এঞ্জিন পেছনে ঠেলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেণটি এক জায়গায় দাঁড়াল ; এখানে একটি অবজারভেটারী ও

ভাল রেস্তোঁয়া আছে, ট্রেণটি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়; কাজেই এখানে চা খেয়ে নিলাম। এখানে ছোট কাঁচের শিশিতে ভিসুভিয়াসের প্রত্যেকবারের অগ্ন্যুৎপাতের ছাই পর পর সাজিয়ে বিক্রয় হয়। তিন লিয়ার দিয়ে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে একটা শিশি কিনলাম। এর পর লাইন একবারে তির্য্যক-

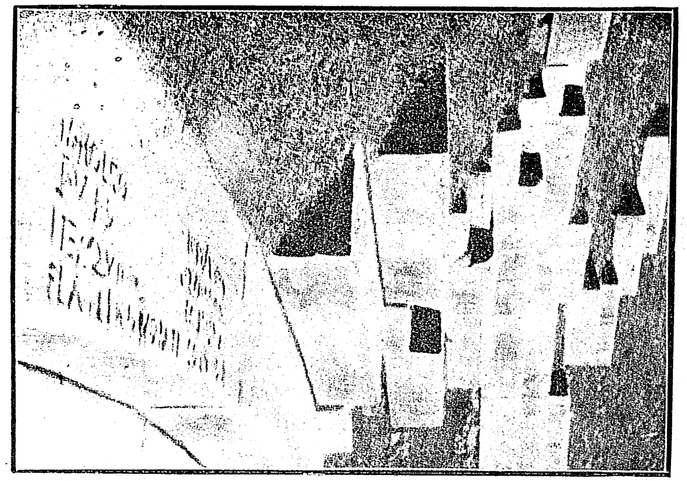

রঙ্গালয়ের আসন। সামনে কয়েকটি ব্রঞ্জ অক্ষরের লেখা এখনও আছে

ভাবে ভিসুভিয়াসের গা দিয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে লাইনের 'গ্রেড' (grade) ছিল ৪ ফিটে এক ফিট অর্থাৎ প্রতি চার ফিট দূরত্বে লাইন এক ফিট উঁচু হয়েছে; এবার গ্রেড হ'ল দু ফিটে এক ফিটেরও বেশী (শতকরা ৫৫)।

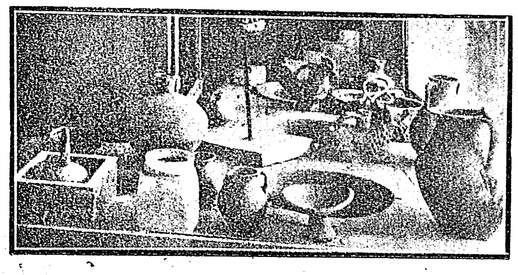

গৃহস্থের তৈজসপত্র

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিসুভিয়াসের গায়ে গ্রাম ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র দেখা যাচ্ছিল, এবার শুধু লাল ও কাল পোড়া মাটি দুদিকে ছড়ান; সজীবতার কোন চিহ্ন চোখে প'ড়ল না। একটি ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় নি। এইখান থেকে "ফানিকুলার" (funicular) রেলে উঠতে হয়; এর লাইন ভিসুভিয়াসের একটি পুরাণ মুখ পর্য্যন্ত উঠেছে। এ লাইনটি এমন খাড়াই যে এখানকার যানের আসনগুলিও ধাপে ধাপে সাজান (গ্যালারীর মত)। এখানকার যান একটি প্রকাণ্ড লিফ্‌টের (lift) মত; একটি ওঠে ও একটি নামে। এই লিফ্‌টটিতে উঠবার সময় বেশ শীত করে ও নীচের দিকে তাকালে অল্প স্বল্প ভয় করে। গায়ে দেবার জন্য কম্বল বা ওভারকোট এখানে এক লিয়ার দিলে ভাড়া পাওয়া যায়। সব ব্যবস্থাই কুক কোম্পানীর। কিছুদূর উঠে ভিসুভিয়াসের ধোঁয়ায় ও তীব্র গন্ধকের গন্ধে শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হতে লাগল; মাঝে মাঝে কাসি হতে লাগল। পম্পেয়াইএ একটি নারীর ও কুকুরের (যার গলায় লোহার বগলশটি এখনও আছে) প্রতিমূর্ত্তিতে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যু যে করুণ ও ভীষণ ছবি দেখেছিলাম—এখন সে যন্ত্রণার কতকটা অনুভব করলাম।

চতুঃপার্শ্বের রিক্ততা ও ভীষণতা শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর; রুদ্রদেবের চিহ্ন এখনও মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। ভিসুভিয়াসের মাথায় উঠে লাভা, পোড়া পাথর ও গিরি রঙের পোড়া মাটির ওপর দিয়ে খানিকটা দূরে পুরাণ মুখটির কাছে এলাম, প্রকাণ্ড গহ্বর (দুই কিলোমিটার লম্বা চওড়া) একটি ছোট খাট পুষ্করিণীর মত। অদূরে নূতন মুখ দিয়ে তখনও অগ্নি বর্ষণ চলছে; বৃষ্টি ছেড়ে গিয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের পর্দ্দায় দৃষ্টি আড়াল ক'রছিল। দু'চার মিনিট অন্তর সহসা একটা প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে প্রস্তর বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসছিল; কখনও সাদা হাল্কা মেঘের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের গায়ে কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছেন, কখনও গোলাপী রঙে হোলি খেলা চলছিল। সে আওয়াজ কাল-বোশেখীর ঝড়ের সময় বদ্ধ ঘরের মধ্যে থেকে রুদ্ধ দ্বারে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির প্রচণ্ড করাঘাত ও রুদ্ধশ্বাস যেমন শোনায় কতকটা তেমনি। সমস্ত পাহাড়টি সে সময় যেন ভয়ে কেঁপে উঠছিল। বহু ঊর্দ্ধে জ্বলন্ত পাথরের টুকরো

উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছিল। পুরাণ মুখটিতে (১৯০৬ সালের) নামা যায়; এর জন্য পৃথক সম্মতি দরকার হয়; ভিসুভিয়াসের মাথাতেই এখানে নামবার জন্য পৃথক গাইড পাওয়া যায়।

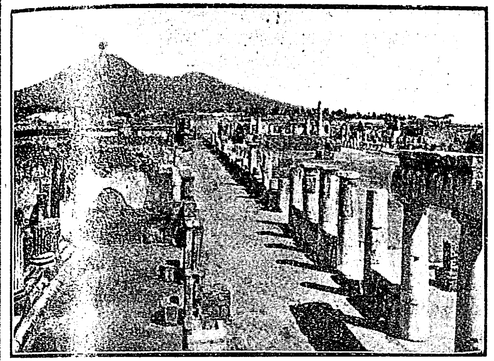

ফোরামের সাধারণ দৃশ্য—পেছনে ধুমায়মান ভিসুভিয়াস। সহরের সরল রাস্তা ও সহর সাজাবার নিখুঁত ভঙ্গী কতকটা বোঝা যাবে।

ভিসুভিয়াস থেকে সমুদ্র বড় সুন্দর দেখায়। সমুদ্রের ধারে দুটি গ্রাম চোখে পড়ে, একটি প্রবালের জন্য ও অপরটি 'মাকারোণী'র (এক রকম খাদ্য) জন্য বিখ্যাত।

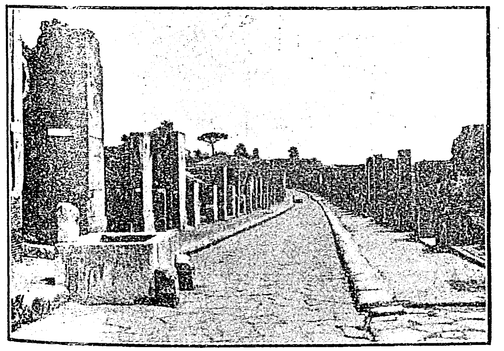

ষ্ট্রীট অব এ্যাবাণ্ডান্স—রাস্তার ধারের জলের কল ও ফুটপাথ লক্ষ্য করুন

এক দিকে অসীম শান্ত বারিধির নীলম্বুরাশি, অন্য দিকে দুরন্ত ভিসুভিয়াসের ভয়াবহ অগ্নিপ্রবাহের মাঝে মন স্বতঃই প্রকৃতিদেবীর অপরূপ লীলা মহিমায় ডুব দেয়। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে অগ্নিগর্ভ পাষাণের বুক থেকে ইতালীর সুবিখ্যাত দ্রাক্ষাগুচ্ছ কেমন ক'রে রস সঞ্চয় করে তাই ভেবে। বেশীক্ষণ এই ক্রুদ্ধ প্রলয়ঙ্করীর বুকে দাঁড়াতে ভরসা হ'ল না, তাই নেমে এলাম।

পম্পেয়াইএর ভয়াবহ পরিণতি ও ভিসুভিয়াসের

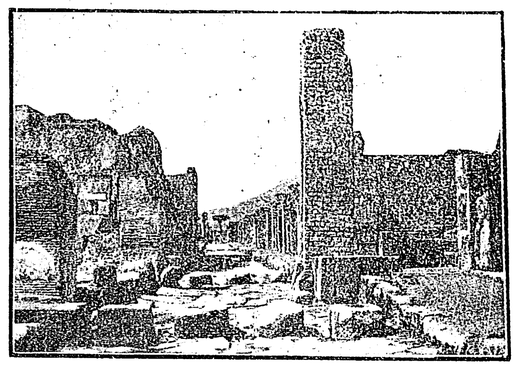

ষ্টাবিয়ান রোড, রাস্তার ওপরে পারাপারের জন্য পাথরগুলি লক্ষ্য করবার

রুদ্রমূর্ত্তির স্মৃতি এমনভাবে মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, যে পরে নাপোলীর হোটেলে থাকতে, নীচে রাস্তায় ভারী লরীর গুরুগম্ভীর আওয়াজ এবং তার গতির ফলে হোটেলের কাঠামোয় যে কাঁপুনি জাগত, তাতে মাঝে মাঝে ভয়ে

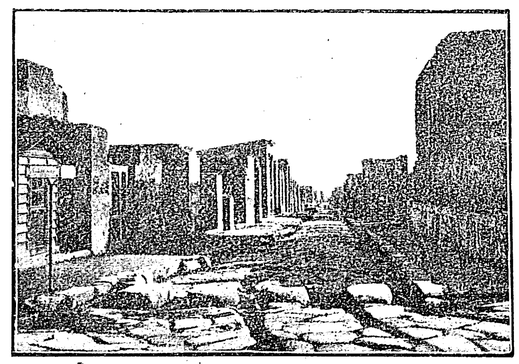

ষ্ট্রীট অব ফরচুন—এই রাস্তাটি দেখে বোঝা যাবে সমগ্র সহরটি কি অক্ষতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, রাস্তার ওপর চাকার দাগ সুস্পষ্ট

চ'মকে উঠতাম, মনে হ'ত ভিসুভিয়াস বুঝি আবার সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে তার তাণ্ডব সুরু ক'রলে।

পম্পেয়াইও ধ্বংস হবার আগে কয়েকবার ভূমিকম্পে

কেঁপে ওঠে, এক অভূতপূর্ব্ব শব্দ শোনা যায়—তারপর আরম্ভ হয় ছাইবৃষ্টি ও জ্বলন্ত পাথর বর্ষণ। উৎসারিত লাভা (lava) অন্যমুখে প্রবাহিত হ'য়ে হারকিউলেনিয়ামকে ধ্বংস করে; পম্পেয়াই ছাই চাপা পড়ে। তিনদিন অবিরাম ভস্মবৃষ্টির পর সূর্য্যের আলো প্রকাশ পায়—এই তিন দিন গাঢ় অন্ধকারে আকাশ ছেয়েছিল—কিন্তু ভস্মবৃষ্টি থামলেও ভূমিকম্প থামে নাই। যারা এই ভীষণ খণ্ডপ্রলয়ের পরও পরমায়ু নিয়ে বেঁচেছিল, তাদের অনেকে আবার এসে তাদের ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিল, তবে এখানে বাস করা আর সম্ভব হয় নাই। তাই লরীর গতিবেগে স্পষ্ট কম্পনকে বারবার ভূমিকম্প ও তার আওয়াজকে ভিসুভিয়াসের গম্ভীর গর্জ্জন ব'লে ভুল হ'ত—নাপোলী না ছাড়া পর্য্যন্ত ভিসুভিয়াসের ভীষণ আতঙ্ক মন থেকে মোছে নাই।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈবালের মৃদু অথচ মর্ম্মান্তিক কথাটি সবিতা ও বিজনের কান এড়িয়ে গেলেও যার উদ্দেশে এই কথাগুলি বলা হ'ল তার কান এড়িয়ে যায় নি। শৈবাল চ'লে যাবার পরও মাধবী নিঃশব্দে নতমুখে ব'সে রইল। শৈবালের নিষ্ঠুর আঘাত, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং তার মিথ্যা কথার নির্লজ্জ প্রকাশ—সমস্ত তার বুকের মাঝখানে গভীর ক্ষতের মত র'য়ে-র'য়ে জ্বলতে থাকল। তার সামনে যদি আর কেউ না থাকত তা হ'লে তার দুচোখ ছাপিয়ে জলধারা কপোল সিক্ত ক'রে নেমে আসত। এইভাবে সমস্ত অপমান আঘাতের তীব্র জ্বালা নিঃশব্দে সহ্য ক'রতে ক'রতে তার ইচ্ছা হ'ল এখনি সে ছুটে পালিয়ে সেই নির্জ্জন পরিত্যক্ত ঘরটায় ঢুকে বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে।

বিজনের খাওয়া শেষ হ'লে সবিতা বললে—'খাওয়া দাওয়ার পর ভোলা ও-ঘরটা ঠিক ক'রে রাখবে—তুই ততক্ষণ রাণীর ঘরে বিশ্রাম ক'রগে যা। হাঁ রাণী, আজ কি আর খাওয়া দাওয়া ক'রতে হবে না মা। ও-ঘর থেকে বিজনের পানটা এনে দিয়ে খাবে এস।'

সবিতা রান্নাঘরে চ'লে গেল। মাধবী পানের ডিবে নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজন তার হাত থেকে সেটা নিয়ে দুটো পান মুখে দিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বললে—'খাওয়া দাওয়া সেরেই আমার কাছে যাবেন কিন্তু। দেরী যেন না হয়, কেমন?' মাধবী তখন পর্য্যন্ত মুখ তুলে বিজনের দিকে তাকাতে পারে নি; এই কথার পরও পারলে না, কেবল ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সম্মতি জানাল। বিজন তার টকটকে রাঙা মুখের মাধুর্য্যটুকু উপভোগ ক'রতে ক'রতে উপরে উঠে গেল।

আহারে মাধবীর রুচি ছিল না তবু স্নেহের মত সবিতার সামনে কোনরকমে দুটি খেয়ে সে উপরে গেল। তার চোখের সামনে দিন রাত্তির যে ছবিটা রঙে বিচিত্রতর হ'য়ে তার সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে জাগিয়ে রেখেছিল শৈবালের নিষ্ঠুর আঘাতে তা নষ্ট হ'য়ে গেল। মাধবী খানিকক্ষণ এঘর ওঘর ক'রলে, আলমারি থেকে একটা অসমাপ্ত ব্লাউজ বার ক'রে বসল সেটা শেষ ক'রতে, কিন্তু একটুখানি ক'রেই বিরক্ত হ'য়ে রেখে দিল। বইএর আলমারি খুলে লাল ফিতেয় পেজ মার্ক দেওয়া গল মোঁরার Open all night খানা বের ক'রে দাঁড়িয়েই তার কয়েকখানা পাতা উলটে পালটে রেখে দিলে। এমন বই এখন চাই, যা নিয়ে ওর দগ্ধ মন ভুলে থাকতে পারে—খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ওর চোখ প'ড়ল প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র উপর। তাড়াতাড়ি বইখানা বার ক'রে আলমারিটা দিল বন্ধ ক'রে। বইখানি নিয়ে মাধবী জানলার ধারটিতে চেয়ার টেনে এনে ব'সল। বইখানি খুলে তার উপর দুটি চোখ রাখলে কিন্তু পড়তে আর পারছে না। মন যে তার কোথায় প'ড়ে র'য়েছে তা তো সে স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পারছে। তার শোবার

ঘরে খাটের উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে একজন তারই প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিচ্ছে—এ জেনেও সে তার কাছে যেতে পারছে না, অথচ সে জন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাকে প্রবলভাবে টানছে—জোয়ারের নদী যে রকম দুর্ব্বার আবেগে বাঁধা-খেয়া-নৌকাকে টানে। মাধবীর মন ছল ছল ক'রতে লাগল।

এমনি ক'রে মিনিট কুড়ি নিঃশব্দে কেটে গেল। এই সময়টা যে কি ক'রে কেটেছে তা সেই জানে। প্রত্যেক গণ্য মুহূর্ত্তটি যাবার সময় তাকে ঠেলা দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে—বন্ধু আসি। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখলে তার ছোট ভাই ক্ষিতি খুব ব্যস্তভাবে নীচে নামছে। দুজনে চোখোচোখি হ'তেই ক্ষিতি বলে উঠল—'বাঃ তুমি এখানে ব'সে আছ দিদি, আমি ওদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

মাধবী ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে—'চোখ বুজে খুঁজলে আর কি ক'রে দেখতে পাবি। কি দরকার শুনি?'

'শৈবালদা তোমাকে একবার ডাকছে দিদি! চল এখ্‌খুনি।'

মুহূর্ত্তে মাধবীর বুক দুলে উঠল। অপরিসীম বিস্ময় যেন তাকে নির্ব্বাক ক'রে দিল। শৈবাল যে তাকে আজ কোন কারণে ডাকতে পারে একথা কল্পনা করাও যে তার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। আজ শৈবাল নিজে থেকেই যে সব কলহের সৃষ্টি ক'রে গেছে যে রকম নির্ম্মমভাবে তাকে ক'রেছে আঘাত—তা সহজে ভোলবার নয় এবং মাধবী আশা ক'রেছিল সহজে এর মীমাংসা হবে না—হওয়া সম্ভবও নয়। সেই শৈবাল ডেকে পাঠিয়েছে এ কথা বিশ্বাস হয় কি ক'রে? মাধবী তার বিস্ময় ও কৌতূহল এতটুকু প্রকাশ হ'তে দিল না। তার মুখের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে জিগ্‌গেস ক'রলে—'ডাকছে কেন জানিস?'

'তা জানি না' ক্ষিতি গড়গড় ক'রে বললে—'আমি আর সুনীল কেরম খেলছি শৈবালদা বসে বললে—ক্ষিতি তোমার দিদি কি ক'রছে জান? আমি বললুম দিদি বিভাস মামার সঙ্গে গল্প ক'রছে—'

মাধবী বাধা দিয়ে রাগতভাবে বললে—'কেন তুই না জেনে ওকথা বলতে গেলি? আমি তো একা এই ঘরে ব'সে পড়ছি।' বলেই কথাটা নিজের কানে খট্ করে বাজল। ক্ষিতি যদি ওকথা শৈবালকে বলেই থাকে তাতে কি হয়েছে! মাধবী তো কোন অন্যায় করে নি।

'বাঃ তা আমি কি ক'রে জানব' ক্ষিতি বললে—'তোমাদের দুজনকে তখন নীচে দেখতে পেলুম না যে। তাই—'

মাধবী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'তারপর শৈবালদা কি বললে?'

'আমার কথা শুনে শৈবালদা তখ্‌খুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ঘরে এসে বললে—রাণীকে একবার এখ্‌খুনি আমার নাম ক'রে ডেকে নিয়ে এস'।

মাধবী একটুখানি কি যেন ভাবলে। তারপর বললে—'শৈবালদা তোর কথা শুনে অমন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন?'

ক্ষিতি অধীর হ'য়ে বললে—'তা আমি কি ক'রে জানব। তুমি আমার সঙ্গে এখন চল না।'

'শৈবালদাকে ব'লগে যা দিদি একটু পরে আসছে।'

'একটু পরে গেলে হবে না যে। এখন চল।'

'তুই বল গে যা না, একটা কাজ সেরে দিদি একটু পরে আসছে।'

ক্ষিতির ধৈর্য্যচ্যুতি অনেক পূর্ব্বেই ঘটেছিল। এখন মাধবীর এই ঔদাসিন্যে তা ক্রোধে পরিণত হ'ল। কোপ দৃষ্টিতে তাকে ভস্ম করে বললে—'কি তোমার কাজ যে যেতে পার না?'

মাধবীর মনটাও ভাল ছিল না। তার উপর ছোট ভাইয়ের এই স্পর্দ্ধায় সে একেবারে জ্বলে উঠল। ধমক দিয়ে বললে—'তোর সে খোঁজে দরকার কি? বড় যে স্পর্দ্ধা হ'য়েছে তোর দেখছি!'

অকস্মাৎ এই ভৎর্সনায় ক্ষিতি থতমত খেয়ে গেল। মাধবীও একটু বিস্মিত হ'ল ক্ষিতির এই কর্ত্তব্যপরায়ণতায়। ভাইকে সে জানে, পরের জন্য এতটা উদ্বেগ, পরের কাজের জন্য এতটা মাথা-ব্যথা তার কুষ্ঠীতে লেখে নি। তাই তার এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হ'য়ে ভাবলে—এই ভাইটির মধ্যে এমন মহৎ উদার টনটনে কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়ে তুললে কে। কিন্তু ক্ষিতির এই গভীর কর্ত্তব্য-

পরায়ণতার মূলে যে জিনিষটা অহরহ অনুপ্রেরণা দিচ্ছে সেটা হ'চ্ছে এই—আজ দুপুরে প্রতিদিনের মত ক্ষিতি আর সুনীল চ্যাম্পিয়ন খেলছিল কেরমে। ঠিক যখন খেলাটা পুরোদমে জমে উঠেছে এমন সময় গম্ভীরানন শৈবাল ঘরে বসে তাকে করলেন এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ। মনে মনে শৈবালের মুণ্ডপাত ক'রতে ক'রতে বাধ্য ছেলেটির মত ক্ষিতি আদেশ পালনে তৎপর হ'ল। কিন্তু মাধবীর মুখ থেকে এই জবাব পেয়ে তার ক্রোধ প্রচণ্ড হ'য়ে উঠল এবং সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মাধবীর উপর।

ক্ষিতি অকস্মাৎ করুণ হ'য়ে বললে—'তুমি যাবে না তো?'

'না—না—না—না' প্রত্যেকটা দন্ত্যনএ আকার ক্ষিতির বুকে শেলের মত হানিয়ে মাধবী বললে—'জিগ্‌গেস করি, আমার যাওয়া না যাওয়া নিয়ে তোর কি যায় আসে?'

চোখ রাঙিয়ে কার্য্যোদ্ধার সুবিধে হবে না দেখে সুবোধ ছেলেটির মত ক্ষিতি সত্য কথা স্বীকার ক'রে ফেলল। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললে—'শৈবালদা যে আমাদের খেলবার ঘরে ব'সে আছে। তুমি না গেলে ওখান থেকে উঠবে না। হয়তো রাগ ক'রে ব'লে বসবে—খেলা তুলে আঁকের খাতা নিয়ে বস।'

এতক্ষণে তার ব্যগ্রতার হেতু মাধবী বুঝলে। যদিও তার মনের অবস্থা ভাল নয় তথাপি সে সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে—'কেমন জব্দ, আরও আমাকে চোখ রাঙাও!'

'আচ্ছা আর কখ্‌খনো ক'রব না। তুমি চল।'

'তুই যা, আমি বিজনবাবুকে একটা কথা বলেই যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শৈবালদা কিচ্ছু বলবে না, কোন ভয় নেই।'

ক্ষিতি আস্তে আস্তে বললে—'শৈবালদাকে গিয়ে তবে বলি, দিদি তোমাকে ওপরের ঘরে গিয়ে ব'সতে বললে। সে এখ্‌খুনি আসছে।'

মাধবী পুনরায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে—'তাই বলিস।'

দিদির অভয়বাণী পেয়ে আর ক্ষিতি এক মিনিট দাঁড়ায় নি। মাধবীর কথা শেষ হ'তেই ছাড়া পাওয়া ঘোড়ার মত একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে চকিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্ষিতি যেন তার মনকে বিস্ময়ের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। শৈবাল তাকে ডেকেছে—বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছে—মাধবীর মনে এই কথাটা তোলপাড় ক'রতে লাগল। কি প্রয়োজন, শৈবালের কি প্রয়োজন তার সঙ্গে থাকতে পারে—যাতে এইসব ঘটনার পরও তাকে এমন ক'রে ডেকে পাঠাতে হয়! এই চিন্তায় তার মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যেতে লাগল। কত কথা—কত কল্পনা—কত চিন্তা জল বুদ্‌বুদের মত তার মনের সায়রে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, কত সন্দেহ কত সংশয় বুকের রক্তে দোলা দিয়ে গেল তবু এ আহ্বানের যথার্থ কারণ নির্ণয় হ'ল না। কেন এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান—কিসের জন্য? বাইরের দিকে চেয়ে মাধবী ভাবতে লাগল—সম্ভবতঃ কি কারণে শৈবাল এমন ক'রে ডাকতে পারে। আচ্ছা এও তো হ'তে পারে শৈবাল আবার তাকে অন্য কোন ছুতা ক'রে আঘাত করবার জন্য অপমান করবার জন্য ডেকেছে। এখন তার মনের অবস্থা যে কি তার তো তা অজানা নেই। এই তো এখন তার সম্বন্ধে ভাবা যায়। এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে। আজকের এই ঘটনার অন্য কোন সূত্র ধরে শৈবাল পুনরায় তাকে আঘাত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে এই সম্ভাবনা মনে উদয় হ'তেই রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তার বুকটা দ্রুতগতিতে ওঠা নাবা ক'রতে লাগল।

তবু মাধবী ভাবতে লাগল এর অন্য কারণ কি! সব দিক দিয়ে এর কারণ ভেবে দেখতে দেখতে হঠাৎ আর একটা সম্ভাবনায় তার সমস্ত অন্তর মেঘমুক্ত দিনের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ঠিক হ'য়েছে—এর কারণ অনুমান করা তো খুব সহজ—এতক্ষণ এই কথাটা সে বুঝতে পারছিল না। আজ শৈবাল সামান্য কারণে যে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত ক'রে গেছে, নির্ম্মমভাবে তাকে আঘাত ক'রেছে বিনা কারণে—ক'রেছে কটূক্তি—এখন সেই সবের জন্য তার অনুশোচনা হ'য়েচে। এখন তীব্রভাবে সে অনুভব ক'রছে কি ভুল, কি অবিচার সে তার উপর ক'রেছে সাময়িক উত্তেজনায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। তাই যখন সে নিজের দোষ বুঝলে তখন কালবিলম্ব না ক'রে তাকে আহ্বান ক'রলে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবার জন্য। শৈবাল শিক্ষিত হৃদয়বান যুবক, তার পক্ষে এই

পরিবর্ত্তনই তো স্বাভাবিক। আর তা ছাড়া শৈবাল সম্বন্ধে একথা ভাববারও কারণ আছে। বছরখানেক আগেকার একটি দিনের কথা মাধবীর স্মরণ হ'ল। সে দিন চায়ের টেবিলে ব'সে চা খেতে খেতে দুজনের মধ্যে কি একটা কথা নিয়ে হয় বচসা। শৈবাল চা এবং খাবারের প্লেট ফেলে উঠে চ'লে গিয়েছিল। দোষ অবশ্য হ'য়েছিল শৈবালের এবং নিজের এই দোষ বুঝতে পেরে সেইদিনই সে এসে মিটমাট করেছিল। সেই তো শৈবাল—সুতরাং আজ তার এমনতর আচরণে তো বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, বরঞ্চ এই তো স্বাভাবিক। এমনতর অনেক চিন্তা অনেক কল্পনা অনেক দ্বিধার পর মাধবীর সংশয়-ক্ষুব্ধ মনে অবশেষে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল, তাকে আঘাত অপমান ক'রতে হয়, তার কাছে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইতে, প্রীতি স্থাপন ক'রতে শৈবাল তাকে এমন ক'রে আহ্বান ক'রেছে। মাধবী তো মনে প্রাণে এই কামনা করে। এই কথাটা আবিষ্কার করবার পর একটা তীব্র আনন্দের অনুভূতি মাধবীর মধ্যে উঠল প্রবল হ'য়ে। মাধবী নিশ্চিন্ত হ'ল—সুখী হ'ল। তার চোখের সামনে দিয়ে রাত্রির ছবিখানা আবার রঙে রসে বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল মধুর হ'য়ে উঠল। এমনই হয়, ঘাত প্রতিঘাতের পর মানুষের বিদগ্ধ মনে যখন আনন্দের বার্ত্তা এসে পৌঁছায় তখন সেই আনন্দ মনকে এমনই আত্মহারা করে।

মাধবী বইখানা আলমারিতে যেমন-তেমন ক'রে রেখে ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিজন তারই জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে র'য়েছে তার সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির অনুমতি নিয়ে শৈবালের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে। কিন্তু এই মনোমালিন্যের পর চোখোচোখি হওয়ার কল্পনায় সে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। শৈবাল নিজের ব্যবহারের জন্য যখন অনুতপ্ত হ'য়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রবে তখন মাধবী যে কোন প্রকারে হ'ক এই লজ্জাকর প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে ওপক্ষই তো কেবল দোষী নয়, তার নিজেরও যে গলদ র'য়েছে। শৈবাল যদি কথায় কথায় তার সেই নিষ্করুণভাবে প্রকাশিত মিথ্যাচারের কথা উল্লেখ করে, তখন সেই অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাবে কি ক'রে! কিন্তু তা কি সে ক'রতে পারে? নাঃ এ শৈবাল কোনমতেই ক'রতে পারে না। এই রকম নানা সন্দেহ নিয়ে মাধবী দ্বিধায় ঘরে ঢুকল। দেখলে বিজন একা খাটের উপর চুপ ক'রে ব'সে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। দৃশ্যটা তার চোখে খুবই খারাপ ঠেকল। বিজন আজ তার বাড়ীর সম্মানিত অতিথি। সে এই রকম একা ঘরে ব'সে মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিচ্ছে। বাড়ীর একটি প্রাণীও তার কাছে নেই। ছি ছি সে কি ভাবছে! মাধবী লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল।

মাধবীকে দেখেই বিজন নিরসকণ্ঠে বললে—'এই যে আসুন'। মাধবী লজ্জিত হ'য়ে তার সামনে এলে পর বিজন বললে—'আপনি তো পরমানন্দে হাসিতে গল্পে সময় কাটাচ্ছিলেন, এদিকে একা ঘরে ব'সে আমার কি অবস্থা হ'চ্ছিল তা কি ভেবেছেন?' মাধবীর নিঃশব্দ নতমুখের দিকে চেয়ে বিজন তারপর বললে—'এখন আমার সঙ্গে ব'সে সময় নষ্ট ক'রতে যদি নাই পারবেন তো এটা তখন এসে ব'লে গেলেই হ'ত। আমি নিশ্চয় আপনাকে জোর ক'রে ধরে রাখতাম না!'

তার মুখের হাসি সত্বেও এর অন্তরালের নিহিত অভিযোগ মাধবীকে আঘাত ক'রলে। তার এই অভিযোগ তো মিথ্যা নয়, মাধবী দেখলে তার এই অনুপস্থিতি তাকে ক্ষুব্ধ করেনি, বিজন ক্ষুব্ধ আহত হ'য়েছে এই কথা ভেবে—এই অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে মাধবী তাকে অবজ্ঞা ক'রেছে। মাধবী সমস্তই বুঝলে। অপরাধীর মত মাথা নত ক'রে আস্তে আস্তে বললে—'আমি ভেবেছিলুম আপনি ঘুমিয়ে প'ড়েছেন তাই আসি নি।'

মাধবীর কথায় সত্যের অপলাপ ছিল কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ও মুখের ভাবে এমন একটা কিছু তার নজরে প'ড়ল যাতে মাধবীর কথা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস ক'রতে তার বাধল না। মাধবীর হয় তো কোন দোষ নেই। হয় তো সে সত্যই তাই ভেবেছিল। বিনা কারণে ঐ নতমুখী সুন্দরী মেয়েটিকে শ্লেষ ক'রে বিজনের আর অনুশোচনার অবধি রইল না। কেন সে তাকে ব্যঙ্গ ক'রলে? তার কথা শেষ হ'লে একটু পরে বিজন বললে—'ভেবেছিলেন ঘুমিয়ে প'ড়েছি? কিন্তু সে রকম তো কথা ছিল না।'

মাধবী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজন বললে—'আপনার ইনট্যুইশন তাহ'লে ঠিক হয় নি একথা আশা করি অকপটে স্বীকার ক'রছেন ?'

বিজন তাহ'লে পরিহাস ক'রছে নাকি! মাধবী আনত দুটি চোখ ভয়ে ভয়ে তুলতেই দেখলে বিজন সহাস্যমুখে স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মাধবী সেই মুহূর্ত্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে সলজ্জে বললে—'করছি।'

'এই ভুলের শাস্তিও নিতে রাজী আছেন ?'

'তাও আছি।'

'বেশ আমার সামনে এসে বসুন।'

'বসছি।'

'এই শাস্তি বুঝলেন!'

'এ কি রকম ?'

'এখন ঘণ্টা দুই কোথাও যেতে পারবেন না'—বিজন হেসে বললে—'এ ছাড়া সুন্দরী মেয়েকে আর কি শাস্তি দিতে পারি।'

মাধবী বিপদে প'ড়ল। এ কি ক'রে হবে? এখনি যে তাকে যেতেই হবে শৈবালের কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে একথা কি ক'রে ব'লবে—আমাকে মিনিট কুড়ির জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দাও, ফিরে এসে তোমার সঙ্গে প্রাণভরে গল্প ক'রব। তুমি হয় তো জান না আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার কথা শোনবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে।

'এ শাস্তি কি খুব গুরুতর মনে হ'চ্ছে ?'

মাধবী একবার মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

'চুপ ক'রে আছেন যে, কথা বলুন!'

মাধবী আবার সেইরকম ক'রলে। সে যে কি একটা কথা বলবার জন্য উসখুস ক'রছে অথচ পারছে না—তা বিজনের তীব্রদৃষ্টিতে ধরা প'ড়ল। সে পুনরায় বললে—'কি আশ্চর্য্য, কি ব'লতে চান বলুন! বাবারে বাবা, আপনার মান ভাঙাতে আর পারি নে।'

মাধবী জোর ক'রে হেসে বললে—'অভয় দিচ্ছেন তো ?'

'হাঁ।'

'তা হ'লে বলি ?'

'বলুন।'

'নাঃ, আর বলা হ'ল না।'

'সে কি! ব'লবেন না কেন ?'

'বাবাঃ আপনি যে রকম গম্ভীর হ'য়ে আছেন। না হাসলে ভরসা পাচ্ছি না।'

'আমি ভাল ক'রে না হাসলে ব'লবেন না ?'

'উঁহু।'

বিজন তার এই ছোট্ট খুকির মত আবদার দেখে গভীর আমোদ পেয়ে হেসে উঠল। বললে—'এই তো হাসলাম, এবার বলুন!'

মাধবী দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে বললে—'একবার আধঘণ্টার জন্য আমাকে ছুটি দেবেন ?'

'কেন ?'

'একটা বিশেষ দরকার আছে তাই।'

'বেশ তো যান্। তার জন্য এত কুণ্ঠা কেন!'

'একটা বিশেষ দরকার প'ড়ল ব'লেই—নইলে—'

'তা জানি। যান্।'

'আপনি কি একা ব'সে থাকবেন ?'

'কি ক'রব ?'

'তবে থাক্, আমি যাব না।'

'কেন যাবেন না ? আপনার যে দরকার আছে।'

'তা থাক। আপনাকে এমনভাবে ফেলে যেতে পারব না।'

'না, তা হবে না' বিজন জেদ ক'রে বললে—'আপনাকে দরকার সেরে আসতেই হবে।'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বললে—'তাতে কিছু এসে যাবে না। একথা কেন মিথ্যে ভাবছেন—আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে কাছে গেলে আমি ভাবব—আপনি আমাকে অবহেলা ক'রলেন!' তার কণ্ঠস্বর সহসা একটুখানি কেঁপে উঠল, বললে—'একদিনের পরিচয় হ'লেও আমি আপনাকে চিনি। এতখানি নির্ম্মম তো আপনি আমার ওপর হ'তে পারেন না!'

মাধবীর সমস্ত মুখ অকস্মাৎ টক্‌টকে রাঙা হ'য়ে উঠল এবং পরক্ষণেই অসীম লজ্জায় তার দৃষ্টি আনত হ'ল। বিজনের আবেশকম্পিত শেষের কথাটি তার অন্তরের কোমল স্থানে গিয়ে আশ্চর্য্যভাবে স্পর্শ ক'রলে এবং সেই নিমিষেই কি এক অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধিতে তার সারা অন্তর রসে পরিপূর্ণ হ'য়ে দুলে দুলে উঠল। মনের বৃন্তে লাগল

রঙের মায়াময় ছোঁয়াচ। বাইরের লজ্জা এবং ভিতরের নিবিড় অচিন্ত্যপূর্ব্ব উপলব্ধি তাকে স্তব্ধ ক'রে রাখলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুজনের এই স্তব্ধতার মধ্যে যে অর্থ নিহিত ছিল তা দুজনের কার'র কাছেই গোপন থাকল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু সিঁড়ির মুখে সে থমকে দাঁড়াল। নীচের সিঁড়িতে মৃদু পদশব্দ, কারা যেন কথা কইতে কইতে উপরে উঠছে। অপরিসীম কৌতূহল ও চাঞ্চল্যে তার বুকের ভেতরটা অকস্মাৎ আলোড়িত হ'য়ে উঠল। ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে মুখ বাড়িয়ে দেখলে সবিতা এবং শৈবালের মা মায়ারাণী উপরে আসছে। মাধবী বুঝল তাসখেলার জন্য সবিতা নিয়ে এসেছে মায়ারাণীকে। তার ইচ্ছা হ'ল এই নিমেষেই ছুটে ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নীচে পালিয়ে যায়। কারণ সে বিলক্ষণ জানে—সবিতার সঙ্গে দেখা হ'লে এক মিনিটের জন্যও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না—এই মুহূর্ত্তেই তাস খেলতে ব'সতে হবে। অথচ সবিতার কাছ থেকে জোর ক'রে যে যাবে তারও উপায় নেই, সঙ্গে মায়ারাণী র'য়েছে। কিন্তু নিমেষের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার পূর্ব্বেই তাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। সবিতা ভালভাবে তাস খেলা হবার সম্ভাবনার আশায় হর্ষপ্রকাশ ক'রল, মাধবী নৈরাশ্যে অচঞ্চল হ'য়ে থাকবার প্রয়াস ক'রলে। শৈবালের কাছে যাবার এখন কোন উপায় নেই, মাধবী নাছোড়বন্দা—সবিতার হাতে নিরুপায়ের মত আত্মসমর্পণ ক'রে তাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। তারপর বিজনের সঙ্গে মায়ারাণীর পরিচয় প্রণাম আশীর্ব্বাদ—দুজনের মধ্যে সুস্নিগ্ধ আলাপ আলোচনা ইত্যাদির পর ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে চারজনে বসল তাস খেলতে। তাস হাতে ক'রে মাধবী ভাবছিল, তার এখন না যাওয়ার কারণ যদি এই দেখান যায়—তবে শৈবালের তা মনঃপূত হবে কি না। এদিকে দেখতে দেখতে তাদের খেলা খুব জমাটি হ'য়ে উঠল।

মিনিট পনের কুড়ি কেটেছে, খেলা চ'লছে পুরোদমে, কার'র মুখে একটি কথাও নেই, সকলের দৃষ্টি হাতের তাসের উপর, তাদের সকলকে ঘিরে একটি স্তব্ধতা স্থির হ'য়ে র'য়েছে। এমন সময় একটি দশ বার বছরের সুশ্রী ছেলে সলজ্জে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মায়ারাণী বললেন—'কি রে খোকা ?'

মায়ারাণীর কথায় সকলেই সেইদিকে তাকাল। মাধবী দেখলে—শৈবালের ভাই সুনীল এসেছে।

সুনীল সলজ্জে বললে—'রাণুদিকে একটা কথা ব'লব।'

সবিতা জিগ্‌গেস ক'রলে—'কি কথা সুনীল ?'

'জ্যাঠাইমা এবার আপনি তাস দিন না'—মাধবী ভাঁজ-করা তাসগুলা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'আমি এখ্‌খুনি আসছি।'

'বেশী দেরী করিস নে যেন।'

সুনীলের হাত ধরে মাধবী পাশের ঘরে নিয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'কি বলবে বল ?'

সুনীল বললে—'তোমাকে দাদা ডাকছে রাণুদি, আমার সঙ্গে চল।'

'কেন ডাকছে জান ?'

'তা তো বলে নি দাদা, ক্ষিতিকে আবার আসতে বলেছিল—ও বললে, দিদি আমার কথা শুনবে না—তাই আমাকে পাঠালে।'

'তোমাকে কি বললে ?'

'বললে যে' সুনীল ঈষৎ দ্বিধায় বললে—'তোর রাণীদিকে একবার সঙ্গে ক'রে ডেকে নিয়ে আয়—যদি এখন না আসে বলিস আর আসবার দরকার নেই। তুমি এখনি একবার আমার সঙ্গে চল না রাণুদি।'

মাধবী চুপি চুপি বললে—'একটা কথা ব'লতে পার সুনীল ?'

'কি বল ?'

'তোমার—তোমার শৈবালদা আজ ভয়ানক রেগে আছে, না ?'

কথাটা যে কতখানি সত্য তা সুনীলের চেয়ে বেশী আর কে জানে! কিন্তু পাছে তাঁর মুখের এই সত্য কথা মাধবীর যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায় বা অন্য কোন বিপদ উপস্থিত করে, এই জন্য সুনীল বেমালুম সব বুদ্ধি খরচ ক'রে বললে—'রেগে থাকবে কেন রাণুদি? কি হ'য়েছে ?'

'রেগে নেই ?'

'কই না তো। তুমি চল না রাণুদি।'

মাধবী নিশ্চিন্ত হ'ল। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ

রইল না ক্ষিতি হতভাগাটা তাকে তাড়াতাড়ি ওখানে নিয়ে যাবার জন্য মিথ্যে ক'রে শৈবালের রাগের কথা ব'লেছিল। সে যাক, কিন্তু যে আবার বিশেষ প্রয়োজনে সুনীলকে দিয়ে ডেকে পাঠালে তার কি হবে! বিশেষ প্রয়োজনটা যে কি—তা তো মাধবীর অজ্ঞাত নেই। মাধবী ভাবলে এই মুহূর্ত্তেই সুনীলের সঙ্গে শৈবালের কাছে চ'লে যায়, কিন্তু একটু পরেই তার মনের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটল। আচ্ছা—মাধবী সকৌতুকে মনে মনে ভাবলে, সে যদি এখন নাই যায়—তো কেমন হয়! সে নিশ্চয় জানে শৈবাল তার অনুতপ্ত হৃদয়ের ভার লাঘব করবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে তাকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে। এখন যদি সে না যায় তাহ'লে শৈবাল ভাববে যে মাধবী তার নির্ম্মম ব্যবহারে এত মর্ম্মাহত হয়েছে যে তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে সে রাজী নয়। এই অবস্থায় যদি শৈবাল এই কথা ভাবে তাহ'লে সে কি চুপ ক'রে থাকতে পারবে? কখনো না, তাকে এইখানে ছুটে আসতেই হবে। মাধবী যদি তাই করে তাহ'লে সবটা মিলে কেমন অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হয়!

মাধবী আস্তে আস্তে বললে—'আমি তো এখন যেতে পারব না সুনীল!'

'কেন রাণুদি, এখ্‌খুনি তো চ'লে আসবে! একবার চল না।'

'কি ক'রে যাব ভাই তাস খেলছি যে, আর শরীর আমার ভয়ানক খারাপ—এখুনি হয়তো জ্বর আসবে, আজ আমি কিচ্ছু খাই নি। নেহাৎ ওরা ছাড়ছে না তাই খেলছি।'

'যেতে পারবে না?'

'না ভাই।'

'তা হ'লে গিয়ে দাদাকে বলি—রাণুদি কিচ্ছু খায় নি, শরীর বড্ড খারাপ হ'য়েছে এখুনি জ্বর আসবে—তাই আসতে পারলে না!'

'হাঁ।'

সুনীল প্রস্থান ক'রলে পর মাধবী সকৌতুকে ভাবলে মোক্ষম চাল চালা হ'ল। এর পর কি শৈবাল না এসে পারে। এই জিনিসকে আশ্রয় ক'রে মাধবীর কল্পনা স্রোতের নৌকার মত তর্ তর্ ক'রে এগোতে লাগল। এখনি শৈবাল এসে প'ড়বে। মিটে যাবে সব কলহ বিবাদ মনোমালিন্য, সব আঘাতের জ্বালা ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে ফিরে আসবে সেই প্রীতি মমতা স্নেহ শ্রদ্ধা।

কিছুদিন আগে কোন এক গানের সভায় হরেন চাটুয্যের মুখে 'প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি, সেই তো আমার জয়' গানখানি তাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ক'রেছিল, আজ তারই অপূর্ব্ব সুর তার মনে স্বতঃ উৎসারিত হ'চ্ছে পিয়ানো বাজিয়ে তারা ফোটা উষ্ণ সন্ধ্যায় আজ সেই গানখানি গাইবে। কত গল্প হবে তাদের তিনজনের মধ্যে। আনন্দ গুঞ্জনে কলরবে কত অফুরন্ত কথার ফাঁকে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাবে তা তাদের খেয়ালই থাকবে না, এই আনন্দের অনুভূতি নিয়ে মাধবী ঘরে এসে তাস খেলায় যোগদান ক'রলে। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হ'য়ে রইল একজনের পদধ্বনির আশায়। সে আসে—আসে—আসে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবার পর তাদের তাস খেলা ভাঙল। মায়ারাণী চ'লে যাবার আগে বিজন ও মাধবীকে পরের দিন দুপুরে তাঁর বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। সবিতা বিজনের বৈকালিক জলখাবার আয়োজন করতে নীচে গেল।

বৈকাল শেষ হ'য়ে এল। পশ্চিম আকাশে অজস্র রঙের খেলার মধ্য দিয়ে দিনান্তকালের সূর্য্য যাচ্ছে অস্তাচলে, অদূরে নারকেল বনের ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিগন্তের গায়ে আগুনের একটানা স্রোত দেখা যাচ্ছে। নারকেল গাছের ঘন সবুজ ঝালরগুলি সোণা মেখে মৃদু মৃদু কাঁপছে। আর সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো এসে মাধবীর সুকুমার মুখে, মাথার চেরা সিঁথিতে, ঘন সুগন্ধ কেশে প'ড়ে অপরূপ সুষমাময় করে তুলেছে। বিজন মুগ্ধ হ'ল। কিন্তু তার মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকার পরিবর্ত্তে তার সূর্য্য-রক্তিম সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন কল্পনা ক'রে অকস্মাৎ তার বুকের ভেতরটা শির্ শির্ ক'রে উঠল।

বিজন বললে—'বিকালটা কি ক'রবেন? চলুন দুজনে খানিকটা ভাল ক'রে বেড়িয়ে আসি।'

মাধবী লজ্জিত হ'য়ে বললে—'মোটর তো নেই। বাবা কলকাতায় নিয়ে গেছেন।'

'মোটর কি হবে? এমনি পায়ে হেঁটে খানিকটা মাঠের ধারে বেড়িয়ে আসব।'

'বেশ, তাই যাবেন আপনি।'

'বাঃ আমি একা যাব নাকি? আপনিও সঙ্গে যাবেন, দুজনে না হ'লে বেড়িয়ে আনন্দ আছে। নিন—নিন—ঠিক হ'য়ে নিন। বিকালে বাড়ী ব'সে থাকতে আমার অসহ্য লাগে!'

'বেড়াতে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

'হাঁ।'

'শাস্ত্রের উপদেশ কিন্তু আপনার অমান্য করা হয়—পথিনারীবিবর্জ্জিতা।'

'তা হ'ক—আপনাকে পেলে আমি অনেক উপদেশ অমান্য ক'রতে পারি।'

একটু পরেই বৈকালিক জলযোগ ক'রতে সবিতার আহ্বানে বিজন নীচে নেমে এল। একধারে একখানা আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে দুধের মত শাদা পাথরের থালায় খোসা ছাড়ান নানারকমের উৎকৃষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন এবং কাঁচের গেলাসে সুগন্ধি বরফসংযুক্ত জমাট তরমুজের সরবৎ।

সবিতা এদিক ওদিক চেয়ে বললে—'রাণী গেল কোথা? জলখাবারটা এসে খেয়ে যাক্ না বাপু।

তরমুজের সরবতের গেলাসে মৃদু চুমুক দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে নাড়তে নাড়তে বিজন জবাব দিল—'বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে।'

'কোথায় বেড়াতে—এই যে একেবারে সাজসজ্জা ক'রেই এসেছিস! চল, খাবার খাবি চল।'

'আমার এখন খেতে একটুও ইচ্ছে ক'রছে না কাকীমা'—মাধবী রূপের তরঙ্গ তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—'সন্ধ্যাবেলা এসে খাব।'

'তরমুজের সরবৎ ক'রেছি, তাই একটু খেয়ে যা না!'

'আচ্ছা দা-ও।'

বিজন বললে—'দেরী না ক'রে খেয়ে আসুন। এদিকে যে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে তা লক্ষ্য ক'রেছেন।'

সবিতা চ'লেই যাচ্ছিল, বিজনের কথা কানে যেতেই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—'ওকি রাণীর সঙ্গে আবার 'আপনি' 'আজ্ঞে' ক'রে কথা কি। ও তোর চেয়ে অনেক ছোট তা জানিস? না—না—ও সব কেতাবি চাল এখানে চ'লবে না! রাণীকে 'তুমি' ব'লেই কথা কইতে হবে।'

বিজন এই জন্যই অপেক্ষা ক'রছিল। মনে মনে প্রীত হ'য়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে—'তুমি বললে তো হবে না দিদি, আর একজনের যে অনুমতি চাই।'

সবিতা মাধবীর মুখের দিকে চাইলে। মাধবী সলজ্জ কৌতুকে বললে—'তার জন্য আটকাবে না। আমি 'পাওয়ার অফ্ এটর্ণি' দিলাম।

সবিতা স্নেহ-স্নিগ্ধ হাসিটি হেসে বললে—'তা হ'লে আমার সামনে নাম ধরে 'তুমি' ব'লে ডাক্।'

বিজন তেমনি গম্ভীর হ'য়ে মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—'আর মিছিমিছি দেরী ক'রছ কেন! তাড়াতাড়ি খেয়ে এস না, রাণী।'

(ক্রমশঃ)

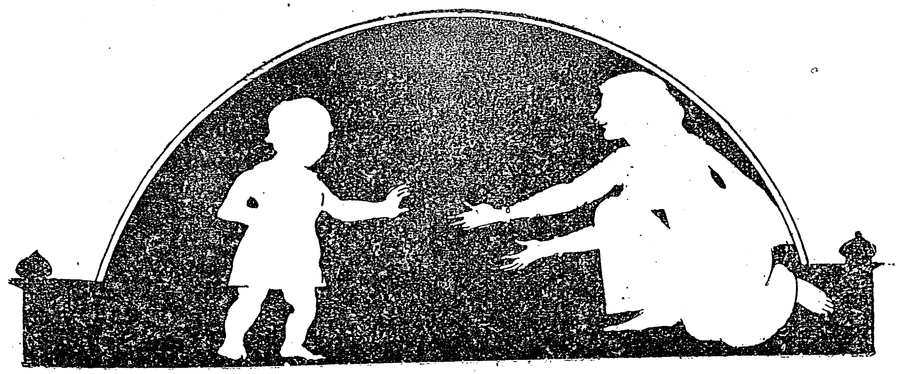

ভারতীয় ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্-সি,

ভারতবর্ষে বর্ণ-ধর্ম্মের বহুলতা ভারতীয় সমাজকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উপর ভিত্তি করিয়া। ভারতীয়ের সমাজ-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক আচার-রীতি-নীতি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে এমন কথা যদিও বলা চলে না, তথাপি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না বা সত্যের অপলাপ করা হয় না যে ভারতের বিভিন্ন সমাজের আচার-নীতির উপর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে এবং সামাজিক রীতি-নীতি আচার-নিষ্ঠা যেন ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে আমরা আমাদের ধর্ম্মের আদর্শকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হই। বিবাহের বয়স, পুনর্ব্বিবাহ, পর্দ্দা-নীতি, নারীর কর্ম্ম-জীবন, পুরুষের কর্ত্তব্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বৈধব্য জীবনের নিষ্ঠা, কুমারীর শুচিতা প্রভৃতি এতদ্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্নভাবে বর্ণানুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। যে সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের সমাজগুলি গঠিত হইয়াছে, অথবা এক কথায় বলিতে গেলে যে সকল ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস এতদ্দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এবং চূড়ান্ত আলোচনা করা সুকঠিন—সুকঠিন কেন প্রায় অসম্ভব; ইহা অতিশয়োক্তি নহে, কারণ প্রচলিত ধর্ম্মমত-সমূহ বিভিন্ন এবং এত বিস্তৃত যে সকলগুলির সন্ধান করিয়া উঠাই শক্ত। একে তো বহু বিস্তৃত, তদুপরি আবার অনেক সময়ে দেখা যায় নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তবে এ সকল আলোচনায় আদমসুমারীতে স্বীকৃত ও উক্ত ধর্ম্মমতগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অগ্রসর হওয়াই সুবিধাজনক এবং তাহাতেই তবু যাহা কিছু তথ্য সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

গত আদমসুমারীতে (১৯৩১ খৃঃ) ভারতীয় ধর্ম্মমত-গুলিকে প্রধানতঃ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান্, জু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ট্রাইবাল নামে অপর একটি বিভাগ করা হইয়াছে। নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য বা অসভ্য এবং আদিম অধিবাসীগণ এই ট্রাইবাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইতঃপূর্ব্বে ইহাদিগকে অন্যান্য আদমসুমারীতে "এ্যানিমিষ্ট" (animist) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (১) মোটামুটিভাবে উক্ত নয়টি মতের উল্লেখ ও আলোচনাই প্রধানতঃ আদম-সুমারীর বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়; আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য অন্যান্য আরও দুই-চারিটি বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী দলের সন্ধানও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের স্থূল পার্থক্য তেমন কিছু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না; এইরূপ ক্ষেত্রে যেগুলি সুনির্দ্দিষ্টভাবে কোন মতের গণ্ডিতে পড়ে না সেইগুলিকে একটি ভিন্ন দলভুক্ত করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর বিবরণীগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা না করিয়া 'অন্যান্য' বলিয়া একই শীর্ষান্তর্গতরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। উক্তরূপ বিভাগে যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি বিভক্ত করিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তথাপি সীমা নিরূপণ নিঃসন্দেহ এবং নিখুঁত কোন ক্রমেই বলা যায় না এবং ডাঃ হাটনও এইরূপ অতৃপ্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে 'ঐগুলিতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারা যায় না এবং চূড়ান্ত বা নির্ভুল নহে' (২)। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধগণকে হিন্দু বলিয়া দাবী করে; তাহারা তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় যে এই সকল ধর্ম্মমতের গোড়া-পত্তন হইল হিন্দুধর্ম্ম হইতে। হিন্দুরা তো দাবী করে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দু; কিন্তু দেখিতে হইবে তাহারা আবার সেই দাবী স্বীকার করে কি না।

(১) *Census of India*, 1931, Vol. V (Bengal), part I, page 403.

(২) "This is the most practical division available but is admittedly not satisfactory since difficulty arises in the case of many of these terms, particularly so in that of the term Hindu, which is not entirely exclusive of some other terms used."—*Census of India*, 1931, Vol. I (All India), part I, p. 379.

বসন্তের রাণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রথমতঃ শিখ। শিখগণ কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহে; হিন্দুগণের দাবী তাহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অতএব শিখগণকে হিন্দু হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। অথচ শিখদের মধ্যে কিন্তু একদলকে দেখা যায় তাহারা যেন শিখ ও হিন্দুর মাঝামাঝি। ইহারা শাহেজধারী শিখ নামে পরিচিত। ইহারা নবম গুরুর আরাধনা করে, অথচ দশম গুরুকে স্বীকার করে না। অন্যান্য শিখদের ন্যায় ইহারা বেণী বাঁধে না, চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ জৈন। জৈনদের বেলা সমস্যা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়ে। ইহাদের অনেকে নিজেদের হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই অবিসম্বাদে নিজেকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না। ইহার যথার্থতা আমরা আদমসুমারীর সংখ্যা তালিকা আলোচনা করিয়াই প্রমাণ করিতে পারি। সমগ্র ভারতবর্ষে জৈন মতাবলম্বী ১,৩৫২,৬৩১ জনের মধ্যে মাত্র ১২,৩২৬জন হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; অর্থাৎ জৈন জনসংখ্যার হাজার করা ৯৮জন মাত্র হিন্দুরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। আর ১২,৭৮৬,৮৩১ জন বৌদ্ধের কেবল ৭০জন, অর্থাৎ হাজার করা ০·০০৫জন নিজেদের হিন্দু বলিতে রাজী আছে। যুক্তপ্রদেশের সেন্সস্ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট তাঁহার বিবৃতিতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে জৈনগণও ক্রমেই হিন্দুগণ হইতে আরও পৃথক হইয়া পড়িতেছে। (৩)। পূর্ব্বে তবু যতটুকু সামাজিক মিলামিশা ছিল তাহাও এখন কমিয়া আসিতেছে; অবশ্য বর্ত্তমানেও তাহারা হিন্দু কন্যাকে ঘরের বৌ করিয়া নিতে তত আপত্তি করে না, কিন্তু জৈন কন্যাকে হিন্দু পরিবারে বিবাহ দিতে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই-একটি এমন অদ্ভুত রকম মত-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার তেমন কোন কারণ বা যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কবীরপন্থী ও সৎনামীগণ আপনাদিগকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে দেখা যায় ক্রমে তাহারা হিন্দুগণের সহিত মিশিয়া যাইতেছে এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে তাহাদের বিবৃতি অনুসারে তাহাদিগকে হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণনা করা হইয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কতিপয় কবীরপন্থী 'হিন্দু' পরিচয় দিতে অস্বীকৃত থাকায় তাহাদিগকে "অন্যান্য" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের দাদুপন্থীগণও হিন্দু হইতে পৃথক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে; তাহাদিগকেও সেই হেতু "অন্যান্যের" অন্তর্গত বিবেচনা করা হইয়াছে। অনন্তর অন্যান্য সকল ধর্ম্মমতকে কোন না কোন হিসাবে পরস্পর হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক বলিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম ও ট্রাইবাল ধর্ম্মগুলির পার্থক্য অনেকস্থলে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেকগুলি মধ্যবর্ত্তী দল আবার দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলিকে হিন্দু কি ইস্‌লাম বা হিন্দু কি খৃষ্টান বলিয়া নিঃশংসয়ে কোনটিরই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নির্দ্ধারণ করা যায় না, মূলতঃ উভয় দিকেই ইহাদের অনেকাংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

তৎপর এতদ্দেশীয় জু-দের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেও আবার কিঞ্চিৎ সমস্যা আসিয়া পড়ে। টিন্নেভেলিতে একদল জু আছে যাহারা জু এবং খৃষ্টান উভয়তঃই আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অবশ্য জু-গণের স্বতন্ত্র সত্তাই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। জু-গণের উপর কিন্তু হিন্দুর প্রভাব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কেবল বেণী ইজরাইল দলের মধ্যে দেখা যায় হিব্রু নাম ব্যতীত হিন্দু বা হিন্দু ধরণের একটি দ্বিতীয় নাম তাহারা প্রথাগতভাবে গ্রহণ করে।

দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টানগণের সামাজিক জীবন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস আলোচনা কালে আবার জটিলতা কিঞ্চিৎ অধিক পরিদৃষ্ট হয়। তথাকার ক্যাথলিকগণ প্রায়ই বর্ণ-বিভাগ স্বীকার করে; কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট্‌রা আবার সকলে বর্ণবিভেদ মানিয়া চলে না। অপর দিকে প্রোটেষ্টাণ্ট্‌রা কিন্তু পংক্তি-ভোজন সমর্থন করে, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণীর একই টেবিলে আহারাদি করিতে তাহাদের আপত্তি আছে। ক্যাথলিকগণ পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে প্রতিবেশীর আচার-নীতির প্রতি তো দৃষ্টি রাখেই, তা' ছাড়া বিবাহ

(৩) ১৯৩১ খৃঃ আদমসুমারীর যুক্তপ্রদেশের বিবরণীতে "ধর্ম্ম" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্যাপারেও অঙ্গুরীয়ের পরিবর্ত্তে "টালী"* ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তদ্দেশে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য আচারগুলিও তাহারা মানিয়া চলে, যেমন সন্তানের জন্ম হেতু অপবিত্র মানুষ বা জাতাশৌচের সংস্পর্শ বিবাহাদি পবিত্র কর্ম্মাচরণে নিষেধ আছে। অবশ্য এইরূপ নিষেধের সমর্থনে তাহারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দোহাই দেয়।

লিঙ্গায়েৎগণের আচার-নীতির অনেকাংশে খৃষ্ট-মতাবলম্বীগণের সহিত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে (কুমারী মেরীর) অপাপস্পৃষ্ট গর্ভ-প্রবাস (immaculate conception)† বিশ্বাস করে এবং শবদেহের সমাধি প্রথায়ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর কানাড়ায় এক শ্রেণীর বনচর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের কুল পরিচয় দেখা যায় খৃষ্টধর্ম্ম সমুদ্ভূত; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

ভারতের অস্পৃশ্যদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গোলযোগ অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের মধ্যে এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যথার্থ পক্ষে ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের রূপ ও ক্রম নির্দ্ধারণ এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার। লালবেগিগণের ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠিয়াছে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্ম্মের সূত্র অবলম্বন করিয়া। পঞ্জাবের ছেতরামী দলের বেলায় অবস্থা দেখা যায় আরও বিচিত্র। ইহারা খৃষ্ট-হিন্দু-মুস্‌লিম সকল বিশ্বাসের এক অদ্ভুত সমন্বয় করিয়া লইয়াছে। ইহারা ত্রিশক্তির আরাধনা করে এবং ত্রিশক্তির রূপ ও শক্তি এইরূপ ঃ—'আল্লাহ'—বিধাতা (সৃষ্টিকর্ত্তা), পরমেশ্বর—রক্ষক এবং খুদা সংহারক। এইরূপ আরও এমন কতকগুলি দল সমগ্র ভারতময় দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের কোন্‌টি হিন্দু বা কোন্‌টি মুসলমান তাহা নিরূপণ এক বিরাট সমস্যা। গুজরাট, কচ্ছ ও খানদেশের সৎপন্থী বা পীরপন্থীগণের মধ্যে আবার বৈচিত্র্য আরও অদ্ভুত। মাথিয়া কুম্বী একটি বর্ণ বিশেষ। এই মাথিয়া কুম্বীগণ এবং লাবা কুম্বীদের একটি শাখা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে বলিয়া গত আদমসুমারী অনুসারে দেখা যায় (৪)। ইহারা অথর্ব্ব বেদের অনুসরণ করে বলিয়া জানা যায়। ইহারা পীরানা এবং অন্যান্য স্থানের মুসলিম সাধু বা পীরগণের সমাধি-মন্দিরে বসিয়া দৈনিক প্রার্থনা এবং অন্যান্য ব্যাপার উপলক্ষে আরাধনা করে। সেই জন্যই বোধ করি পীরপন্থী ইহাদের অন্যতম সাম্প্রদায়িক নাম। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ইমাম শাহ পীরানার পীরের উপদেশাবলীর সংগ্রহ মাত্র (৫)। ইহারা রমজান উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং কলমা পাঠ করে; অথচ শব রক্ষাকালে মুসলিম প্রার্থনা ও হিন্দু স্তোত্রাদি পাঠ উভয়ই ইহাদের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা হোলী এবং দেওয়ালী প্রভৃতি হিন্দু আনুষ্ঠানিক আচরণের অনুসরণ করিয়া থাকে; বিবাহাদিতে পৌরোহিত্য করে ব্রাহ্মণগণ। ইহাদের সামাজিক আচার-নীতি স্পষ্টতঃ প্রায়ই হিন্দুগণের অনুরূপ, আর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধারণা জন্মে ইহারা মুসলমান। শঙ্কেশ্বর ও করবির মঠের ধর্ম্ম-গুরু শঙ্করাচার্য্য ইহাদিগকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে স্বীকার করেন না, অপর পক্ষে হিন্দু মহাসভা ইহাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভা সর্ব্বদাই হিন্দুত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমুৎসুক এবং হিন্দুর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মহাসভা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সভা বলিলেন—হিন্দু। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য্য হিন্দুগুরু এবং হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত দিতে সম্পূর্ণ অধিকারী -

* হাঁসুলি জাতীয় এক প্রকার অলঙ্কার। নীলগিরির টোডাদের সম্বন্ধে আলোচনা কালে আরনেষ্ট ক্রলি (Ernest Crawley) টালীর উল্লেখ করিয়াছেন—*The Mystic Rose*, 4th. ed. 1932, p. 402.

† In the Roman Catholic Church, the doctrine that the Virgin Mary was born without the strain of original sin. This doctrine came into favour in the 12th century; it afterwards became a subject of vehement controversy between the Scotists, who supported, and the Thomists, who opposed it. In 1708 Clement XI appointed a festival to be celebrated throughout the Church in honour of the immaculate conception, but the doctrine was not an article of faith until the year 1854."—The Compact Encyclopedia (The Gresham Publishing Co. Ltd.), Vol. II, page 160.

(৪) *Census of India*, 1931, vol. I (All India), Part I, p. 380

(৫) "They observe as their sacred book a collection of the precepts of Imam Shah, the Pir of Pirana."—*loc. cit.*

তিনি বলিলেন সেই দলকে অহিন্দু। এখন এই জটিলতার সমাধান করিবে কে? অপর এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান নাকি ইদানীং মাথিয়াগণকে মুসলিম সাধু বা পীরের আরাধনায় বিরত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন কি? সাধু লোকের সমাধিস্থানকে পবিত্র জ্ঞানে আরাধনা—মন্দিররূপে ব্যবহার করা হইতেই কি স্থির করা চলে—কে কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাসে বিশ্বাসী? সাধু ও সৎব্যক্তি সকলের অন্তরেই সমভাবে পবিত্র স্মৃতির উন্মেষ করিতে পারে—যে—যে ধর্ম্মকেই গ্রহণ ও স্বীকার করুক না কেন সাধু যেমন মুসলমানের কাছে সাধু, তেমনই হিন্দুও সাধুর আদর্শজীবনকে অস্বীকার করিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে দেখাও যায় একই পবিত্র স্থানকে বিভিন্ন ধর্ম্মের সকলেই পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া মস্তক অবনত করে। চট্টগ্রামের এক মুসলিম পীরের পবিত্র সমাধির প্রতি আরাকানের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া সেই পীরের সমাধিকে বুদ্ধ মকান (অর্থাৎ বুদ্ধ বা ভগবানের আবাস) বলিয়া অভিহিত করেন।

মাথিয়া কুম্বীদের ন্যায় জটিলতা মালওয়ার ন্যায়িতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্ম্মই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। ইহারা একাধারে গণেশের পূজা করে এবং আল্লাহর আরাধনা করে; হিন্দু নাম রাখে, হিন্দুর ন্যায় বেশভূষা করে, হিন্দু উৎসবগুলিতে যোগ দেয় এবং নিজেরাও হিন্দু উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই প্রকার মিশ্র আচরণ সিন্ধুদেশের কুবচণ্ড এবং হোসেনী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত রহিয়াছে। মাথিয়াদের ন্যায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহারা ইসলাম, অথচ সামাজিক আচার-নীতিতে ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের কেবল একটি দলের (Sayyids) সহিত একত্র ভোজনাদিতে ইহাদের আপত্তি নাই; এই সৈয়দী মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে গ্রহণ করে না। যুক্তপ্রদেশের মালকানগণ এবং জাঠ ও বেনিয়া হইতে উদ্ভূত অনুরূপ অপর একটি রাজপুত দলের মধ্যেও এই প্রকার দ্বৈত আচরণ লক্ষিত হয়; ইহারাও মাথিয়াদের মত হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ ক্রিয়া-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে। শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে মালকানদের অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের অনেকে আবার গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে মুসলমানরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগই হিন্দু ও ইসলাম এই দুই ধর্ম্মের মাঝামাঝি এক অপরূপ মত লইয়া রহিয়া গিয়াছে। মালকানদের এইরূপ বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার মূলে এক আশ্চর্য্যরকমের ইতিহাস রহিয়াছে। ডাঃ হাটন তাঁহার বিবৃতিতে এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"In 1926 when the *shuddhi* and *tanzim* movements were at their height these Malkans started taking money for conversion and it is said that many made considerable sums by conversion and reconversion to and from Hinduism, Islam and Christianity..." (৬)। উক্ত বিবরণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অর্থের লোভে ইহারা আজ এ ধর্ম্ম কাল সে ধর্ম্ম—এমনই করিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং এই আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ফলে ইহাদের কেহ কেহ হইয়া পড়িয়াছে উৎকট হিন্দু, কেহ রহিয়া গিয়াছে মুসলমান, আর এক দল কোন কিনারা করিতে না পারিয়া এ'র কিছু তা'র কিছু করিয়া মাঝামাঝি স্থলেই পড়িয়া রহিয়াছে।

বঙ্গ প্রদেশেও এই প্রকার দ্বৈধভাব অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগ-বেনিয়া বা সত্যধর্ম্ম দলের উৎপত্তি মনে হয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্য হইতে। যে ধর্ম্ম হইতেই যে আসিয়া এই দলে যোগ দিয়া থাকুক না কেন, যখন একই দল গড়িয়া উঠিল তখন আর সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে এবং না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যধর্ম্ম বা ভাগ-বেনিয়াদের নিজেদের সমাজে পরস্পরের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবাধ বিবাহাদি চলিতে পারে না (৭)। বাঙ্গালা দেশে বাখরগঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে আরও কয়েকটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-নীতির মধ্যে

(৬) *Census of India*, 1931, vol. I (All India), Part I, p. 381.

(৭) *Census of India*, 1931,—loc. cit.

যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রভাব আংশিকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাখরগঞ্জের নাগার্চ্চি, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলার কীর্ত্তনিয়া এবং পশ্চিম বঙ্গের পটুয়া বা চিত্রকর প্রভৃতি সম্প্রদায় উক্তপ্রকার বিভিন্ন দল গঠন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় এই বিভাগগুলি কেবল বর্ণগত, কৈন না ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইহাদের সকলেরই মাথিয়া কুম্বীগণের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমন্বয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূর অঞ্চলে এক ব্যক্তি চন্নবাসবেশ্বরের অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় দান করে এবং হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সখ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় এক নবতর আন্দোলন আরম্ভ করে। যদিও কয়েকজন দলভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এ আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিতে হইবে। পরন্তু এই আন্দোলনের ফলে মহীশূরের বীরশৈবদের মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং বিবাদের ফলে উক্ত অবতারের সকল প্রচেষ্টা লয় পাইয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশের চুহ্‌রাদের‡ মধ্যেও বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলের চুহ্‌রাগণ সাধারণতঃ হিন্দু আচার-নিষ্ঠার অনুসরণ করে এবং ইহাদের মধ্যে হিন্দু নাম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; অথচ পঞ্জাবেরই অপরাংশের চুহ্‌রাগণ মুসলমান নাম গ্রহণ করে এবং অনেক স্থলে মোল্লাদের পৌরহিত্য স্বীকার করে। চুহ্‌রাগণ অবশ্য সকলেই পঞ্জাবে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু দুই শ্রেণীর চুহ্‌রাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ এমন আর কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা হইতে তেমন কোন ধর্ম্ম-বৈষম্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অথচ চুহ্‌রাগণ কেহ কেহ নিজেকে হিন্দু বলে, আবার অনেকে নিজেদের ইসলাম বলিয়া প্রচার করে। ইহাই কেবল দ্রষ্টব্য নহে। চুহ্‌রাদের মধ্যে অপর একদল আছে যাহারা নিজেদের বলে—তাহারা আদ-ধর্ম্ম বা আদি-ধর্ম্ম বিশ্বাসী। ইহা দ্বারা প্রতীত হয় যে এই দলের বিশ্বাস ইহারা হিন্দু, কেবল অপরাপর বর্ণ-হিন্দু এবং নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবধান নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিজেদের আদ বা আদি নামে পরিচিত করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আদ-ধর্ম্মের দ্বারা কোন মূল ধর্ম্মের দাবী করে এমন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, কারণ ইসলাম বা খৃষ্টান হইতে পৃথক বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা ইহাদের বেশ অনুধাবন করিতে পারা যায়। যে সকল চুহ্‌রা আপনাদের ধর্ম্ম কেবল 'চুহ্‌রা' নামে অভিহিত করিয়াছে, গত আদমসুমারীতে দেখা যায় তাহাদিগকে হিন্দু দলভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব আলোচনা হইতে এইরূপ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। পঞ্জাবের চুহ্‌রাগণকে গুজরাটের অসভ্য জাতি ছোত্র হইতে উৎসারিত এক পতিত শাখা বলিয়া উক্ত আদমসুমারীর বিবরণীতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে; অবশ্য ইহার সত্যাসত্য প্রমাণসাপেক্ষ।

"সাধারণ কথায় বলিতে গেলে এমন কোন অনতিক্রম্য হেতু দৃষ্টিগোচর হয় না যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে হিন্দু ও মুসলমানগণের পক্ষে সখ্য বন্ধনে পাশাপাশি বাস করা সম্ভবপর নহে"—এই প্রকার অভিমত ডাঃ হাটন তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার মতের যথার্থতা তিনি বহুলাংশে প্রমাণ করিতে সমর্থও হইয়াছেন (৮)। মাদুরা ও তাঞ্জোরে বহু হিন্দু দেবমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বংশানুক্রমে মুসলমানের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে, মুসলমানগণ অনেক সময়ই শীতলা (হিন্দু দেবতা) পূজা করে দেখা যায়; কালীর নিকট বলির মানতও কখনও কখনও করিতে দেখা যায়। আবার হিন্দুও পীরের দরগায় সিন্নি দিবার সঙ্কল্প করে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কাজেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্য দুই ধর্ম্মাবলম্বীর ঐক্য বন্ধনের পক্ষে যে তেমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে এমন মনে হয় না। অতুল চক্রবর্ত্তীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার অভিমত জয়াকর, মুঞ্জে প্রভৃতি নেতাগণও সমর্থন করেন

‡ লুধিয়ানা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ দৌলা (অধুনা ডাঃ) যখন তাঁহার প্রবন্ধ প্রস্তুত উপলক্ষে ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের তত্ত্বাবধানে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে এই চুহ্‌রাদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু পরিসর সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহার চূড়ান্ত আলোচনা এস্থলে করা গেল না। অধ্যাপক দৌলার এই সহায়তার নিমিত্ত আমি কৃতজ্ঞ।

(৮) *Census of India*, 1931.—*loc. cit.*

(১)। প্রকৃত বৈষম্য সম্ভবতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গঠনাবলীর গর্ব্ব লইয়া। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল রাজ্য বিস্তার করিতে এবং হিন্দুর উপরে প্রাধান্য করাই ছিল তখন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। তারপর অবশ্য কাল-পরিবর্ত্তনে এবং অবস্থার বিবর্ত্তনে পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিকতা ও সৌহার্দ্দ্য ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সভ্যতার আদর্শ ও কৃষ্টি ছিল ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সভ্যতা-স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য বর্ত্তমানেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাই ডাঃ হাটনের মত সমর্থন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা ভিত্তিহীন সংঘর্ষ অস্পষ্টভাবে মূর্ত্তি পাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের রেশারেশি অপেক্ষা প্রবলতর হইল মুসলমানগণের অমূলক সন্দেহ, প্রাধান্য করিবার তীব্র বাসনা এবং বিস্মৃতপ্রায় কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের তথা স্বাতন্ত্র্যরক্ষণের প্রচেষ্টা। অতুল বাবু যে বলিয়াছেন বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষের হেতু বেশীই মানসিক, ধর্ম্ম-বৈষম্য নহে—এ কথা অংশতঃ সত্য (১০)। *

(৯) A. C. Chakraverty—*Cultural Fellowship in India*, (Thacker Spink), 1934.

(১০) A. C. Chakraverty—*op. cit.*

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত তথ্যসমূহ প্রধানতঃ আদমসুমারীর বিবরণী হইতে সংগৃহীত এবং ডাঃ হাটনের (সেন্সস কমিশনার) অনুমতি অনুসারে তাঁহার বিবৃতির অনেকাংশ সোজাসুজি অনুবাদ করা হইয়াছে।

অষ্ট-প্রহর

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

(১)

কলিকাতায় শীতের সকাল। সাতটা বাজিতে বেশী দেরী নাই। ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে শ্যামবাজার—পথটুকু ত আর কম নয়, বেলা দশটার মধ্যে 'টিউশনি'টা সারিয়া একমুঠা ভাত খাইয়া নিত্যকার মত কাজের সন্ধানে আফিসে আফিসে ঘুরিতে হইবে, তাই একটু দ্রুতপদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলাম। গোলদীঘির কাছে আসিয়া দেখিলাম—এত সকালেও একটা লোক—বিচিত্র-বেশে মাথায় একটা ত্রিকোণ টুপি পরিয়া একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম লইয়া গান গাহিতে গাহিতে লোক জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ডেড্-লেটার আফিস ফেরৎ চিঠির মত তাহার পোষাক কি একটা ওষুধের নাম ও গুণ-গাথায় পূর্ণ। ওই ওষুধটির অব্যর্থতা বিষয়ক কথা লইয়া গানটিও রচিত হইয়াছে। লোকটিকে অতি পরিচিত বলিয়া মনে হইল—কিন্তু কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি তাহা মনে পড়িল না। তখন স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া লোকটিকে কোথায় দেখিয়াছি তাহা সন্ধান করিবার সময় ছিল না—তাই সে চিন্তা দূরে সরাইয়া নিজ গমন পথের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইতেই মনে পড়িয়া গেল—শৈশবে যখন মামার বাড়ী যাইতাম তখন লোকটিকে দেখিয়াছি। লোকটির নাম শ্রীনাথ বৈরাগী—গান বাজনায় সে যে বেশ সুদক্ষ ছিল এবং শৈশবে যে সে আমাকে খুব ভালবাসিত একথাও মনে আসিল। গ্রামের জমীদারবাবু বেতন দিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন শুধু তাহার গান শুনিবার জন্য। শুধু শ্রীনাথ কেন ও অঞ্চলের বহু গায়ক, কীর্ত্তনীয়া, কবি-ওয়ালা ও কথকের তিনি পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। শ্রীনাথ কিসের মায়ায় সে সুখের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মহানগরীর কদর্য্য জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। ইতিমধ্যে ছাত্রটির বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়া শ্রীনাথের চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য মন হইতে অপসারিত করিলাম। যথারীতি নিজের কার্য্যশেষে ফিরিবার পথে দেখিলাম—শ্রীনাথ তখনও ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। এবার বোধ হয় সে আমাকে চিনিতে পারিল। মনে মনে

একটু বিব্রত বোধ করিলাম, পনের টাকার একটা 'টিউশনি'ই সম্বল হইলে কি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আমি, পথে এত লোকের মাঝখানে বহুরূপী-বেশধারী সামান্য একটা ক্যানভাসারের সাথে আলাপ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচবোধ হইল। ভাবিলাম জনতার মধ্যে আত্মগোপন করি, কিন্তু তাহা পারিলাম না। বাল্যে তাহার বহু গান শুনিয়াছি—আমাকে সে যে বেশ ভালবাসিত তাহাও মনে পড়িল, তা ছাড়া প্রবাসে পরিচিত লোককে পাশ কাটাইয়া যাওয়াটা অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে করিলাম। তাই তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি শ্রীনাথ, আমাকে চিনতে পার?" শ্রীনাথ কলিকাতায় একটি চেনা-মুখ দেখিয়া যে অত্যন্ত খুসী হইয়াছে তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। সে হাসিয়া কহিল "দাদাবাবু, ভাল আছেন ত? চিন্‌তে পেরেছেন আমাকে? আপনি যে এখানে আছেন তা ত' আমি জানতাম না—ওঃ কত ছোট যে আপনাকে দেখেছি, আপনি এত বড় হয়েছেন।" কথা শেষ করিয়াই সে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল—কেহ আমাদের আলাপ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। তাহার মনের ভাব আমি বুঝিলাম, সে যে এখন হীনাবস্থার লোক, আমার মত একজন ভদ্রযুবকের সহিত তাহার আলাপে আমার যে মানের ক্ষতি হইতে পারে—এ সম্বন্ধে সে যেন বেশ সচেতন বলিয়া মনে হইল। "এখন থাক্ দাদাবাবু, আপনার সাথে আমি পরে আলাপ করব, আপনার ঠিকানাটা আমায় বলুন"—শ্রীনাথের এই কথা শুনিয়া তাহাকে আমার ঠিকানাটা দিয়া তিনটার সময় আমার মেসে দেখা করিতে বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলাম। তখন আমার অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম—শ্রীনাথ পুনরায় তাহার গান আরম্ভ করিয়াছে।

(২)

তিনটার সময় আফিসে আফিসে কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া মেসে ফিরিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি—এমন সময় শ্রীনাথ আসিল।

এখন আর তাহার সে বেশ নাই—একটা হাত কাটা সার্টও একটা আধ ময়লা কাপড় পরিয়া খালি পায়েই সে আসিয়াছে। শ্রীনাথ প্রণাম করিয়া মেঝের উপরেই বসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কখন কল্‌কাতায় এলে শ্রীনাথ, তোমার বাবু বেঁচে আছেন ত?'

শ্রীনাথের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, সে বলিল—"বাবু আজ একবছর হ'ল স্বর্গে গেছেন দাদাবাবু. তিনি বেঁচে থাক্‌লে কি আজ আমার এমনি ক'রে খেতে হয়? তিনি মারা গেলেন, ক'মাস যেতে না যেতেই তাঁর ছেলেরা বল্লেন—'তোমার আর এখানে থাক্‌বার দরকার নাই শ্রীনাথ, বাজে খরচ আর আমরা কর্‌ব না'।"

শ্রীনাথের জন্য আমারও বড় দুঃখ হইল, বলিলাম—"তুমি ত আর বসে খেতে না শ্রীনাথ, তুমি গান গেয়ে খেতে, নতুন বাবুরা গান ভালবাসেন না বুঝি?"

সমবেদনার আভাস পাইয়া শ্রীনাথ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল—"আমাদের গান আর কে শুন্‌বে দাদাবাবু, আমাদের গান কি আর ওঁদের পছন্দ হয়! বাবু মারা যেতেই তাঁরা বাড়ীতে কলের গান আনালেন, বেতারের যন্ত্র আনালেন—তাই ওঁরা শোনেন। এখন আর পূজায় যাত্রা হয় না, কীর্ত্তনের দল এসে ফিরে যায়, সারা বছর ধরে চণ্ডীমণ্ডপখানা খাঁ-খাঁ করে। বাড়ী-ঘর ত কোন দিন ছিল না, আমার তাই তাঁরা জবাব দিতেই অকূলে পড়্‌লাম। সবাই বল্লে—তুমি গুণী লোক, কল্‌কেতায় চলে যাও তোমার কাজ হবে। হাতে যা টাকা পয়সা ছিল খরচ করে এখানে এলাম। কারও সঙ্গে জানাশুনা নেই, কত ঘুরি কোথাও আর কাজ হয় না। শেষে গান গাইতে পারি জেনে এই ওষুধের দোকানের বাবুরা আমাকে পাঁচ টাকা মাইনেয় এই কাজটা দিলে। দুবেলা আধ-পেটা হোটেলে খাই, আর একটা গুদাম ঘরে শুয়ে থাকি—মাসে আট আনা ভাড়া লাগে। অমনি করে গান গেয়ে ওষুধ বিক্রী করে আমাকে যে খেতে হবে এ কোন দিন আমি ভাবি নি। গুরুর কাছে যত্ন করে গান শুনেছিলাম—সেটা যে এই কাজে লাগবে তা কে জান্‌ত দাদাবাবু। কত যে লজ্জা পাই মনে তা আর কি করে বল্‌ব। তাও কল্‌কেতায় দেশের একজন লোক দেখে মনটা ঠাণ্ডা হল।" তাহার কথার শেষের দিকটা কান্নার মত শোনাইল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম—"দুঃখ কর না শ্রীনাথ, আমি তোমাকে একটা ভাল

কাজ করে দেব।" এ আশ্বাস যে কত মূল্যহীন অন্তর্য্যামী ছাড়া বোধ করি কেহ বুঝিলেন না। শ্রীনাথ কিছুক্ষণ বসিয়া উঠিতে চাহিল। 'মধ্যে মধ্যে এস শ্রীনাথ' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। তখন সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব নাই, আমিও সার্টটা গায়ে দিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলাম।

(৩)

রাত্রি ন'টার সময় মেসে ফিরিয়া দেখি—আমার ঘর খোলা, অথচ ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি 'রুম-মেট্' হীরেনবাবু বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছেন। কোন এক বড় মার্চ্চেণ্ট আফিসে তিনি চাকরী করেন। সকালবেলা দিব্য হাসতে হাসিতে আফিস গেলেন—ইতিমধ্যেই এমন একটা কি বিপর্য্যয় আসিয়া তাঁহার সেই প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়া দিল যাহার জন্য তিনি ঘরে আলো পর্য্যন্ত জ্বালেন নাই—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। আলোটা জ্বালিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দাদা, শুয়ে যে, শরীর খারাপ আছে নাকি?" তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানাইলেন—"না।" সহসা একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছা জন্মিল—বলিলাম—"তবে আর অমন করে শুয়ে আছেন কেন? বৌদির চিঠি পান নি বুঝি কয়েকদিন।" হীরেনবাবু ছিলা—ছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া আমায় গালি দিতে আরম্ভ করিলেন—"এঁচোড়পাকা ছোঁড়া কোথাকার, ইয়ারকির আর জায়গা পাও নি?" ইত্যাদি। সামান্য রসিকতার ফলে যে তাঁহার এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। বৎসরাধিক হইল একঘরে বাস করিতেছি কখনও তিনি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন নাই—ঠিক ভায়ের মত স্নেহই তাঁহার নিকট পাইয়া থাকি। এই রূপান্তরে বিস্মিত হইয়া অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, হীরেনবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠাইতে সাহস না পাইয়া কিছুক্ষণ পরে নীচে খাইতে গেলাম। খাওয়া শেষ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই হীরেনবাবু বিছানা হইতে উঠিলেন, তারপর আমার দিকে করুণভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কিছু মনে ক'র না ভাই, আজ মনটা বড় খারাপ আছে। আফিস থেকে আমাদের ১০।১২ জনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। মেসিনের কথা ত তোমায় আগেই বলেছি, এক্সপেরিমেণ্টে দেখা গিয়েছে মেসিনেই ওদের কাজের সুবিধা হবে—তাই ওই দিয়েই, লোক কমিয়ে, ওরা কাজ চালাবে ঠিক করেছে।" আমি চমকাইয়া উঠিলাম—এই বয়সে তাঁহার চাকরী যাওয়া—আর অনশনে দিনযাপন একই কথা। মেসিনের প্রবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহাদের চাকরী যাওয়ার আশঙ্কা আছে—একথা তাঁহার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি—কিন্তু সে আশঙ্কা যে এত দ্রুত সত্যে পরিণত হইবে ইহা আশা করি নাই। কোন এক সাহেব কোম্পানী কতকগুলি হিসাবের মেসিন আবিষ্কার করিয়াছে। যে হিসাবের জন্য দশ জন লোকের দরকার মেসিনের সাহায্যে সেই কাজ দুই জন লোকের দ্বারা করা চলে। হীরেনবাবুদের কোম্পানী এতদিন 'এক্সপেরিমেণ্ট' করিতেছিলেন যে যথার্থ-ই কাজের সুবিধা হইবে কিনা। 'এক্সপেরিমেণ্টে' কোম্পানী ভাল ফল পাইয়াছেন—তাই দুর্ভাগ্য কেরাণীদের কর্ম্মচ্যুতির আয়োজন করা হইয়াছে। হীরেনবাবু নীচে খাইতে চলিয়া গেলেন। শ্রীনাথের কাহিনী শুনিয়া মনটা ভাল ছিল না, হীরেনবাবুর কর্ম্মচ্যুতির কথা শুনিয়া আরও বিষণ্ন হইয়া পড়িলাম। অবসন্নচিত্তে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

(৪)

কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইল যেন সকাল হইয়াছে, শ্যামবাজারে ছাত্রটিকে ডাকিয়া পড়াইতে বসাইতেছি এমন সময় ছাত্রটি বলিল—"মাষ্টার মশায়, বাবা বলে দিয়েছেন—আপনাকে কাল থেকে আসতে হবে না। তিনি একটা যন্ত্র কিনেছেন, একটা কাগজে যে কোন প্রশ্ন—তা হার্‌ডার ফ্যাক্টরই বলুন—আর ইণ্টারেষ্ট কিম্বা জিওম্যাট্রি রিডাক্‌সনই বলুন—লিখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে একটা হাতল ঘুরিয়ে দিলেই সেটা থেকে প্রশ্নগুলা চমৎকারভাবে বোঝান একটা কাগজ বেরিয়ে আস্‌বে। এতে খরচও কম হবে, আর সময়ও বাঁচবে।" অপরিসীম বেদনায় ও হতাশায় মন ভরিয়া গেল। আজ এক বৎসর একটা মাত্র 'টিউশনি'র উপর নির্ভর করিয়া দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আছি সেটাও বুঝি বিধাতার সহ্য হইল না!

বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। পথে নামিতেই শুনিলাম কি একটা শব্দ! চোখ মেলিয়া দেখি—বিছানায় ঘুমাইতেছি, নীচে হইতে কলের জলপড়ার শব্দ হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমার স্বপ্ন সত্য হইবার সম্ভাবনা হয়ত আছে—কিন্তু আপাততঃ ত' কাজটা হাতে আছে। আঃ—বাঁচিলাম।

মাংসাশী উদ্ভিদ

শ্রী নরেন্দ্র দেব

জীবজগতে এমন বিভিন্ন প্রাণী বহু আছে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণীদের হত্যা ক'রে খায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমরা জানি। কারণ, আমরা তাদেরই স্বজাতি। কিন্তু, উদ্ভিদ্ জগতে এমন কোন তরু তৃণের পরিচয় আমরা আজও পর্য্যন্ত পাই নি যারা অন্য কোন উদ্ভিদ্‌কে ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে! অথচ, জীবহিংসার দ্বারা জীবন ধারণ করে—জগতে এমন একাধিক উদ্ভিদের সন্ধান মিলেছে!

জঙ্গমলোকের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে আলো-বাতাস ও জল। গাছের পাতা, সূর্য্যকিরণ হ'তে আলোকরশ্মি টেনে নিতে পারে; বাতাস থেকে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস অর্থাৎ অঙ্গারাম্ল বাষ্প—যা মানুষের পক্ষে দূষিত ও একান্ত অনিষ্টকর বলেই গণ্য, তা সর্ব্বদাই আকর্ষণ ক'রে নেয়! প্রতি পল্লবের প্রাণধারণের প্রচেষ্টায় সেই আহৃত আলোকরশ্মি ব্যয়িত হয় বিবিধ অর্গ্যানিক বস্তু বা জৈব উপাদান প্রসবে। কার্ব্বণ রূপান্তরিত হয় চিনি, ষ্টার্চ্চ্ (খাদ্যের শ্বেতসার) ও অনুরূপ পুষ্টিকর উপাদানে—যা' প্রধানতঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপোষণে সহায়তা করে।

এইভাবে জড়বস্তুকে প্রাণবন্ত ক'রে, নির্জ্জীব পদার্থে জীবনীশক্তি সঞ্চার ক'রে—উদ্ভিদ্ প্রতিদিন কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাস ও জল বা মৃত্তিকার রস শোষণান্তে তা থেকে নিজের প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্য নিজেই তৈরি করে নেয়। কিন্তু, ঠিক কি ভাবে যে এই রূপান্তর ঘটে সে তথ্য আজও বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক বিস্ময়কর রহস্য হ'য়ে আছে। ব্যাপারটা তাঁরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও একটা বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হ'য়েছেন এই যে—সবুজ পাতার সবুজ রংটা ফুটে ওঠে, প্রত্যেক পাতাটি যে অসংখ্য সবুজ রংয়ের কণিকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (granules) সমাকীর্ণ থাকার ফলে—সেই সবুজ কণিকাগুলিই এই রূপান্তর ঘটান ব্যাপারে নিঃসন্দেহ একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে—জলবাতাস আর আলো পেলেই উদ্ভিদ্ তার সাহায্যে তেজ-বীর্য্যদায়ক ও পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে নিতে পারে। প্রাণীজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগতের এইখানেই মস্ত প্রভেদ। এমন কোন জীব নেই যে উদ্ভিদের মত আশ্চর্য্য উপায়ে আপন খাদ্য আপনি সৃষ্টি করে নিতে পারে! প্রত্যেক জীবের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, তার গতির প্রতি ভঙ্গীটি বরং সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই উদ্ভিদের উচ্ছিষ্ট জৈব পদার্থের উপরই। এদের পাতায়, এদের ডালপালায়, এদের ফুলেফলে যে প্রাণদায়ক ও শক্তিসঞ্চারক উপাদান সংগৃহীত থাকে তারই জোরে শুধু যে তারা প্রাণে বেঁচে থাকে ও পুষ্টিলাভ করে তাই নয়—উঠে হেঁটে ছুটে বেড়াতে পারে এবং—শিং নেড়ে ও লেজ তুলে নাচতে পারে!

মোটের উপর এটুকু বেশ সুস্পষ্ট জানা গেছে যে উদ্ভিদই প্রাণধারণের উপযোগী আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করে, যার সাহায্যে সে নিজে অথবা প্রাণীজগতের জীবেরা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে—উদ্ভিদ তার নিজের প্রাণ না দিয়ে প্রাণীজগতের প্রাণ রক্ষা ক'রতে পারে না! জীবলোক তা'কে ধ্বংস ক'রে তবেই আত্মসাৎ করতে পারে।

উদ্ভিদ যদিও নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত ক'রে নেবার শক্তি রাখে, কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থাতে তাকে পড়তে হয়, যখন প্রচুর আলো বাতাস ও জল পাওয়া সত্ত্বেও সে সুস্থ ও সজীব থাকতে পারে না। কারণ, সেখানকার জলের মধ্যে হয়ত যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রেট্ বা তাম্র-দ্রাবক এবং লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ও অজৈব উপাদানের অভাব, যার জন্য সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত ক'রে নিতে বাধা পায়। এ অবস্থায় যে উদ্ভিদকে বাড়তে হয় ও বেঁচে থাকতে হয়, তার সঙ্গে আমাদের অভাবগ্রস্ত সংসারের কর্ত্রীদের তুলনা করা যেতে পারে। যাঁরা অন্নাভাবে দিনের পর দিন মুড়ি খেয়ে বা অন্য কিছু পুষ্টিহীন খাদ্য গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেন। তাঁদের শরীর যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হ'য়ে আসে, উদ্ভিদের অবস্থায়ও দাঁড়ায় অবিকল তাই! সে তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ ক'রতে না পারার ফলে ক্রমেই তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য

সৌন্দর্য্য ও তেজ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সেই দরিদ্র গৃহিণীদের মতই শুকিয়ে পাকিয়ে অকালে মারা যায়। সুতরাং এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র জল, হাওয়া ও আলো পেলেই হবে না, সেগুলি সগুণও হওয়া চাই!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত্ত মানুষও যেমন প্রাণে বাঁচবার জন্য নির্ব্বিচারে অখাদ্যও উদরস্থ ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না, তেমনি উদ্ভিদও যেখানে জল হাওয়ার মধ্যে—বেঁচে থাকবার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানের একান্ত অভাব বোধ করে, সেখানে সে

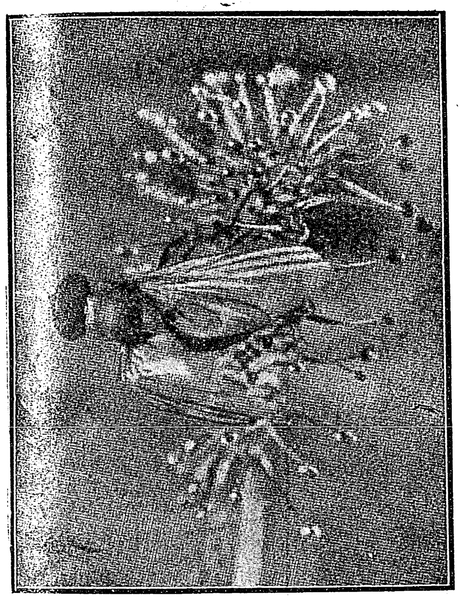

নীহার-ভানুর শীষ (Sun-dew)। (মাছি ধরেছে। মাছিটির একেবারে নড়ন-চড়ন রহিত)

আমিষাশী হ'য়ে ওঠে! তার স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক উপায়েই আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রেই অনন্যোপায় হ'য়ে তারা কীটপতঙ্গ ধ'রে খায়! সেখানে নির্গুণ মৃত্তিকার বক্ষ-ধারায় যে পুষ্টিকর ও প্রাণধারণোপযোগী ভোজ্যরসের অভাব ঘটে, সেটা তারা পূরণ ক'রে নেয় ঐ কীটপতঙ্গের অঙ্গ হ'তে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে!

জঙ্গম লোকের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁরা হয়ত' —গাছপালারা পোকামাকড় ধ'রে খাচ্ছে—এরূপ ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করা দূরে থাক্, কল্পনাই করতে পারবেন না! কিন্তু ব্যাপারটা যে কতখানি সত্য তা' অনায়াসেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, যদি কোন খানা-খন্দল, মেঠো জলা বা পচা ডোবার ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। কারণ এই সব হাজামজা অঞ্চলেই প্রাণীভুক্ উদ্ভিদের বসবাস খুব বেশী চ'খে পড়ে। দিবারাত্র পাঁকের নোংরা জলে সেখানকার জমি ভিজে স্যাঁৎসেঁতে থাকার ফলে কোন প্রাণী তো সেখানে বাস করতে পারেই না, কোন ভাল গাছপালাও জন্মায় না। ঘন শ্যাওলায়

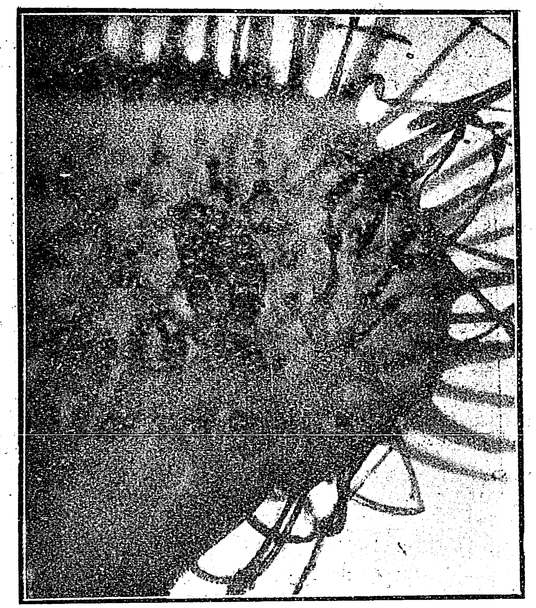

নীহার-ভানুর শিকার—(অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় কি ভাবে নীহার-ভানুর পত্রস্থ দীর্ঘ রোঁয়াগুলি একটি পিপীলিকা আসবামাত্র বেঁকে তার উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আঁকড়ে ধরে বিষাক্ত লালা বর্ষণ করছে!)

সেখানটা ঢাকা থাকে বলে অক্সিজেন্ বা অম্লজান বাষ্প সেখানে প্রবেশ ক'রতে পারে না। নানারকম দুষ্পাচ্য অম্ল (antiseptic acids) জমে ওঠে! বিশেষতঃ নাইট্রোজেন্ বা যবক্ষারজান এবং উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন খনিজ পদার্থের অস্তিত্বও থাকে না।

অথচ এ অবস্থাতেও দেখা যায় যে কোন কোন গাছ সেখানে বেশ সতেজেই বেড়ে উঠছে, যেন তার পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই! এর কারণ অনুসন্ধান ক'রলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ঐ সব গাছের ডাল ও পাতা রসকোষযুক্ত চুলের মত সরু সরু সূক্ষ্ম কাঁটা বা রোঁয়ায় পরিপূর্ণ। ঐ সরু কাঁটার মত চুলের মুখে হঠাৎ আঘাত লাগলেই আঠা নিঃসৃত হয়! যদি কোন কীট পতঙ্গ ঐ গাছের ডালে বা পাতায় গিয়ে বসে, তাহ'লে তাদের শরীরের সামান্য আঘাতেই সেই সূক্ষ্ম চুলের মত রোঁয়া বা কাঁটাগুলির রসকোষ থেকে তৎক্ষণাৎ আঠার ন্যায় লালা নিঃসৃত হ'য়ে উক্ত কীট বা পতঙ্গকে লেপ্‌টে ধরে। তারা সেখানেই জব্দ হ'য়ে আট্‌কে থাকে

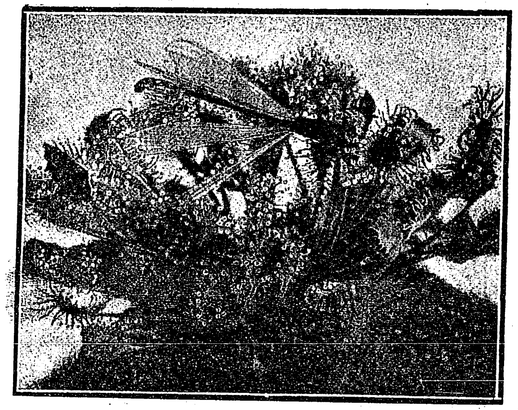

নীহার-ভানুর আকৃতি—(একটি 'নীহার-ভানু' লতার সম্পূর্ণ আকৃতি। এর কবলে একটি মস্ত ফড়িং এসে পড়েছে)

ও অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। তাদের গলিত মৃতদেহ থেকে সেই লোমশ তরু-তৃণ তখন নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে নেয়। সেখানকার অসুস্থ মৃত্তিকার রসে তারা যা ভোজ্যবস্তুর সন্ধান পায় না, এই সব মৃত জীবের গলিত শরীর থেকে তারা সেই সকল খাদ্যসার সংগ্রহ ক'রে সতেজে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইভাবে জীবনধারণে দীর্ঘকাল ধ'রে অভ্যস্থ হওয়ার ফলে ক্রমে সেইটাই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ও তদনুসারে তাদের আকৃতিরও অনুরূপ জীবনযাপনের উপযোগী ও অনুকূল পরিবর্ত্তন, বহু জন্মান্তরের ক্রমবিবর্ত্তনে সংঘটিত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত চার্লস্ ডার্‌উইন্ এই সকল প্রাণীভুক্ উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান ক'রে অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সব আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তিনি বলেন—উদ্ভিদের মধ্যেও রীতিমত রক্তপিপাসু মাংসলোভী হিংস্র গাছপালা আছে। লোল জিহ্বার মত তারা তাদের

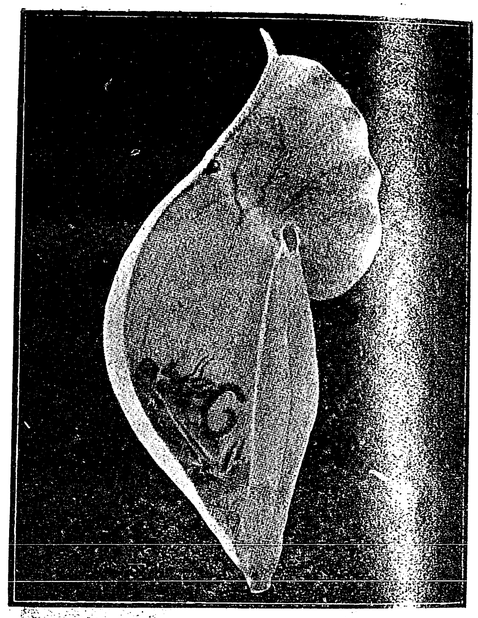

তূর্য্যলতা (Trumpets)—(আমেরিকায় এর জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মায়। পাতার শেষের দিকটি তোড়ার মত মোড়া, তার মধ্যে মৃত কীটপতঙ্গ স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে)

দীর্ঘ সূক্ষ্ম শুঁড় বিস্তার ক'রে প্রাণী শিকারের জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে। কেউ রঙীণ সুন্দর ফুলের লোভ দেখিয়ে—কেউ বাহারী পাতার নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়ে—কেউ বা মায়া মরীচিকার মত মিথ্যা-মধুর চার দিয়ে নানা নির্বোধ জীবকে নিজেদের খর্পরের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে হত্যা করে। তাদের লেলিহান রসনার বিষাক্ত লালায় কীটপতঙ্গেরা আবদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দেয়। ডার্‌উইনের মতে জীবের সংস্পর্শ ঘটবামাত্র ঐ সকল উদ্ভিদের ডালপালা ও পাতা মুয়ে

পড়ে ও গুটিয়ে আসে। এমন কি অনেক সময় দেখা যায়, প্রত্যেক পাতাটি যেন একেবারে সর্ব্বাঙ্গ দুমড়ে একটি ঠোঙা বা আঁজ্‌লা হ'য়ে উঠেছে! সূক্ষ্ম শুঁড়গুলি নিম্নাভিমুখী হ'য়ে তাদের শীর্ষদেশস্থ রসকোষ হ'তে আবদ্ধ-জীবের অঙ্গে

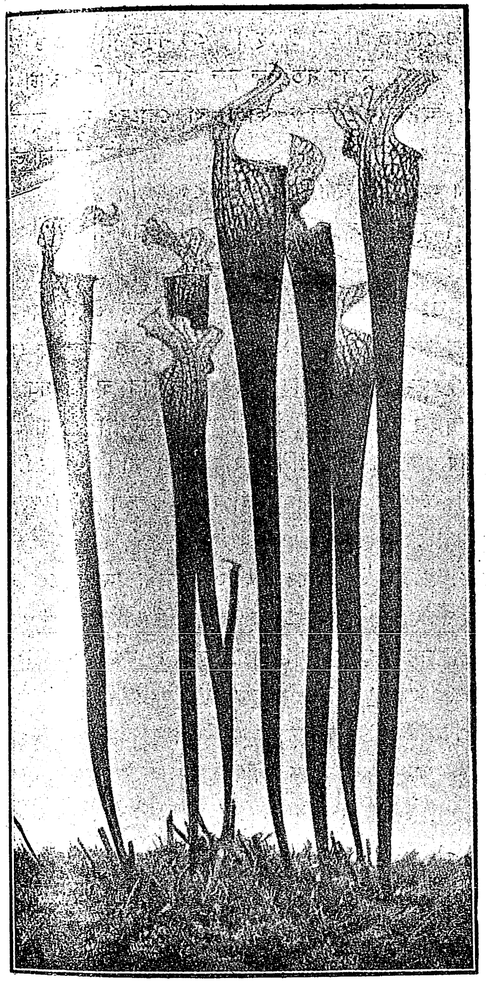

কলস লতা বা ভৃঙ্গার লতা (Pitcher plant)—(এর এই সরু লম্বা চোঙের গর্ভে অসংখ্য প্রাণী তাদের অন্তিম-শয্যা গ্রহণ করে)

তরল আঠা বা লালা বর্ষণ করতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে একেবারে সেই পাতার ঠোঙার গর্ত্তে এনে ফেলে! সেখান থেকে আর সে হতভাগ্য জীবের পরিত্রাণ পাবার কোন উপায়ই থাকে না! কারণ সে পালাবার জন্য যতই

মাখন লতা (Butterwort)—(শিকার এসে পড়লে এদের পাতার অসংখ্য রস-কোষ হ'তে বিষাক্ত লালা নির্গত হ'তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার কিনারা গুটিয়ে আসতে থাকে)

ছট্‌ফট্ করে ততই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের ফলে আঘাত লেগে গাছের পাতার সমস্ত লোমগুলি বা ফুলের সমস্ত

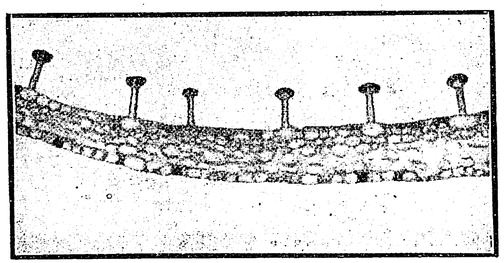

মাখন লতার অজস্র রস-কোষ—(মাখন লতার পুরু মোটা পাতার একটুকরা চিল্‌তে কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে লক্ষ্য হয়—কত অসংখ্য রস-কোষে প্রত্যেক পাতাটি আচ্ছন্ন!)

শুঁড়গুলি অধিকতর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, দ্বিগুণ বেগে লালা বর্ষণ করতে সুরু করে।

ডার্‌উইন্ বলেন—শুঁড়গুলি নিম্নাভিমুখী হ'য়ে যখন লালা বর্ষণ ক'রে তখন তা' এমন একটা অম্ল আরকে রূপান্তরিত হ'য়ে নিঃসৃত হয়, যা আমাদের পাকস্থলী নিঃসৃত রসধারার ন্যায় পাচকগুণসম্পন্ন। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে একেবারে কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন যে উক্ত পাচকগুণসম্পন্ন অম্ল আরক জাতীয় রস সংযোগে প্রাণীভূক্ উদ্ভিদেরা তাদের খাদ্য রীতিমত পরিপাক করে নিয়ে তার সার আকর্ষণে প্রাণধারণ করে। অসার পদার্থ বাইরে পড়ে থাকে! ডার্‌উইনের এই আবিষ্কার উদ্ভিদ্ জগতে এক নূতন আলোকপাত করেছিল। উদ্ভিদও যে হিংস্র ও মাংসাশী

রতি-ফাঁদ (Venus Fly-trap)—(এর প্রত্যেক পাতাটি দু'খানি ডালার মত দু'ভাগ করা। শিকার এসে ফাঁদে পড়লেই ঝপ্ করে ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে প্রাণীটিকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলে!)

হ'তে পারে এ তথ্য আগে কারও জানা ছিল না এবং তারা যে সকল পোকামাকড় খায়, তা' যে আবার জীবজন্তুদের মতই যথানিয়মে তারা হজম ক'রে নিয়ে তার সারাংশে নিজের পুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি করে—এ সংবাদও তখন পর্য্যন্ত য়ুরোপে অবিদিত ছিল।

বিলাতে অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে হাজা-পচা জলা জমীতে 'নীহার-ভানু' নামে (Sun-Dews) এক রকম জংলী চারা জন্মায়। সাধারণতঃ এর পাতা গোলাকার, তবে আরও দু' একরকম—যেমন বাদামী লম্বাটে পাতা—আর এক খুব বড় বড় পাতাওয়ালা 'সান্-ডিউ' গাছও দেখতে পাওয়া গেছে। এর সবুজ পাতা ও ডাঁটার গায়ে অসংখ্য চুলের মত সরু সরু রক্তবর্ণের দীর্ঘ কাঁটা বা লোম আছে, প্রত্যেক কাঁটা বা লোমের মুখে ক্ষুদ্রতম জলকণার মত এক একটি রসে টস্‌টসে আঠা বা লালা ভরা কোষ আছে। সূর্য্যকিরণে এই কোষগুলি নীহার কণার মত ঝিক্‌মিক্ করে, তাই কবিরা এর নাম রেখেছেন 'Sun-Dew' অর্থাৎ 'নীহার-ভানু'!

উত্তর আমেরিকায় একপ্রকার প্রাণীভূক্ উদ্ভিদ্ দেখতে পাওয়া যায়, তার পাতাগুলি সূতার মত সরু সরু এবং এক ফুট দেড় ফুট লম্বা! এই সূত্রাকার সূক্ষ্ম পত্রপুঞ্জ এত অজস্র জন্মায় যে সেগুলি পরস্পর জোটপাকিয়ে মাটিতে লুটোয়, কারণ গাছগুলি লম্বায় বাড়ে না। এরাও ঠিক 'নীহার-ভানু'র মতই নিষ্ঠুরভাবে প্রাণীহত্যা ক'রে তবেই জীবনধারণে সমর্থ হয়।

পাহাড়ের উপর যে সব জলা জমী আছে সেখানে এক রকম প্রাণীভূক্ উদ্ভিদ্ জন্মায় তাদের চেহারা এক একটা বড় বড় কাঁঠালিচাঁপা ফুলের মত! এর নাম 'Butterwort' অর্থাৎ 'মাখনলতা'! মাখনলতার পাতার উপরদিকটি দু'রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মত কোষে আচ্ছন্ন থাকে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন সাদা চোখে তা' দেখা যায় না। একরকম কোষ যারা সংখ্যায় বেশী তারা পাতার গায়ে মিশিয়ে থাকে এবং আর একরকম কোষ যারা সংখ্যায় অল্প তারা পাতার উপর ঘাড় তুলে মাথা উঁচু ক'রে খাড়া হ'য়ে থাকে! এই দু'রকম কোষ থেকেই বিষাক্ত লালা নির্গত হয় এবং ঠিক 'নীহার-ভানু'র আঠার মতই নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান সংযুক্ত কোন পদার্থের সংস্পর্শ ঘটলে অম্ল-আরকে রূপান্তরিত হয়। কারণ এখানেও ধৃত কীটপতঙ্গের অঙ্গজাত খাদ্য মাখনলতা উক্ত অম্ল-আরকের সাহায্যেই পরিপাক ক'রে নিতে সমর্থ হয়। মাখনলতার পাতার কাণা বা ধারি একটু ভিতরদিকে গুটিয়ে থাকে। ধৃত কীটপতঙ্গ এই প্রাচীর অতিক্রম করে

পালাতে পারে না, কারণ এদিকে এলেই অসংখ্য কোষ তার আগমনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে যে লালাস্রাব বর্ষণ করে তার বেগে সে জড়িয়ে গড়িয়ে পাতার গর্ভে গিয়ে পড়ে!

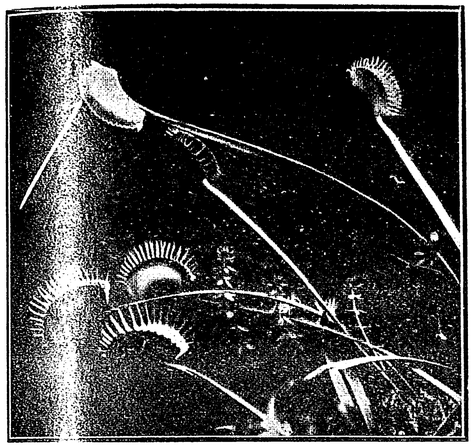

রতি-ফাঁদে আলপিন—(এই ফাঁদের শক্তিপরীক্ষার জন্য যুগ্ম ডালার মধ্যে একটি আলপিন ছুঁইয়ে দেখা গেছে আলপিনটিকে তারা চেপে কামড়ে ধরে!)

কাফ্রি নীহার-ভানু—(আফ্রিকায় এই ধরণের 'সান্-ডিউ' দেখতে পাওয়া গেছে)

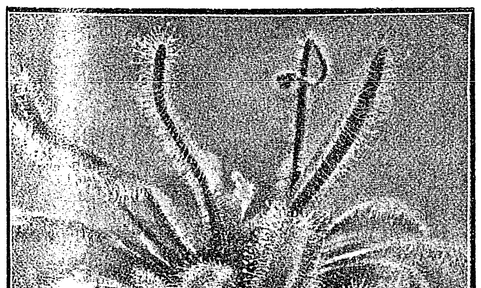

'মাখনলতা' শুধু মাংসাশী নন, ডার্‌উইন সাহেব পরীক্ষা ক'রে দেখে ব'লেছেন এঁদের নিরামিষ পথ্যেও রুচি বেশ! এঁরা কচি পাতার কুচি, ফুলের কেশর, বীজের দানা প্রভৃতি বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন করেন! সুতরাং এই উদ্ভিদ্-ভোজী উদ্ভিদকে বলা যেতে পারে—উদ্ভিদ্ জগতের রাক্ষস!

অন্যান্য দেশের জলাভূমিতে আরও অদ্ভুত রকমের সব প্রাণীভূক্ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে! উত্তর আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে 'Venus Fly trap' বা রতি দেবীর মক্ষীফাঁদ নামে একপ্রকার প্রাণীভূক্ উদ্ভিদ্ জন্মায়। এরা রীতিমত ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে। 'নীহার-ভানু' বা 'মাখনলতা'র মত এদের হাতে কোন বিষাক্ত লালা বা আঠা-রসের অস্ত্র নেই! এদের প্রাণীশিকার রীতি অতি ভীষণ ও নৃশংস।

লম্বা লম্বা ডাঁটার মুখে অদ্ভুত একজোড়া ক'ষে পাতা! উভয় পাতার চারদিকেই অসংখ্য কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাঁত! পাতা জোড়াটি বইয়ের মলাটের মত আধ খোলা অবস্থায় উঁচু হয়ে থাকে, তার উপর পিঠ কাল, ভিতর পিঠটা সাদা!—দেখে মনে হয় যেন কোনো বহুদন্তী হিংস্র জানোয়ারের মুখ!—কিছু খাবার জন্য সে হাঁ ক'রে রয়েছে! কোন কীটপতঙ্গ যদি এর ডাঁটার উপর দিয়ে চলে বেড়ায় বা জোড়া পাতার পিছনদিকে গিয়ে বসে—তাহ'লে কোন ভয় নেই, এমন কি দাঁতের উপরে গিয়ে বসলেও কিছু হয় না, কিন্তু যদি সে হতভাগ্য কীট কোন ক্রমে একবার ঐ যুগ্ম পাতার ভিতর দিকে যে তিনটি ক'রে অতিমাত্রায় স্পর্শ-সচেতন পর্দ্দা আছে তা ঈষৎ স্পর্শ ক'রে ফেলে, তৎক্ষণাৎ স্প্রিংয়ের ডালার মত সেই আধখোলা পাতা জোড়াটি নিমেষের মধ্যে ঝপ্ করে বন্ধ হ'য়ে যাবে! বেচারী পোকাটি তখন সেই উভয় পাতার চাপে 'স্যাণ্ডউইচের' মত অবস্থায় গতায়ু হবে! তবে পোকাটি যদি নেহাৎ ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হয়, তাহ'লে পাতার ফাঁদে ধরা পড়লেও তারা চট্ ক'রে মরে না। ভিতরেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। এমন কি ফাঁক পেলে গ'লে পালাতেও পারে!

আর এক রকম কীটভোজী উদ্ভিদ্ দেখা গেছে—তাদের বলে 'Side-Saddle', বা 'বগ্‌লি-জিন্'! এদের পাতা রঙীণ ফুলদানীর আকারে লম্বা চোঙার মত! এরা জলের জালে শিকার ডুবিয়ে মারে! সেই রঙীণ ফুলদানীর মত পাতার চোঙার মুখপাতে থাকে মধুনিঃসারি গণ্ডমালা। মধুলোভে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই চোঙের মুখে

ঢুকলে আর তাকে ফিরতে হয় না! মধুর স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে সে আরও লোভাতুর হয়ে ভিতরে যেতে সুরু করে এবং এ যাত্রা তাদের শেষ-যাত্রায় পরিণত হয়! কারণ সে যত ভিতরে যেতে থাকে—তার পিছু পিছু পাতার গায়ের রোঁয়াগুলি উত্তেজিত ও বিস্তৃত হ'য়ে তার ফেরবার পথ রুদ্ধ ক'রতে থাকে। পোকাটি ফেরবার পথ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে সেই ফুলদানীর তলায় পড়ে যায়! সেখানে থাকে জলভরা! সেই জলের অথৈ তলে সে তলিয়ে ডুবে মরে যায়!

কালিফোর্নিয়ার—"Darlingtonia" বা 'প্রিয়াকণ্ঠি' এবং 'Pitcher Plant' বা 'ভৃঙ্গার লতা'ও ঠিক এইভাবে কীটপতঙ্গ আকর্ষণ ক'রে এনে তাদের ডুবিয়ে মারে এবং তাদের মৃতদেহ জলে পচে' গ'লে উঠলে তবে তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভের সুবিধা হয়।

কবি কীট্‌স্

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ

অনেকেই জন্ কীট্‌স্‌কে কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসকরূপেই জানেন। রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য্যেই মত্ত থাকিয়া তিনি কেবল তাহারই জয়গান করিয়া গিয়াছেন—এই ভ্রান্তধারণা অনেকেই কীট্‌সের সম্বন্ধে পোষণ করেন। বস্তুতঃ কীট্‌সের কবিজীবনে যে ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহা কেবল শ্রেষ্ঠ কবিদের ইতিহাসে বর্ত্তমান। মৃত্যুকালে তিনি ২৫ বৎসরের যুবক মাত্র। এই তরুণ বয়সেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-জগতে অনন্যসাধারণ। কবি বলিয়াছিলেন—"আমি আশা করি মৃত্যুর পর ইংরাজ কবিদের মধ্যে গণ্য হইব।" কবির উপরোক্ত কথার উল্লেখ করিয়া ম্যাথু আরণল্ড বলিয়াছেন—'কীট্‌সের আসন সেক্সপীয়রের সহিত।"

শ্বেতভুজা বীণাপাণির মন্দিরে অস্পৃশ্যতা নাই। ১৭৯৫ খৃঃ লণ্ডনের অন্তর্গত ফিন্সবারিতে এক অশ্বরক্ষকের গৃহে এই বিশ্ববিশ্রুত কবির জন্ম হয়। ইউরোপের সাহিত্য-জগতে তখন এক পরম যুগ। ১৭৯৮ খৃঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের 'লিরিক্যাল্ ব্যালাডস্' প্রকাশিত হয়। ইহাই রোমান্টিক যুগের স্পষ্ট বিকাশ। বহুপূর্ব্ব হইতেই কাব্যজগতে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা প্রবেশ করিতেছিল—তাহাই আজ মূর্ত্ত হইয়া অতি স্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যক্ত করিল। রোমান্টিক কবিদের অব্যবহিত পূর্ব্বের কবি কুপার, ক্রাব বা বার্ণসের মধ্যে এই নবভাবের সূচনা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তর্ক ও ন্যায়ের জটিলতা হইতে চিন্তাধারাকে মুক্ত করিয়া যাঁহারা কল্পনালোকের সম্মোহন আবেষ্টনীতে ইহাকে আনিয়াছিলেন এবং মানব ও প্রকৃতিকে নূতন ভাবে ও নূতন আলোকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমে রোমান্টিক যুগের সূচনা করেন। অতীতের প্রতি একটি তীব্র আকাঙ্খা এই কল্পনার সহায়ক। মানব যখন বর্ত্তমানে বীতশ্রদ্ধ হয়; তখন সে অতীতের সৌন্দর্য্য ও গৌরবময় কাহিনীতে আশার রঙ্গীণ ছবি দেখে। যখন বর্ত্তমানে ধরিবার মত কিছু পাওয়া যায় তখন মানব বর্ত্তমানের সেই ক্ষুদ্রতম আশ্রয়টুকু অবলম্বন করিয়াও অনেক কিছু গড়িতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ এমন কি বায়রণ, শেলী ও স্কট তাহাই করিয়াছিলেন। ফরাসী বিদ্রোহের প্রবল বন্যা যখন ইউরোপে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঊর্ম্মি আনিয়াছিল, তখন তরুণ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোল্‌রিজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বর্ত্তমানকে ধরিয়াই নিজেদের নব ভাবের কবিতায় প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই ফরাসী বিদ্রোহের বন্যা তাঁহাদের সে রঙ্গীণ কল্পনায় নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছিল। ইহাতে এই দুই কবির মানসিক ও কাব্যিক যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহা বাস্তবিক শোচনীয়। আদর্শের অতর্কিত এই বিকৃতিতে তাঁহারা নিজেদের একমাত্র সম্বল যেন হারাইয়া ফেলিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে চিন্তাধারার এক অভিনব বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজের ও ভগিনীর চেষ্টায় প্রকৃতির ও গূঢ় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে থাকিয়া টিকিয়া গেলেন কিন্তু কোলরিজের জীবন এক বিয়োগান্ত নাটকেই পরিণত হইল। শেলীও এই বিদ্রোহকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার মন্দ দিকটা ছাড়িয়া দিয়া ভালটুকুর সাহায্যে ও কল্পনার প্রভাবে এক আদর্শ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতালোকের ছবি তাঁহার 'প্রোমীথিয়সের মুক্তি' নামক কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। বায়রণ ও স্কটের মধ্যে 'বর্ত্তমানের' এই প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কবি কীটস্ রোমান্টিক যুগের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। তিনি নিজেই সেই অধ্যায়ের আরম্ভ—নিজেই তাহার অবসান। 'বর্ত্তমানের' হীন আদর্শ তাঁহাকে কবিতার কোন উপকরণ যোগাইতে পারে নাই। যখন কীট্‌স্ লিখিতে আরম্ভ করেন, ওয়াটারলু যুদ্ধের পর ইংলণ্ড তখন জড়বাদ ও পার্থিব ভোগে মত্ত। ১৭৮৯ অব্দ হইতে কবিরা যে মহৎ ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়াছিল তখন তাহা মৃত ও বিকৃত। বিদ্রোহ শান্তির সহিত কল্পনা বিষাদে ও অবসন্নতায় পর্য্যবেশিত হইয়াছিল। কবি কীট্‌স্ ইংলণ্ডে থাকিয়া সে সমস্তই অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে বর্ত্তমান তাঁহার কবি-মনের

কোন খোরাকই যোগাইতে পারিবে না। বর্ত্তমানের চিন্তা, আশা ও আকাঙ্খা প্রত্যাখ্যান করিয়া কীট্‌স্ তখন অতীতের দ্বারে ভাবের প্রার্থী হইলেন। প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় কাহিনী, সেখানকার অনাড়ম্বর জীবন, সরল পৌত্তলিকতা, শুচিশুভ্র প্রকৃতি ও আদিম অনুরাগ কীটস্‌কে মুগ্ধ করিল। অনেকেরই মনে হইতে পারে যে কীট্‌স কিরূপে কেবল অনুবাদ পড়িয়া ও ইংলণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া গ্রীসের এই ভাবটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর শেলী দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কীটস্ আজন্ম গ্রীক্। বস্তুতঃ প্রাচীন য়ুনানীভাব কীট্‌সের মজ্জাগত। শিক্ষার অভাব বা লণ্ডনের সঙ্কীর্ণ পরিসর ইহাতে কোনও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রাচীন গ্রীকদের ভাবিবার ও দেখিবার রীতি কীটসের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য (Hellenism)। বৈদিকযুগের প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের প্রকৃতি পূজার রীতি অনেকাংশে গ্রীক রীতির অনুরূপ। বৈদিক ঋকে দেখা যায় প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ দেবতারূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছে। উষাকালে অরুণ-সারথি সূর্য্যদেব তাঁহার রথে দৈনন্দিন কার্য্যে বাহির হইয়াছেন, জল-দেবতা বরুণ শস্যসম্ভার লইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই ভাবে প্রকৃতির আরাধনা যেমন বৈদিক হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি ভাবে প্রাচীন গ্রীকেরা আদিম মনের সাহায্যে প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেখিত। বর্ত্তমানের সভ্যতা বা বিদ্যার আড়ম্বর তখন মানুষকে ভারাক্রান্ত করে নাই—তাই তখন সে একটি গোলাপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উদ্ভিদ্-জ্ঞান-পিপাসা মিটাইত না, পরন্তু ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্যেই মগ্ন থাকিত। এই আদিম সৌন্দর্য্য প্রীতি—অর্দ্ধ-পূজা ও অর্দ্ধ-আনন্দের—এই ভাবই গ্রীক প্রকৃতির মূল কথা।

কিন্তু কীট্‌স্ গ্রীক রীতিতে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া চিরকালই কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দরকে বরণ করিয়া যান নাই; তিনি যে ক্রমে এক অতীন্দ্রিয় পদার্থের সন্ধান পাইতেছিলেন তাহা তাঁহার কবিতাতেই সুস্পষ্ট। কবিতাই কবির আত্মজীবনী। এণ্ডিমিয়ন্ ওড্‌স্ কয়টি, লামিয়া ও হাইপেরিয়ন্—এই কয়টি কবিতাতেই কীট্‌সের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এণ্ডিমিয়ন তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা, অপরিণত বয়সের অনেক চিহ্ন ইহাতে আছে। জ্যোৎস্না দেবীর সিন্‌থিয়ার রাখাল বালক এণ্ডিমিয়নের সহিত প্রণয়কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তে ইহা এক রূপকে পরিণত হইয়াছে। সিন্‌থিয়ার জন্য এণ্ডিমিয়নের প্রেম পরম সুন্দরের জন্য কবির হৃদয়ের আবেগই সূচনা করিতেছে। এণ্ডিমিয়নের প্রথম ছত্রটি প্রসিদ্ধ। "চির আনন্দে নন্দিত যাহা সুন্দর"—যদিও ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দরের আরাধনা, তথাপি কবির হৃদয়ের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন গ্রীসীয় পাত্রের চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্যখচিত চিত্রসকল দেখিয়া তিনি যে গীতিটি লিখিয়াছিলেন তাহাও সুন্দরেরই পূজা। 'সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর'—ইহা যদিও বাহ্যতঃ ভাস্কর শিল্পের মহিমা-কীর্ত্তন, তথাপি ইহার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কারুকার্য্যখচিত ও বিচিত্রচিত্রশোভিত পাত্রটি প্রাচীন গ্রীসের যেন একটি অধ্যায়কে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কোথায় গিয়াছে গ্রীসের সেই লোকোত্তর গৌরব, কোথায় তাহার সেই সরল সৌন্দর্য্য—কিন্তু বর্ত্তমানের এই কুৎসিৎ আবেষ্টনের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তগুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে এই সুন্দর শিল্পকলাযুক্ত পাত্রটি। কারণ সত্য কখনও মরে না—সে সেই অমর, অব্যর্থ সত্যেরই সন্ধান দিতেছে বলিয়াই সে আজ এত সুন্দর। 'লামিয়া' কবিতাটি কবির এক বিশিষ্ট দান। সুন্দরী রমণীর আকৃতি ধারণ করিয়া এক সর্পিণী 'লিসিয়াস' নামক এক পুরুষকে মুগ্ধ করে ও তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহোৎসবের মধ্যে দার্শনিক এপোলোনিয়সের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কুহেলিকা ভেদ করে। কবি যে আর কেবল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েই চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে অতীন্দ্রিয় এক পরম রূপের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা 'লামিয়া' পড়িলে বুঝা যায়। এই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় কবির 'হাইপেরিয়ন' নামক কবিতাংশটি পড়িয়া। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' নামক মহাকাব্যের সমতুল্য এক কাব্য সৃষ্টির আশাতেই তিনি "হাইপেরিয়ান্" আরম্ভ করেন। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ কাণ্ড লিখিয়াই তিনি এ চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। তিনি মহাকাব্য লিখিবার অনুপযুক্ত অথবা ইহাতে মিলটনের মুদ্রাঙ্ক পড়িতেছিল বলিয়াই তিনি এ প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন তাহা বোধ হয় না। ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্ব। লেখার ও হৃদয়ের ভাবের সহিত তিনি সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই ইহা অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া মনে হয়। অলিম্পিয়ানগণ কর্ত্তৃক টাইটনদের পরাজয় এই কাব্যের বিষয়। সেটারন্ তাঁহার পুত্র জুপিটার কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইয়া বিলাপ করিতেছেন। একমাত্র টাইটন্—সূর্য্যদেবতা হাইপেরিয়ন্ তখনও পরাজিত হইবার শঙ্কায় শঙ্কান্বিত। এধারে আপেলো ক্রমে নিজের মধ্যে এক পরিবর্ত্তন ও আনুষঙ্গিক দ্বন্দ্ব ও ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইখানে কবিতাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবি ওসিয়েনাস নামক এক টাইটনের মুখে বলিতেছেন যে অলিম্পিয়ানরা জিতিবে—কারণ তাহারা অধিকতর সৌন্দর্য্যের অধিকারী। 'যে যত অধিক সুন্দর সেই তত বলবান' ইহাই কবিতাংশটির মূল কথা। এ যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য—অবিনশ্বর, পরম, অমৃত ও অখণ্ড সৌন্দর্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি নিজের পরিবর্ত্তন আপেলোর মধ্যে সূচিত করিয়াছেন কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যে অপার্থিব ও ভূমা—তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই বোধ হয় 'হাইপেরিয়ন্' অর্দ্ধ পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যে কীটস্ সুরাপানের পূর্ব্বে লঙ্কার উগ্রতা আস্বাদ করিতেন, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রখরতর করিবার জন্য তিনিই আবার ভূমানন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল; কিছুকাল পূর্ব্বে যিনি ফ্যানীব্রণ নাম্নী রমণীর প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন তিনিই আবার নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বোধ করিয়াছিলেন—এক মহত্তর রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয়, কীট্‌সের জীবনের বড় কথা।

সামাজিক হিতসাধনে জীবন-বীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ

ধন-সঞ্চয়ের উপর যে জাতীয়তার ভিত্তি সংস্থাপিত একথা আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধনসঞ্চয়ের উপর জাতির কল্যাণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। কোনও বিশেষ একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির উপরও জাতির শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল নহে; সে প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা যতই ব্যাপক হউক না কেন, তাহার উন্নতিতে মুষ্টিমেয় ধনিক অথবা বহুসংখ্যক অংশীদারের স্বার্থরক্ষা হয় বটে—বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক বা কেরাণীর দল কায়ক্লেশে দুইবেলা অন্ন সংস্থানেরও সুযোগ পায়, কিন্তু তাহাতে সমগ্রভাবে জাতির আর্থিক দুর্গতি দূর হয় না, অর্থনৈতিক সমস্যারও কোনও সমাধান হয় না; সমগ্র জাতি যে দেশের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সমবেতভাবে সচেষ্ট, ইহাও তাহার দ্বারা বুঝা যায় না।

জাতির সমবেত চেষ্টার কথা বলিতে গেলেই পারিবারিক ও সামাজিক একপ্রাণতা ও ঐক্যসাধনের কথা আসে। বাঙ্গালীকে সামাজিক সংহতি সাধনের দিকে মন দিতে হইবে। সমাজের সকল স্তরেই যখন জাতিগত আত্মবোধ অধিকারভেদে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখনই যথার্থ জাতীয় জাগরণ সূচিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর যে সমাজ আজ দারিদ্র্য-দোষে গুণহীন—অভাবের তাড়নায় পঙ্গু হইয়া আছে—আশা-হীন, উৎসাহ-হীন, আত্মনির্ভরতা-বিহীন—সে বাঙ্গালী সমাজের সংহতি সাধন দূরের কথা—ওতপ্রোত-ভাবে প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ সাধনের জন্য জাতি এখনও জাগ্রত হয় নাই।

কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না—অর্থ-সম্পদে সম্পদশালী করিয়া জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার চিন্তা—বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সে চিন্তার ফল—জগতের অন্যান্য দেশ বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছে। ভারতবর্ষই বা কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে? দরিদ্র সমাজকে—দৈনন্দিন অভাব হইতে, ভবিষ্যতের নিদারুণ দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিবার পথে অন্যান্য দেশ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে দেখা যাক্—,

জীবন-বীমার মাথা পিছু (Per Capita) পরিমাণ—

আমেরিকা	...	...	৩,০৭৬৲
গ্রেট ব্রিটেন	...	...	৯৭০৲
নেদারল্যাণ্ডস্	...	...	৪৪৮৲
ভারতবর্ষ	...	...	৫৲

এ সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ বীমাবিদ্ বলিয়াছেন—

There was only one way in which a poor man without capital could protect his family from the vicissitudes of fortune and make proper security against the day that must come to us all and that was through life insurance.

—Charles E. Hughs.

—অর্থাৎ একজন গরীব লোক, যাহার কোনও মূলধন নাই, তাহার পক্ষে ভবিষ্যতের দুর্দ্দশা হইতে পরিবারবর্গকে রক্ষা করা এবং যে দুর্দ্দিন একদিন সকলেরই আসিবে—সেদিনের জন্য উপযুক্ত সঞ্চয় করার একমাত্র উপায় জীবন-বীমা করা।

কিন্তু শুধু দরিদ্র লইয়াই ত আমাদের সমাজ নহে—ধনীর পক্ষে কি ইহা কম উপযোগী? "ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই জীবন বীমার সার্থকতা আছে। শুধু ধনীর সম্পদ লইয়া—জাতীয় সম্পদ নহে; ধনীর অবস্থা-সচ্ছলতা দরিদ্রের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে বর্ত্তমান ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার দিনে কাহাকেও সে প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই।

কাজেই ধনী বা স্বচ্ছল অবস্থার লোকের জীবনবীমা করিবার প্রয়োজন নাই এমন তর্ক চলিতে পারে না। নিজের পরিবারস্থ লোকের এবং প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা কল্পে জীবনবীমাই যে প্রকৃষ্টতর উপায় এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 'ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অফ

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ কালভিন্ কুলিজ (Mr. Calvin Coolidge) বলিয়াছেন—

"There is no argument against the taking of life insurance. It is established that the protection of one's family or those near to one is the one thing most to be desired and there is no medium of protection that is better than Life Insurance."

জীবন বীমার মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে—ইহার "পুরুষানুক্রমিক প্রভাবের কথা।" জীবন-বীমার সুখ সুবিধা ও কল্যাণ শুধু এক পুরুষের জন্য নহে,—পুরুষানুক্রমেই তাহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। অভিভাবকের অভাবেও জীবনবীমার দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে সন্তানগণ শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হয় এবং "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হয় নাই বলিয়া তাহার সৎশিক্ষা ও আচার ব্যবহারের সুফল আমরা পুরুষানুক্রমে বর্ত্তাইতে দেখি। বীমা-সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বংশের ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চরিত্রে প্রতি-ফলিত হইতে দেখি।

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের বংশের মর্য্যাদা ও সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে অব্যাহত দেখিতে পাইলে আমাদের মত তৃপ্তিবোধ অন্য কোনও জাতি করে কি না জানি না। এই প্রকার তৃপ্তিবোধের মধ্যে আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অভাবে ও দুর্দ্দশায় বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী পরিবার তথা বাঙ্গালী সমাজের অন্তর বিপ্লবের ফলেই আজ আমরা সে বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছি। জাতির সে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে না পারিলে আসন্ন সর্ব্বনাশের স্রোতে বাঙ্গালী তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে। দারিদ্র্য—সংক্রামিত অথর্ব্ব সমাজ লইয়া জাতীয় কল্যাণ সাধনের আশা সুদূরপরাহত।

সম্প্রতি করাচীতে "রোটারি ক্লাব"এ মিঃ ডি, বি, অভারি জীবনবীমা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—জীবনবীমা মানুষের সামাজিক জীবনের কল্যাণসাধনে কতখানি উপযোগী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যবসায়ের দিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের উপায়ের কথা ছাড়াও জীবন-বীমার প্রসারের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ সাধনের যে উচ্চ আদর্শ আছে তাহা জনসাধারণকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের বড় কথা সাধারণ-বুদ্ধিতে আমরা না হয় নাই বুঝিলাম; কিন্তু সমাজের আর্থিক অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দ্দশা ত আমরা প্রতি-নিয়ত স্বচক্ষেই দেখিতেছি। উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবকের মৃত্যুতে অসহায় পরিবারের উপায়হীন অবস্থা দেখিয়া হা-হুতাশ করিতেছি। এই সব অনর্থপাত হইতে সমাজকে জীবনবীমা কি ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতেছি।

বিভিন্ন দেশের বীমা কোম্পানীগুলির হিসাব হইতে দেখা যায় বীমার দাবী মিটাইবার পক্ষে তাহাদের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ :—

আজীবন বীমার দাবী—	
(Claims on Whole-life Policies)	৫০ কোটি টাকা
মেয়াদী বীমার দাবী—	
(Claims on Endowment Policies)	১১৪ কোটি "
বার্ষিক ভাতা (Annuity)	
অক্ষম লোকদের ভরণপোষণের	
চুক্তিমূলক বীমা—	৩·৮ কোটি "
পারিবারিক অন্নবস্ত্র ও	
আশ্রয় সংস্থানের জন্য—	৫০ কোটি "
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহ—	৪ কোটি "
বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকদের ভরণ-	
পোষণ বাবদ—	১১·২ কোটি "

অর্থাৎ উপরোক্ত হিসাবের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সভ্যজগতের সমগ্র বীমা কোম্পানীগুলির সামাজিক হিতসাধনকল্পে বার্ষিক ব্যয়——————

২৩২·১০ কোটি টাকা

জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মানব সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের জন্য এই প্রকার বিরাট কাজের কথা ভাবিলে সত্যই বীমা-কর্ম্মীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে দান করিয়া, ভিক্ষা দিয়া, ধনীলোকের চাঁদায় সদাব্রত বা আতুর আশ্রম খুলিয়াও সমাজ সেবা

কার্য্যের একপ্রকার পদ্ধতি আছে এবং প্রত্যেক সভ্যদেশেই সে ব্যবস্থা কিছু না কিছু আছে। কিন্তু

"দান সে ত দানই
দাতারে দরিদ্র করে
দরিদ্রেরে করে না মহৎ"—

—তাহার মধ্যে সমগ্রভাবে মানুষের সম্মান, পুরুষের পৌরুষ ও নারীর আত্মমর্য্যাদা কোনও না কোনও-ভাবে আহত না হইয়াই পারে না। অথচ যে কোনও প্রকারের ব্যবস্থায় আমরা জীবনবীমা গ্রহণ করি না কেন—তাহাতে যে টাকা আমাদের প্রাপ্য হয় তাহা আমাদের নিজের টাকা, প্রতিদিনের মিতব্যয়িতার ফলে সঞ্চিত; মেয়াদ পূর্ণ হইলে বা বীমাকারীর জীবনান্তে কোম্পানীর নিকট দাবী উপস্থিত করিয়া আমরা যে টাকা আদায় করি তাহা কাহারও অনুগ্রহদত্ত দান বা ভিক্ষা নহে—তাহা আমাদের ন্যায্য পাওনা, আমাদের একান্ত দাবীর টাকা; মানুষের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্বকীয় অধিকার মানুষকে বড় করে—অভাবজনিত নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া চলে বলিয়াই সমাজিক হিত-সাধনে জীবন-বীমার সার্থকতা আজ সভ্যসমাজে সসম্মানে স্বীকৃত হইতেছে।

ডাক্তারের আত্মকাহিনী

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

(১)

আমি একজন ডাক্তার—রোগ ও রোগীর ডাক্তার, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় যাকে বলে চিকিৎসক। আমি সেই সে কালের ডাক্তার—কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের 'এল্-এম্-এস্' পাশ। 'এল্-এম্-এস্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই আমি যা হ'ক্ কিছু রোজগার করছিলাম, নিজের সংসারখরচ নিজেই চালাতাম; বছরখানেক পরে এই কলিকাতা সহরেতেই গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে ডাক্তারী ক'রে বেড়াতাম। সে গাড়ী-ঘোড়ার বহর দেখে কিন্তু সকলেই মুচ্‌কে হাসত; আজকালের (খোকা বা) 'বেবী'-মোটার্ গাড়ী দেখে, কৈ কেউ তো বিদ্রূপের হাসি হাসে না! বরং বলে "বেশ্ ছোট্ট-খাট্ট গাড়ীটি!" অবশ্য আমার সেই 'বেবী'—অশ্বযান বেশ ঝক্‌ঝকে, আর খোকা-অশ্বিনী-নন্দনটি শ্রীযুক্ত ছিল—তবুও বিদ্রূপের হাসি আমি এড়াতে পারি নি।—বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মোহে আমরা এমনি জর্জ্জরিত! কিন্তু যাক্ ও সব কথা; আমার দিনগুলি বছর কতক একরকম বেশই কেটে গেল।

তার পর আমার মেয়ের বিয়ে দেবার সময় হ'ল; এই কন্যাটি আমার প্রথম সন্তান। সে সময় বিশ-পঁচিস্ বয়সের অবিবাহিতা বালিকা দেখা যেত না। পরাধীন জাতির যত কিছু দুঃখ ও দীনতা আমাদের মধ্যে যতই পুঞ্জীভূত হচ্ছে, আমরা ততই বিলাতী ধারার নব নব রূপের অনুকরণ করছি—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অবিবাহিত পুত্র কন্যার বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনকে মুখে আমরা যতই ভাল বলি, অন্তরে সে ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না—সুতরাং দেখতে পাই যে, সার্দ্দা-আইন অনুসরণ না ক'রে সকলে তার দোহাই দিয়ে থাকেন। সে সময় এমনটি ছিল না—তাই বয়সে-বালিকা কন্যার বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করতে হ'ল। যৎসামান্য যা কিছু উপার্জ্জন করতাম, মধ্যবিত্তভাবে সংসার চালাতে তা প্রায় সমস্তই খরচ হ'য়ে যেত—আর রোগ যে ডাক্তারের সংসারে হয় না, তা তো নয়; এজন্য সঞ্চয় কিছু করতে পারি নি বললেই হয়—কন্যার বিবাহে দেনা হ'ল।

দেনা হ'ল বটে, কিন্তু উপার্জ্জন তো কিছু বাড়ল না—সুতরাং সুদে-আসলে দেনার বোঝাটা অল্পদিনেই একটু ভারী বোধ হ'তে লাগল। এই সময়ে ইউরোপে জার্ম্মাণ-যুদ্ধ বেঁধে গেল এবং অচিরেই মহাযুদ্ধে পরিণত হ'ল। মহাদাবাগ্নির সময় হরিণের পাশ দিয়ে বাঘ ছোটে

পালাবার জন্য—এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানতাম না; কিন্তু উক্ত মহাযুদ্ধের সময় বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে, কথাটা খুবই সত্য। ইংরাজবাহাদুর অবাধে দেশী ডাক্তারদিগকে 'আই-এম্-এস্' পদে ভর্ত্তি করেছিলেন, যুদ্ধের ডাক্তার করবার জন্য। আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত এই লড়ুয়ে 'আই-এম্-এস্'এর পদ আমিও একটা জোগাড় করলাম এবং নামের পূর্ব্বে 'ক্যাপ্‌টেন্' আখ্যা লাভ ক'রে যুদ্ধযাত্রা করলাম—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ডাক্তার হ'য়ে যাত্রা করলাম যুদ্ধক্ষেত্রে, ফিরে এসে পাওনাদারকে পরাজয় করবার আশায়। "পরাজয়" কথাটা মনে হাসবেন না—তখন সত্যসত্যই পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যে একটা যুদ্ধ-অভিনয় হ'ত; পাশ্চাত্য আইনের ফাঁকিটা সহজ ও ব্যাপক করতে তখন কেহই রাজনীতিক্ষেত্রে উদিত হন নি।

(২)

আমার 'ক্যাপ্‌টেন্' জীবনের কথা কিছু বলব না; তবে এইটুকু বলতে চাই যে, 'ক্যাপ্‌টেন্' কথাটা বাঙ্গালা ভাষায় আমদানী "কাপ্তেনী" কথার জননী হ'লেও, আমি আমার 'ক্যাপ্‌টেন্'-জীবনে কাপ্তেনী করি নি—সুতরাং কিছু সঞ্চয় ক'রে দেনার বোঝাটা নামাতে পেরেছিলাম।

যুদ্ধের বিরাম হ'ল এবং সেই সঙ্গে আমার 'ক্যাপ্‌টেন' জীবনও শেষ হ'ল। আমার মতন অনেকেই পুনর্মূষিক হ'লেন তো বটেই—রাজনীতিক্ষেত্রেও মহাশয়দিগের কত-না সাধের আশা একেবারে ভেঙ্গে চুর হ'য়ে গেল; বর্ব্বরের ধন-ক্ষয় আর স্বপনবিলাসীর আশা-ভঙ্গ চিরকালই হ'য়ে থাকে।

আবার কলিকাতায় ফিরে এসে ডাক্তারী পেশা আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশের, অন্ততঃ এই কলিকাতা সহরের চালচলনে বেশ একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। 'খোকা'-ঘোড়া, আর 'বেবী'-গাড়ী শুধু বিদ্রূপের বস্তু নয়—একেবারেই অচল; পূর্ব্বে যা কিছু উপার্জ্জন করতাম সেই সামান্য উপার্জ্জনও এক্ষণে আমার ভাগ্যে জুটল না—যদিও আমি এখন একজন "অবসরপ্রাপ্ত 'আই-এম্-এস্'।" আবার বুঝি একটা নূতন কারণে দেনার একটা নূতন বোঝা মাথায় নিতে হয়—এই ভয়ে সদাই শঙ্কিত। এ হেন সময় আমার এক নিকট আত্মীয় এলেন আমার নিকটে আশার বাণী ও বার্ত্তা নিয়ে।

আমার এই আত্মীয়টিকে দে মশাই ব'লে এখানে পরিচিত করব। তিনি একজন ব্যবসাজীবী; যে যুদ্ধের কৃপায় আমি আজ একজন "অবসরপ্রাপ্ত 'আই-এম্-এস্'", সেই যুদ্ধের কৃপাতেই তিনি তাঁহার ব্যবসাসূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ক'রে আজ একজন ধনী। তিনি এসে আমাকে জানালেন যে, তাঁর গ্রামে তিনি একটি দাতব্য ডাক্তারখানা খোলবার বন্দোবস্ত করেছেন; আমি যদি সেই ডাক্তার-খানার ভার লই, তা হ'লে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাহিনা—দে মশাই বিনয় দেখিয়ে 'মাহিনা' কথার পরিবর্ত্তে 'পারিশ্রমিক' কথাটা বলেছিলেন এবং বাসস্থান ও সিধার বন্দোবস্তও করবেন; দশজনের উপকারার্থ সেই প্রতিষ্ঠান—সুতরাং আমাকে একটু স্বার্থত্যাগ ক'রে এই সর্ত্তে কাযটি গ্রহণ ক'রতে হবে। তখন আমার যেরূপ অবস্থা, উক্ত সর্ত্তে দাতব্য ডাক্তারখানাটির ভার লওয়া আমার পক্ষে স্বার্থত্যাগ নহে, স্বার্থের পূজা; দে মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাকুরীটি গ্রহণ করলাম।

(৩)

'রেল্‌ষ্টেশন' হ'তে ক্রোশখানেক মেঠো পথ গোরুর গাড়ীতে অথবা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবার পর গ্রামটি পাওয়া যায়; পথটি 'রেল্ ষ্টেশন' থেকে পূর্ব্ব মুখে এসে গ্রামের মধ্য দিয়ে বক্রগতিতে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে এক প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে। এই পথটি হ'ল সেই গ্রামের প্রধান পথ এবং এই পথটির দু' ধারে ভিন্ন ভিন্ন গলি, লোকের কানাচের পাশ দিয়ে, ঝোপঝাপের মধ্য দিয়ে, পুকুর-ডোবার পাড় দিয়ে গ্রামের অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এক-একটি গলি গিয়ে এক-একটি পাড়ায় পৌঁছান যায়; যথা—বামুনপাড়া, কায়েৎপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া—এমন কি ডোমপাড়া, চাঁড়ালপাড়াও আছে। শুনেছি মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্ব্বে এই গ্রামে মুসলমানপাড়া ছিল না—পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান যা'রা ছিল তারা গাঁয়ের বাইরে বাস করত; ইংরাজবাহাদুরের নির্ম্মম ভেদনীতি এবং রাষ্ট্রিক ধুরন্ধরদের আত্মঘাতী পরাজয়ভীতি, আর তারই সঙ্গে গোঁড়া সনাতনীদের উৎকট গোঁড়ামি—এই ত্র্যহস্পর্শের

স্পর্শে ডোমপাড়া-চাঁড়ালপাড়ার পাশেই একটা বড় মুসলমান-পাড়া ক্রমশঃ গজিয়ে উঠেছে।

গ্রামটির অবস্থা এখন যাই হোক্-না কেন, এক সময়ে যে ইহা একটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল তার চিহ্নের অভাব নেই। ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় কোঠাবাড়ী চারিদিকেই রয়েছে—কোনটাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে, আবার কোনটাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। নিম্নস্তরের লোকরা এখনও আছে বটে, কিন্তু বোধহয় থাকে না; অনশন ও রোগে তারা জর্জ্জরিত—প্রতি বৎসর তাদের মধ্যে কত জন যে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে জীবন দান ক'রে নিজেদের ও স্বদেশের পাপ নীরবে স্খালন করছে, তা'র খোঁজ কে-ই বা করে, আর কে-ই বা দেয়! স্বাধীন জগতের অবোধ্য এই গ্রামটি আমার নূতন চাকুরীর স্থল।

দাতব্য ডাক্তারখানায় আমি পাঁচ মাসের ওপর ডাক্তারী করেছিলাম। আমি কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের পাশকরা ডাক্তার—সুতরাং যে ঘরে আমি রোগী দেখতাম এবং ওষুধ বিতরণ করতাম, সে ঘরটাকে 'ডাক্তারখানা' বলতেই হ'বে—তা না হ'লে সে ঘরে ডাক্তারখানার আর কোন লক্ষণ বড় একটা ছিল না। যখন সেখানে প্রথম যাই, তখন ডাক্তারখানার প্রতিষ্ঠাতা দে মশাই 'কুইনিন্' 'সোডি-বাইকার্ব্ব' প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ পরিচিত ওষুধ অল্প পরিমাণে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন—প্রথম সপ্তাহেই তা শেষ হ'য়ে যায়; কিন্তু তার পর থেকে দে মশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানায় চিঠির ওপর চিঠি লিখেও ওষুধ আনাতে বেগ পেতে হ'ত—উত্তর আসত "চিরেতার জল দিয়া কার্য্য চালাইতে থাকুন, ওষুধ যথা শীঘ্র পাঠান হইতেছে।"

হায় রে হতভাগ্য দেশ—এক ছটাক চিরেতাজলের জন্য কত না লোক আসত, কতদূর থেকে আশেপাশের গ্রাম থেকে! আর হায় রে হতভাগ্য আমি, দু মুঠি অন্নের জন্য এইভাবে ডাক্তারী করতাম! চাকুরীর প্রারম্ভে যে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলাম, তাহা বাদে হাতখরচ বা মাহিনাবাবদ প্রাপ্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার পঞ্চাশ পয়সাও কখন পাই নি, যা থেকে দু-চারটে কম দামের চলতি ওষুধ নিজের খরচে আনিয়ে রাখতে পারি। দে মশাইয়ের পূর্ব্বপুরুষের অতি জীর্ণ কোঠা ভদ্রাসনের দুখানা ঘরে বাস করতাম এবং আর একখানা ঘরে ডাক্তারী করতাম; আর সিধার বন্দোবস্ত নিজেকেই ক'রে নিতে হ'ত—দে মশাইয়ের জঙ্গলময় বাগান থেকে ও গ্রামের ঝোপঝাপের ভেতর থেকে—আর সেই সিধা পূর্ণ করতাম দে মশাইয়ের মোড়ল রায়তদের নিকট হ'তে ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা—লাউ, কুমড়া, শসা, যা কিছু সিধা সত্যসত্যই পেতাম, তা এই চিরেতাজলপিপাসী হতভাগ্যদের নিকট হ'তে!

(৪)

এই অভাগার জীবনের দিনগুলি যখন এইভাবে হতভাগ্যদের মাঝে কেটে যাচ্ছিল, তখন জামাতা বাবাজী এক দিন হঠাৎ এসে হাজির হ'ল কলিকাতা থেকে। তার মুখে শুনলাম যে, কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ দে মশাইয়ের দাতব্য ডাক্তারখানাটির গুণকীর্ত্তনে চতুর্ম্মুখ! সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দে মশাইয়ের দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বিশেষভাবে গভর্ণমেণ্টের নজরে এনেছেন এবং জেলাবোর্ড্ দে মশাইয়ের হাতে পাঁচশত টাকা দিয়েছেন ডাক্তারখানাটির উন্নতিকল্পে। বাবাজী পরম্পরায় শুনেছে যে শীঘ্রই দে মশাই এক হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর বার্ষিক তিন শত টাকা কড়ারে ডাক্তারখানাটির ভার অর্পণ করবেন এবং জেলাবোর্ডের দেওয়া পাঁচশত টাকার বক্রী দুই শত টাকার ওপর আরও দুই-এক শত টাকা নিজে খরচ ক'রে ভদ্রাসনের কতকগুলি ঘর বাসোপযোগী ক'রে নেবেন; অবশ্য সমস্তটা ডাক্তারখানা-বাবদ খরচ দেখান হবে। জানি না দে মশাইয়ের মতন আরও কত মহাশয় লোক আপনি ফুটে আপনি ঝরে পড়ছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে!

মনে মনে ভয় হ'ল—অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থাটা তো হ'য়েই রয়েছে, পত্রদ্বারা প্রেরিত হ'লেই হয়; তা ছাড়া উচ্চ বাক্য উচ্চারণ করবার উপায় নেই—কারণ "ধনী সে, দরিদ্র আমি; সে আলো, এ অন্ধকার"। ভয় তো হ'লই—সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা ধিক্কারও এল; সেই দিনই জামাতার সঙ্গে কলিকাতায় রওনা হওয়া গেল। জামাতার পরামর্শে ও সাহায্যে নিজ গ্রামে এসে একটা ডাক্তারখানা খুললাম—আর সেই থেকে এই ক' বছর—এ বুড়ো বয়সেও ডাক্তারী করছি। আমি গরীব—বিনা মূল্যে কিছু করবার ক্ষমতা নেই; ওষুধের মূল্য বাবদ কিছু নিয়ে থাকি, আর 'ভিজিট্' (পারিশ্রমিক) হিসাবে যে যা যখন দেয়—কিন্তু তা শুধু চিরেতাজলের পরিবর্ত্তে নয়।

উড়িষ্যায় চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটি নূতন পদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে পাটনার অধ্যাপক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রঙীন্ হালদার এম-এ মহাশয় সংবাদ দেন যে কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তী এম-এ মহাশয়ের নিকট চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন পদ আছে। সংবাদ পাইয়া কটকে গিয়া মহান্তী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পদগুলি তাঁহার পল্লীগ্রামের বাটীতে থাকায় এবং তিনি নিজে না গেলে সেগুলি অপর কেহ খুঁজিয়া পাইবে না জানিতে পারায়—ফিরিয়া আসা ভিন্ন আমার উপায় ছিল না।

এ বৎসর পূজার পর কটকে গিয়া কটকের উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম রায়সাহেব তাঁহার পল্লী-ভবন হইতে পদগুলি আনিয়াছেন এবং সেগুলির প্রতিলিপি প্রদানে সম্মত আছেন। পদগুলি উড়িয়া অক্ষরে লেখা। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও উপর্য্যুপরি তিনদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে রায়সাহেব পদগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তিনি এইরূপ অনুগ্রহ না করিলে পদ সংগ্রহ এবং পাঠোদ্ধার—আমার পক্ষে কোনটাই সম্ভবপর হইত না। আমি এজন্য রায়সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার আপ্যায়ন আমার বহুদিন স্মরণ থাকিবে।

মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের প্রায় অষ্টাদশ বৎসর-কাল নীলাচলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গম্ভীরার গুপ্তকক্ষে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে লইয়া তিনি কয়েকখানি গ্রন্থের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীও আস্বাদন করিতেন। স্বরূপের সুধাকণ্ঠে চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া তিনি আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতেন। সুতরাং পুরীধামে যে সে সময় চণ্ডীদাসের পদাবলী বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা কিছুদিন হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছি যে, তাঁহারা উড়িয়া-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কোন পদ বা তাঁহার কোন প্রসঙ্গ পাইলে যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্তৎ-বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইতে বিস্মৃত না হন। কিন্তু আমাদের আবেদনে কোন ফল হয় নাই। একথা অবিসম্বাদী সত্য যে উড়িয়া-সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। মহাপ্রভুর জীবন-কথা সংকলন করিতে হইলে উড়িয়া-সাহিত্যের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা যে কত, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ভরসা করি—কটক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-শাখার সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ মহোদয় তাঁহার তরুণ সহকর্ম্মিগণকে লইয়া এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

আমাদের সংগৃহীত পদগুলির কয়েকটি "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত, বাকী সমস্ত পদেই "চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে। ভণিতার দিক্ দিয়া পদগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই রচিত বলিতে হয়। কিন্তু রায়সাহেব মহান্তী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে উড়িষ্যায় কেহ কেহ আজিও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের ভণিতা দিয়া পদ রচনা করে। এ কথা সত্য হইলে অবস্থা ভীষণ বলিতে হইবে। এই পদ কয়েকটির প্রাপ্তিস্থান কোথায়, মূলগ্রন্থ কত দিনের পুরাতন, গ্রন্থের অধিকারীর বংশ-পরিচয় (অর্থাৎ শাক্ত বা বৈষ্ণব) এবং প্রকৃতি কিরূপ, রায়সাহেব কি সূত্রে এই পদগুলির সংবাদ প্রথম জানিতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি পরে আমাকে বিস্তারিতভাবে জানাইবেন বলিয়াছেন। সে কথা পুনরায় সবিনয়ে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সংগৃহীত পদগুলির মাঝে মাঝে উড়িয়া শব্দ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি রহিয়াছে। উড়িয়া-ভাষাবিদ্ পদাবলীপ্রিয় সাহিত্যিক কেহ এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইলে উপকৃত হইব। পদগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

সায়ংকাল গেল প্রদোষ হইল
ভোজন সারিল কাহ্নাঞি (কান)
তাম্বুল যোগান করিয়া বহন
কৈল পালঙ্কে শয়ান ॥
রাধা গুণ গান সদা মনে ধ্যান
অনুক্ষণে বলে রাধা ।
ছন ছন মন আকুল পরাণ
নয়ানে না আসে নিদ্রা ॥
সঙ্কেতের কথা হেজি (ভাবি) কালা কাহ্ন
চিত্তে নাই আর সুখ ।
অট্টালিকা পরে জাগিছিল রাই
তেঁহ মনে বড় দুখ ॥
কর কমলকে জোড়ি করি রাই
নয়ানে সম্পাদি জল ।
সে কথা সুমরি নাগর শ্রীহরি
কামে তনু ক্ষীণ কৈল ॥
নিশি বারদণ্ড বুঝিয়া নাগর
বোলে এ সঙ্কেত বেলা ।
চণ্ডীদাস বোলে চল এহি কালে
বানায়্যা সুবেশ মালা ॥

(২)

নির্জ্জন দেখিয়া কালা বানাইল বেশ ।
নানা বেশে বান্ধে চূড়া মনেতে হরষ ॥
আগে পাছে ডোলে ঝুম্পা ভূমিতে লোটায় ।
বহি পিচ্ছ বর চূড়া বামেতে ডোলায় ॥
তারপরে শোভে মাল সেমতি পাখুড়ি (সেউতি পাপড়ি)
যুবতী কে বর্ত্তি যাব দেখি তা মাধুরী ॥
(অঙ্গুলী অঙ্গতে কাল পুরিয়াছে পায় ?)
একেত রঙ্গিয়া নাগর যুবতী ভুলায় ॥
অগুরু চন্দন আর গায়েতে লেপিল ।
মৃগ মদ * * লঞা ললাটে লিখিল ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল মালি দুকরে কঙ্কণ ।
পয়রে (পায়েতে) নুপুর খঞ্জি চলে রুনু ঝুন ॥
পীত দুকুলের ঝটা কি কহিতে পারি ।
নবীন ঘনেতে কিবা জড়িত বিজুরী ॥
শ্রীবিম্ব অধরে করে তাম্বুল চর্ব্বণ ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর চলহে গহন ॥

(৩)

বাহিরিল শ্যাম নাগর রাধা নাম স্মরি ।
স-ধীরে গমন করে বামেতে বাঁশরী ॥
ইতি উতি চাহে শ্যাম কোই নাহি আর ।
বৃন্দা বিপিনেতে চলে সে নাগর বর ॥
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে নীলমণি ।
কুথানে ভেটিব আমার রাই বিনোদিনী ॥
আমাকে চাহিঞা বসিথিবে রসময়ী ।
অতেক ভাবিয়া নাগর সত্বরে চলই ॥
মদনের কুঞ্জে তবে সঙ্কেতের স্থান ।
তথা প্রবেশিল গিঞা মুরলী বদন ॥
দেখিল নাগর রায় ধনী নাই আর ।
বিরসিত মন হঞা বসে পালঙ্কের ॥
বিচারয়ে অথনে আসিবে গুণমণি ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর না কর ভাবনি ॥

(৪)

পালঙ্কে বসিঞা চাহিঞা চাহিঞা
ধনী না আইলে কেনে ।
খনে উঠে খনে ইতি উতি চাই
রাই নাচে দুনয়নে ॥
বহু বেলা হৈল রাধে না আইল
কাতরে বসেন শ্যাম ।
ভাবে পুন অবে অখনি আসিবে
সঙ্গে লঞা সখীগণ ॥
কুসুম পালঙ্ক পরে শ্যাম বঁধু
বসিঞা গাঁথয়ে মালা ।
অত যতনেরে মালা গাহা করে
পইরাইব ধনী গলা ॥
সুবাস চন্দন রাইর ভূষণ
আভরণ যত আর ।
রাইরে পরাব সুখে কাল নিব
এমনি ভাবি নাগর ॥
রাই না দেখিঞা আকুলিত হঞা
কাম জ্বলে অতিশয় ।
চণ্ডীদাস বলে অবে কি করব
না আইল ধনী রাই ॥

(৫)

কুসুম পালঙ্ক তেজিয়া শ্যাম ।
রাই প্রেম হেজি (ভাবি) করে গমন ॥
আহা রসময়, প্রেমের তরী ।
কি লাগি না আসে নবীনা গোরী ॥
পথ নিবারই নবীন ভান (?)
একা রাধা বিনা অথয়ে প্রাণ ।

কোন দিগু ধনী আসে কি চাহে ।
ছন ছন চিত্ত সে শ্যাম রায়ে ॥
চণ্ডীদাস বলে মদনে ভুর ।
একা রাই বিনা মন আকুল ॥

(৬)

বিরহ অনল তাপেতে মাধব
এদিকে সেদিকে চাহে ।
যত তরুগণ লতাদি কানন
রাধা রূপ দিশে তাহে ॥
ঝিকারির (ঝিল্লী ?) স্বন শুনিতে দিগুণ
জ্বলয়ে তাহার গায় ।
বোলে কিবা বিধু বদনী সে ধনী
তরাবার * * লা'য় ॥
সেদিকে নয়ন ফিরাইল কান
সেদিকে রাইর রূপ ।
চিত্র প্রতিমার প্রায় দৃষ্ট হয়
রসময়ীর স্বরূপ ॥
ক্ষণেকে নাগর হইয়া সুস্থির
মিলিল মাধবীতলা ।
ভ্রমরর ধ্বনি শুনি নীলমণি
বলে অবে রাই আইলা ॥
চাহে চৌদিকে কোই নাহি আগে
আর তে খোঁজে মোহন ।
রাই পদচিহ্ন দেখিয়া দুখানি
নিহারয়ে বসি পুন ॥
চিহ্ন পদধূলি অঙ্গে লয়ে বুলি
লাগিল কিবা শীতল ।
ধনী রসময়, ধনী প্রাণ বন্ধু
তুমি আমার কণ্ঠমাল ॥
বিরহ অনল তাপেতে মাধব
খোঁজে বিপিনহি তথা ।
চণ্ডীদাস বোলে অবে কি করব
সে ধনী পায়ব কোথা ॥

(৭)

রাইরূপ মনসিরা বুলে বন বন ।
কিবা কোথা লুচি (কি) য়াছে মোর প্রাণধন ॥
কামে থরহর নাগর চলিতে না পারে ।
রাধাকুণ্ড তীরে থাকি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথানে আছ গো ধনি দিও আমারে দেখা ।
অনুক্ষণে ডাকে শ্যাম রাধিকা রাধিকা ॥
দুনয়ানে বহে বারি রাইরূপ চিন্তি ।
রাই না দেখিয়া শ্যাম ধৈর্য্য না ধরন্তি ॥
ধৈর্য্য না ধরে শ্যাম বলে হাই হাই ।
চণ্ডীদাস বলে কিবা বিহিল এ বিহি ॥

(৮)

নিরবধি ঝুরে সে শ্যাম নাগরে
রাধারে করে বিলাপ ।
জিহ্বা অগ্রে নাম নেত্র অগ্রে ধ্যান
ভজিল সকলি আপ ॥
সো ধনীর কীর্ত্তি শুনাই শ্রবণে
ঘুচাবে কে ব্যথা মোর ।
মন ধ্যানে তনু লাগিঞা রহল
কে আনি দিবে তৎপর ॥
বিধু জিতাননী মুকুল রদনী
আমার হিত প্রাণ-মিত ।
আরে বিম্বাধরী সুকনক গোরী ॥
গলি মোএ বিসরিত ॥
পশু মৃগগণ তরু লতাবন
গউর বরণ দিশে ।
মনমথ বাণ তাপে নীলমণি
সচকিত হঞা বসে ॥
ভাবিতে ভাবিতে সে নাগর রায়
ভূমে অচেত পড়ল ।
চণ্ডীদাস বোলে ধনী না আইলে
কিবা সে প্রমাদ ভেল ॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ দশা বর্ণনা করিয়া কবি অতঃপর শ্রীরাধার কথা বলিতেছেন ।

(৯)

জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী
শুন গো পরাণ সহচরি ।
কৃষ্ণ আমার পরাণ তারে করি সদা ধ্যান
অবে আমি কেমনে কি করি ॥
আজু আমি তার মুখ হেজি পাইলই দুখ
শাশু যবে করয়ে ভৎর্সনা ।
অপবাদ দিঞা মোরে নানা কুভৎর্সনা করে
সদা হেরি নন্দপোয়ে কাহ্না ॥
যে বলে সে বলু মোরে না ছাড়িব সে নাগরে
সে কালা মো পরাণের মিত ।
জাতিকুল যাব পিছে থিবি (থাকিব) তার কাছে কাছে
আর মোরে সবহি অচিত ॥

চল সহচরি অবে কুথা আছে সে মাধবে
সঙ্কেত লই আবাহন ।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে কোথা আছে শ্যামরায়ে
হেরি আস মদনমোহন ॥

(১০)

শুনি দূতী বোলে শুন শুন ওগো ধনি ।
তোমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ মিলাইব আনি ॥
রাইকে প্রবোধি সহচরী চলি গেলা ।
কোথা আছে শ্যামরায়ে খুঁজিতে লাগিলা ॥
প্রতি কুঞ্জে হেরি হেরি না পাইল শ্যাম ।
তথাপি চলিল দূতী শ্যামকুণ্ড ধাম ॥
সেখানে না দেখি দূতী রাধাকুণ্ডে চলে ।
দেখিল শ্যাম নাগর শূতে ভূমিতলে ॥
কৃষ্ণকে দেখিল দূতী বিরহ হৈয়াছে ।
শয্যা ত্যজি নটবর ভূমিতে পড়িছে ॥
কৃষ্ণ দশা দেখি দূতী আকুল হৈল ।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ কর্ণে ফুকারিল ॥
রাই নাম শুনি শ্যাম নয়ানে চাহিল ।
চণ্ডীদাস বোলে শ্যাম চেতনা পাইল ॥

(১১)

দূতী রূপ হেরি চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল ।
বিরহ অনল তাপরে পুড়িছে
পরাণ রাখ কেবল ॥
শুন অগো ধনি আমার যে বাণী
তোমার লাগিঞা এথা ।
তোমা না দেখিঞা জ্বলই অন্তর
পাইনু এমনি ব্যথা ॥
কি কারণে সই অত দশা (দুঃখ) দিল
দশ দিগ দিশে শূন্য ।
তোমারে না পেঞা অতি দুখী হঞা
পিণ্ডে (দেহে) না রহে পরাণ ॥
অত বলি শ্যাম রাই বলি করে
বসন বিভরণ কৈল ।
অলকা টুটিল কবরী খসিল
অধরে অধর দিল ॥
সহচরী বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল ।
সঙ্কুচিত হঞা প্রিয় সহচরী
শ্যাম বাস পহিরল ॥

প্রেমর বিভলে বদন পালট
দুঁহা না পারল বারি (চিনিতে)
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে সহচরী
শুনহে মুরলী ধারি ॥
বুঝিঞা সঙ্কেত কহিঞা ত্বরিত
সে নব রসিক রাজে ।
শুনি শ্যাম তুনি আন গুণমণি
এহি মনোহর কুঞ্জে ॥
শুনিঞা ভারতী শীঘ্র যায় দূতী
মিলিল কিশোরী পাশ ।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে পাদে পড়ি
বোলে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

শ্রীরাধিকার দূতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া শৈব্যা ও পদ্মা গিয়া চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রাবলীকে জানিয়া কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর মিলন ঘটাইয়া দিল ।

(১২)

একালে সঙ্কেত পুছিয়া ত্বরিত
প্রাণ সহচরী গিল ।
লতাতলে লুচি (লুকাইয়া) চন্দ্রাবলী সখী
শৈব্যা পদ্মা শুনিঠিল ॥ (শুনিয়াছিল)
সেহি খরতরে যাইঞা সত্বরে
মিলি চন্দ্রাবলী পাশে ।
এসব বিধান কহিঞা বহন
অনাইল কুঞ্জ দেশে ॥
খণ্ড দেশ শুনি নুপূরের ধ্বনি
শ্রুতি মুখে শ্যামরাজে ।
বিচারই চিত্তে জানি আমার দুখ
রসনিধি (রাধা) কৈলো বিজে ॥ (বিজয়, আগমন)
অতক ভাবিঞা কুঞ্জ ত্যজি হরি
সত্বর পাছুটী গেল ।
ঘোর আন্ধারেতে বারি না পারিতে
ধাঞি কোলাগ্রত কৈল ॥
বোলে চন্দ্রাবলী শুন বনমালী
কি কারণে ফির বনে ।
নীলমণি ভাযে তোমারি উদ্দেশে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(১৩)

অত শুনি চন্দ্রাবলী আনন্দিত হৈঞা ।
শ্যাম কর ধরি চলে সখীগণ লঞা ॥

আপনার কুঞ্জতরে প্রবেশ হইল ।
কুসুম পালঙ্কে দুঁহা আনন্দে বসিল ॥
জানি সখী শৈব্যা পদ্মা অন্তর হৈতে ।
যার যেই কুঞ্জে গিয়া রহিল জাগ্রতে ॥
একে হাস পরিহাস কৌতুক বচন ।
প্রেমোন্মদে মত্ত প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন ॥
দুইজনে লীলা করে আনন্দিত মনে ।
চণ্ডীদাস বোলে কালা পড়িল বিষমে ॥

দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী-মিলনের পদের সঙ্গে ইহার ঐক্য নাই । দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী "এই পথে নিতি কর গতাগতি নুপূরের ধ্বনি শুনি" এই বলিয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিলে, তিনি শ্রীদাম ডাকিতেছে এইরূপ ছল করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু পলাইতে না পারিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি-যাপন করিতে বাধ্য হন এবং প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে দর্শন দিলে তিনি অভিমান-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন । আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলির শেষাংশ না থাকায় শ্রীরাধার মানপ্রকরণ জানিতে পারি নাই ।

আলোচ্য পদের ন্যায় দূতীর সহিত কৃষ্ণের মিলন দীন-চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায় না । শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনায় উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণ করিয়াছেন । উজ্জ্বলনীলমণিতে দূতীর লক্ষণ কথিত হইয়াছে—

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি ।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতীস্যাদ্গোপ সুভ্রুবাং ॥

যে অতিশয় স্নেহশীলা, বাক্যপ্রয়োগনিপুণা এবং প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করে না, ব্রজবধূগণের দৌত্যকার্য্যে সেই একমাত্র যোগ্যা । পদাবলী-সাহিত্যে এইরূপ দূতীই দেখিতে পাই । অবশ্য সখীগণকে অভিসার করাইয়া শ্রীরাধা আনন্দ লাভ করেন বটে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য-পদে তাহার আভাস পর্য্যন্ত নাই । কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—(মধ্য, অষ্টম পরি)

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন ।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় সখীর নাহি মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায় ।
নিজ সুখ হৈতে তাহে অধিক সুখ পায় ॥

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা ।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাতা ॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয় ॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন ।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায় ॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট ।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম ।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥

দূতী এবং সখীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে । আমরা পদাবলী হইতে কবিরাজ গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ তুলিয়া দিলাম ।

ঋতু-পতি রাতি বিরহ জ্বরে জাগরি দোতি উপেখলি রামা ।
প্রিয় সহচরি বলি মোহে পাঠায়লি অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা ॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহল মো তোয় ।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে নিমিযে না হেরবি মোয় ॥
দূর কর আলস আনহি লালস চাতুরী বচন বিভঙ্গ
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ ।
যাহে শির সোঁপি কোরপর শূতিয়ে সো যদি করু বিপরীতে ।
পিরিতি করীত ঐছে তব মীটব গোবিন্দদাস চিত ভীতে ॥

পদটি উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোক্ত শ্লোকের ভাবানুবাদ—

দূত্যে নাস্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্প ধনুর্ভয়ঙ্কর মমুং ভ্রূগুচ্ছমুদ্যচ্ছসি ।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
নত্বেতামসমাপিত প্রিয় সখী কৃত্যানুবন্ধাং তনুম্ ॥
(সখীপ্রকরণ, ৩৯ শ্লোক)

উজ্জ্বলনীলমণি বলিতেছেন—

দূত্যং তু কুর্ব্বতী সখ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা ।
কৃষ্ণেন প্রার্থ্যমানাপি স্যাৎ কদাপি ন সম্মতা ॥
(সখী প্রকরণ)

সখী যদি দৌত্যকার্য্যে আসিয়া নির্জ্জন প্রদেশে মিলিতা হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সুরত প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কদাপি তাহাতে সম্মতা হন না ।

আমাদের আলোচ্য পদে দূতী গিয়া অতঃপর শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন ।

(১৪)

চিনি সহচরী বলো গো কিশোরি
তোমা বিনে শ্যামরায়।
বিরহ দুখেতে কানন ফিরিতে
তোমার আগমন ধ্যায়॥
মদন রাজন করিছে কর্দ্দন
শ্রীঅঙ্গে আভাষ নাই।
একালে তোমারি সঙ্কেত লইয়া
মিলিলাম আমি যাই॥
আমার বদনে তোমার দশা শুনি
দ্বিগুণ বিচেষ্ট হৈল।
হৃদে কর মারি আহা বন্ধু বলি
বিধি এহা শুনাইল॥
ধরিয়া মো কর বোইল নাগর
মো যাইতে শকি (শক্তি) নাই।
নিবেদন মোর এহি মনোহর
কুঞ্জে আন রসময়ই॥
এমনি সঙ্কেত কহি প্রাণমাথ
বসি নিরখয়ে পথ।
কাম মনোহর বেশে তার পাশে
চল লঞা সখীযুথ॥
রতি সুখ এই সংসারের সার
বিলম্ব না কর ইথে।
চণ্ডীদাস বোলে শুনি কহে ধনী
দূতীরূপ হেরি নেত্রে॥

(১৫)

রাই বলে শুন এগো প্রাণ সহচরি।
আজ একু অপরূপ রীতি গো তোমারি॥
খরতর নিঃশ্বাসত বহিছে সত্বরে।
সত্য কহ কপট না রাখিয়া অন্তরে॥
দূতী কহে শুন রাধে আসিবার তরে।
সেহি লাগি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরে॥
অধরত শুখিয়াছে শুন গো দূতিকে।
দন্তে তৃণ লইয়া জাত বিনয়ি কহিতে॥
কেমনেতে ভ্রষ্ট হৈছে তোমার অলকা।
তোমার লাগি কৃষ্ণপদে পড়িল রাধিকা॥
বেশ কেমনে মলিন হয়ে সহচরি।
ঝটিতি আসিবা তরে সব গেল ফিরি॥
কৃষ্ণের পিন্ধিবা বাস কেমনে পিন্ধিল।
দূতী বলে তোমার খানে সঙ্কেত আনিল॥
সঙ্কেত দেখিয়া ধনী আনন্দ হৈল।
চণ্ডীদাস বলে বহু সুখ সে পাইল॥

(১৬)

শ্যামের সন্দেশ পাঞা মনে আনন্দিত হঞা
সুবেশ হইলা ধনী রাধে।
চিরণী ধরিঞা করে কেশ বিরলিঞা ধীরে
কুন্তল কবরী বামে বাঁধে॥
কনক মুকুর ধরি কপালে চন্দন চারি
সিন্দুরের বিন্দু তার মাঝে।
নয়নে কজ্জল দিল নাসারে মুকুতা ফল
কনক তাটঙ্ক গণ্ডে সাজে॥
হস্তে নানা রত্ন চুড়ি তাহে বাজুবন্ধ ভড়ি
অঙ্গুলরে মুদ্রিকা বিরাজে।
নানা রতনের ঝিলি দিশই কি শোভা বলি
নখ পংক্তি আদরশ গঞ্জে॥
কণ্ঠে কণ্ঠ মালভরি আর লম্বে উরসরি (?)
রূপে নাহি আর তুলিবারে।
কনক ফুচ উপরে নীল কাঞ্চলি পহিরে
তাহে দিল মুকুতার হারে॥
নীলধটী শোভে কটী তাহে বান্ধে সোনাকণ্ঠী
পায় দিল কনক নুপুর।
ললিতা ভাঙ্গি তাম্বুল শ্রীমুখেতে সোপাইল
কুঞ্জে যাইতে উদ্বেগ মনর॥
সব আভরণভরি দাণ্ডাইল সুন্দরী
ঘেনি (?) লীলা কমল মঞ্জরী।
বৃন্দাবন যাপাইল (?) মনোহর কুঞ্জে গেল
চণ্ডীদাস যাও বলিহারি॥

(১৭)

মনোহর কুঞ্জে রাই যাইঞা প্রবেশিল।
সব সখী লইঞা ধনী পালঙ্কে বসিল॥
কুঞ্জেতে রহিল রাই শ্যামের আবেশে।
মাণিকের দীপাবলী জ্বলে চৌপাশে॥
কান্তে মিলিবারে ধনী হইল উল্লাসে।
নানা পুষ্পমালা তবে শয্যাতে বিলাসে॥
নানা বেশভূষা রাই সখীর সহিতে।
কান্ত আগমন ভাবি রহিল সুচিতে॥
এ ঠারু এখানে অভিসারিকা হইলাক শেষ।
এ অন্তে বাসক সজ্জা কহে চণ্ডীদাস॥

(১৮)

কৃষ্ণের সঙ্কেতে রাই কুঞ্জেতে রহিল।
বহু রাত্র হৈল তবে শ্যাম না আইল॥

শুন প্রাণ দূতী অবে কি কহব ভলে।
সঙ্কেত করিয়া নাগর কোন্‌খানে গলে॥
নক্তকাল হৈল কৃষ্ণ কেন না আইল।
কুন্ নাগরী ফান্দে নাগর ভুলিঞা রহিল॥
অত কহি রাই মনে আকুলিত হএ॥
চণ্ডীদাস বোলে রাই বহু দুঃখ পাএ॥

(১৯)

শুনগো পরাণ দূতি অবে কি করব।
কালা যদি না আইল নিশ্চয় মরব॥
এ বেশ ভূষণ আমি না রাখিব গাএ।
যদি না পাই অব শ্যাম হত্যা দিব তাএ॥
তাহার মিলিবা আশে সেজাইলুঁ শেজ।
অবে কেন না আইল সে নাগর রাজ॥
জানিলুঁ জানিলুঁ সখি সে শঠ পিরীতি।
আমাকে কহিঞা গিল কোন্ নাগরী কতি॥ (কাছে?)
সে কালিয়া চান্দ সঙ্গে যে পিরীতি কএ।
চণ্ডীদাস বোলে সখি অত দশা দিএ॥

(২০)

কুন রসবতী প্রেমরসে মাতি
ভুলাই নিল শ্যামরে।
আমি না জানিল কুন হরি নিল
বিধি বাম হৈল মোরে॥
সে রসিয়া নারী রসের চাতুরী
রসিল মোহন মনে।
রসে পরিচার রসে নিশাথর (?)
অসর নাহি কখনে॥
বিবিধ বিনোদে নিশি পোহাইব
প্রেমরসে মাতি মনে।
বাহু আলিঙ্গিয়া অধর চুম্বিঞা
লগালগি দুইজনে॥
অতি যতনরে কুসুম পালঙ্কে
হংস তুলি বিছাইঞা।
জাতি যুথী মালি বকুল মালরি
নিকুঞ্জ থিব মণ্ডিঞা॥ (?)
কমলে ভ্রমর চুম্বিঞা মধুর
হএ সখি যেন সুখী।
চণ্ডীদাস বোলে কালার পিরীতি
যে করে সে হএ দুখী॥

(২১)

নব ঘনশ্যাম রিলম্ব দেখিঞা
বিলাপ করই রাধা।
দূতী মুখ হেরি নেত্রে বহে বারি
কহে লভি কামবাধা॥
কুথা গিল নাথ করিঞা অনাথ
আমি অবে কি করব।
এ চাঁদ নিশীথে বন্ধু রৈলা পথে
কেনে পরাণ ধরব॥
দেখ ফুলবনে মাতি মধুপানে
মধুকর করে কেলি।
মাতোয়াল হঞা ঝঙ্কার করএ
বিরহী বধিব বলি॥
নন্দসুত বাণী বজ্রাঘাত জানি
কানে পশি প্রাণ হরে।
মলয় পবন বহে ঘনেঘন
বিরহী বধিবা তরে।
একালে একান্ত হয়ে আমি কান্ত
মুখপদ্ম না দেখিল।
মনোহর কুঞ্জে নানা পুষ্প পুঞ্জে
শেজ সেজাইয়া ছিল॥
মল্লিকা কুসুমে অতি মনোরমে
সেজাইল সুপতি শেজ।
তথিপরি পীত পতনি পকাই
সিঞ্চিল কস্তুরী রজ॥

ইহার পর দুই ছত্রের পাঠোদ্ধার হয় নাই এবং এইখান হইতেই পুঁথিখানি খণ্ডিত। যে দুই একজন ব্যক্তি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দোহাই দিয়া পদাবলীর আলোচনায় নাম কিনিবার চেষ্টায় আছেন, বাহিরের খোসামাত্র লইয়াই তাঁহাদের কারবার। পদাবলী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বোধ নাই, তথাপি কথা কহিবারও চেষ্টার ত্রুটি নাই। পদের ভণিতা মাত্র যাহাদের আলোচনার সম্বল, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের নহে। এগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসেরও রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। রচনা তৃতীয় শ্রেণীর, মিলের দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ হয়। মিলের দোষ, ছন্দপতন, ভাষার অস্পষ্টতা—এ সমস্ত লিপিকর প্রমাদ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের

মনে হয় চণ্ডীদাসের নাম লইয়া ইহা কোন উড়িষ্যানিবাসী বাঙ্গালী কবির কিম্বা বাঙ্গালা জানা উড়িয়া কবির রচনা। উড়িষ্যার যে দশা, বাঙ্গালারও সেই দশা। এদেশেও যে কত ভেজাল চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কবির পদ আর এক কবির নামে চলিতেছে, অনেক পদের ভণিতা লোপ পাইয়াছে। আবার নানা সময়ে নানা জনে চণ্ডীদাসের নামে নানা রকমের পদ লিখিয়া চালাইয়া দিয়াছে। যাঁহারা পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহারা উদ্ধৃত পদগুলির সঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিচার করিলে অনুগৃহীত হইব।

চণ্ডীদাস ভণিতার আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সেবার কটকে মহান্তী মহাশয়ের নিকট পদ সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভুবনেশ্বরে যাই। তথায় কোন মন্দিরে কয়েকজন কীর্ত্তনীয়া গান করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই পদটি সংগ্রহ করি। কীর্ত্তনীয়া দুইজনের নাম লিখিয়া লইয়াছিলাম—শ্রীনাথ সুবুদ্ধি ও ভীম মহাপাত্র, নিবাস ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নোয়াগাঁ। এই পদটি হইতেও বুঝা যাইবে যে ভুবনেশ্বরে বা কটকে বা পুরীতে—এককথায় উড়িষ্যায় চণ্ডীদাসের নামে কিরূপ পদ প্রচলিত রহিয়াছে।

মদনমোহন	পীতবসন	বঙ্কিম বনচারী।
কেশীমথন	মদনমোহন	আর্ত্তত্রাণ দৈত্যারি॥
নবীন কপালে	নবীন চাঁদ	নবীন নবীন সাজে।
নবীন অধরে	নবীন বাঁশরী	নবীন নবীন বাজে॥
নবীন গলায়	নবীন মালা	নবীন নবীন দুলে।
কোন্ বিনোদিনী	এ মালা গেঁথেছে	নবীন নবীন ফুলে॥
নবীন কটীতে	নবীন ধটী	নবীন নবীন সাজে।
নবীন পএর	নবীন নূপুর	নবীন নবীন বাজে॥
কহে চণ্ডীদাস	নবীন নাগর	নবীন কদম্ব মূলে।
এরূপ হেরিয়া	কোন বিনোদিনী	পরাণ ধরিতে পারে॥

বরোদা ও গায়কবাড়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজার শাসনকাল ৬০ বৎসর পূর্ণ হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে বরোদা রাজ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং মহারাজা কেবল উৎসবেই এই স্মরণীয় ব্যাপার শেষ হইতে দেন নাই, পরন্তু দরিদ্র ও অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার জন্য ১ কোটি টাকা ন্যাসরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আজ হইতে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে—মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত এই গায়কবাড়ের বিবরণ এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিত্রকর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই চিত্রকরের নাম—ভ্যাল প্রিন্সেপ। প্রিন্সেপ পরিবারের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও বহুদিনের। তাঁহার প্রপিতামহ যখন এ দেশে আইসেন তখন তাঁহার পিতা—খৃষ্টধর্ম্ম যাজককে তাঁহার কোন বন্ধু এ দেশ হইতে লিখিয়াছিলেন—তিনি যেন পুত্রকে ভারতবর্ষে প্রেরণ না করেন—কারণ, "ক্লাইব স্বয়ং শয়তান"। কিন্তু পুত্র এ দেশে আসিয়া লাভবান হয়েন। তাঁহার পর একই সময়ে ঐ পরিবারের ৭জন ভারতবর্ষে নানা কার্য্যে রত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জনের স্মৃতি কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে রক্ষিত হইতেছে। ইনিই অশোকের শিক্ষালিপির পাঠোদ্ধার করেন এবং এ দেশের প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন তখন দিল্লীতে যে দরবার হয়, সাম্রাজ্ঞীর জন্য তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে ভ্যাল প্রিন্সেপ ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া জন্মভূমি ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ চিত্রে রাজন্যগণের প্রতিকৃতি প্রদানার্থ তিনি রাজন্যগণের চিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাহাতে রাজন্যগণের নিকট হইতেও তাঁহার "প্রাপ্তি" অল্প হয় নাই। নৌশারীতে যাইয়া তিনি যে কেবল তরুণ গায়কবাড়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী যমুনা বাঈয়ের ও তাঁহার দুহিতার চিত্রও অঙ্কিত করেন। এই শিল্পী এ দেশে অবস্থান-

কালে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা চিত্রে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। বরোদার গায়কবাড়ের ও বরোদার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক—চিত্রেরই মন মনোজ্ঞ। সেই বিবরণের আরম্ভে তিনি লিখেন :—

"আমি এই স্থানে (নৌসারীতে) উপস্থিত হইবার পর প্রাতে ৮টার সময় গায়কবাড় তাঁহার চিত্রাঙ্কন জন্য আসিলেন। ইনি ভবিষ্যতে বার্ষিক ১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আয়ের অধিকারী। দুই বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক জন অতি সাধারণ পল্লীবালক মাত্র ছিলেন। গায়কবাড় কুণ্ডী রাওয়ের বিধবা যমুনা বাঈ দত্তক গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে

মহারাণী যমুনা বাঈএর কন্যা তারাবাঈ

৩টি বালককে আনা হয়, সেই বালকত্রয়ের মধ্যে তিনি ইঁহাকেই গ্রহণ করেন।"

ইহার পর তিনি এই দত্তক গ্রহণের কারণ বিবৃত করেন। তিনি লিখিয়াছেন—যমুনা বাঈ সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুহিতা এবং অসাধারণ সুন্দরী বলিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কুণ্ডী রাওয়ের সহিত বিবাহিতা হয়েন। স্বামী ইঁহাকে যেমন আদর করিতেন, তেমনই প্রহারও যে করিতেন না, এমন নহে। অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী যে গর্ভবতী তাহার সন্ধান না লইয়াই বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে রেসিডেণ্ট কুণ্ডী রাওয়ের ভ্রাতা মলহর রাওকে গায়কবাড় ঘোষণা করেন। এই ব্যক্তি অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিল এবং অগ্রজকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করায় কারাগারে রুদ্ধ হয়। মলহর রাও ৯ বৎসর কারাগারে বন্দী থাকিবার পর রেসিডেণ্টের কথায় তাহাকে মুক্তি দিয়া সন্ন্যাসীর দলে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা

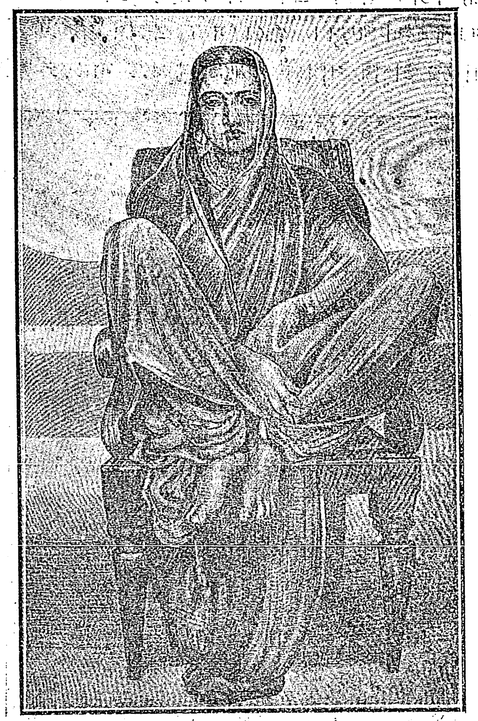

মহারাণী যমুনা বাঈ

হয়। এই সময় তিনি যখন রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া যানে বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং সাক্ষাৎ শেষ হইলেই আবার বস্ত্র ত্যাগ করিতেন। কয় বৎসর সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি গায়কবাড় হইয়া যখন শুনিলেন, যমুনা বাঈ সন্তান-সম্ভবা এবং তিনি যদি পুত্র প্রসব করেন তবে সে-ই রাজ্য লাভ করিবে, তখন তাঁহার মনোভাব সহজেই অনুমেয়। বিপদের সম্ভাবনা হেতু যমুনা বাঈকে প্রাসাদ হইতে সরাইয়া অন্য গৃহে এক জন ইংরাজ

মহিলার অভিভাবকত্বে রাখা হয়। যাহাতে ভয়ে মহারাণীর সন্তান নষ্ট হয়, সেই আশায় মলহর রাও তাঁহার গৃহের সম্মুখে সেনাদিগের কুচকাওয়াজের ও বড় বড় তোপ দাগিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি যমুনা বাঈকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টাও করেন। স্বামীর মৃত্যুর ৮ মাস পরে যমুনা বাঈ এক কন্যা-সন্তান প্রসব করিলে যখন প্রকাশ করা হয়, তিনি বালক প্রসব করিয়াছেন, তখন মলহর রাও নিরাশ হইয়া পড়েন। শেষে সত্য প্রকাশ পাইলে তিনি আনন্দে তাঁহার পাগড়ী লুফিতে লুফিতে নাচিতে আরম্ভ

মহারাজা গাইকবাড় (তরুণ বয়সের চিত্র)

করেন। তিনি মাতা ও পুত্রীকে হত্যার চেষ্টা করিলে যমুনা বাঈ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুণায় গমন করেন এবং তথায় বৃটিশ সরকার প্রদত্ত মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া বাস করিতে থাকেন।

প্রিন্সেপ তাঁহার দুহিতা ৪।৫ বৎসর বয়স্কা তারাবাঈএরও চিত্র অঙ্কিত করেন। সে-ও যে গায়কবাড় নহে তাহা সে বিশ্বাস করিত না; সেই জন্য পুরুষের মত বেশ পরিধান করিত ও গায়কবাড় যখন অশ্বারোহণে আসিতেন তখন সেও পুরুষের মতই অশ্বারোহণে আসিত।

মলহর রাও রেসিডেণ্টকে পানীয়ের সহিত হীরকচূর্ণ দিয়া হত্যার চেষ্টা করিয়া রাজ্যচ্যুত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে তিনি কোন নিম্নবর্ণের লোকের স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রেসিডেণ্টের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে যখন দত্তক গ্রহণের প্রয়োজন হইল, তখন মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিভোগী মহারাণী যমুনা বাঈকে পুণা হইতে বরোদায় আনিতে হইল এবং তিনিই বর্ত্তমান গায়কবাড়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি প্রাসাদে সর্ব্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করেন এবং যখনই কোথাও গমন করেন, তখন ভৃত্যবর্গ উচ্চস্বরে বলে—"মহারাণী সাহেবার সুখ ও সম্পদ হউক"—"ভগবান মহারাণীর কল্যাণ করুন।"

ভ্যাল প্রিন্সেপ মহারাণী যমুনা বাঈএর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

"পৌঁছিবার দিন অপরাহ্নে আমি মহারাণীর নিকট নীত হইলাম। আমরা যে বৃহদায়তন কক্ষে নীত হইলাম তথায় তিনি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়, তন্বী ও এখনও অসাধারণ সুন্দরী। তাঁহার চক্ষু বিশালায়ত ও সুগঠিত, নাসিকা সরল, মুখমণ্ডল সুগঠিত। তাম্বুল চর্ব্বণে তাঁহার দন্ত রঞ্জিত হইয়াছে এবং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎকালে ও বাক্যালাপ করিবার সময়েও তাঁহার গণ্ডে তাম্বুল রক্ষা হেতু উচ্চতা লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার পরিধানে যে গাঢ় নীলবর্ণের সূক্ষ্ম শাড়ী ছিল, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার ত্বকের বর্ণ লক্ষিত হয়। কটির উপর তাঁহার বক্ষের আচ্ছাদন—সোণার জরীর কায করা রক্তবর্ণের কঞ্চুলী। তাঁহার কর ও চরণ অত্যন্ত সুন্দর—যে স্থানে নখ মাংস হইতে বাহির হইয়াছে তথায় হেনার বর্ণে অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কিত। তাঁহার চরণে অঙ্গুষ্ঠে দুইটি ও অন্য অঙ্গুলীতে একটি করিয়া অঙ্গুরী। কিন্তু তিনি রঞ্জনের দ্বারা শোভাবর্দ্ধনচেষ্টা করেন না। তাঁহার নয়নে কজ্জল বা নাসিকায় নাকছাবি নাই। কেবল তাঁহার কপালে, কপোলে ও থুতনীতে একটি করিয়া ফিকা নীলবর্ণের উলকী বিন্দু। তাঁহার অলঙ্কার সুনির্ব্বাচিত—তাহাতে বাহুল্য নাই।"

তিনি যে সুশিক্ষিতা নহেন, তাহার পরিচয় গায়কবাড়ের

চিত্র-সমালোচনায় পাওয়া যায়। মুখের এক পার্শ্বের চিত্র দেখিয়া তিনি বলেন—"একটিমাত্র চক্ষু ও পাগড়ী হইতে বিলম্বিত মুক্তাহারের ২টি মাত্র শ্রেণী দেখান হইয়াছে কেন?" এরূপ চিত্রে তাহাই অঙ্কিত করিতে হয় বলায় মহারাণী বলেন—"সে বিষয় আপনারাই ভাল জানেন।" কিন্তু সে চিত্র যেন তাঁহার মনোমত হয় নাই।

বালক গায়কবাড়ের বর্ণনায় প্রিন্সেপ লিখেন—তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর এবং তিনি মাংসল। প্রথমে তাঁহাকে স্বল্পবুদ্ধি মনে হইলেও তিনি বুদ্ধিমান। তাঁহার যথেষ্ট সঙ্কল্প-দৃঢ়তা ও উদ্যম আছে। তিনি এখনই বেশ ইংরাজী পড়িতে ও ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন। তাঁহার আদর্শ শাসক হইবার সম্ভাবনা।

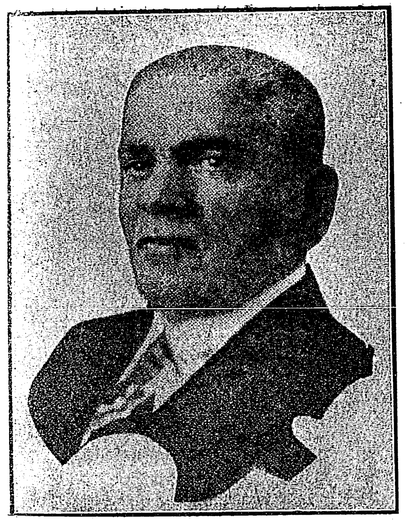

বরোদার গাইকবাড় (বর্ত্তমান ছবি)

তরুণ গায়কবাড় খেলাতেও উৎসাহশীল ছিলেন। শিল্পী তাঁহাকে কুস্তী করিতে দেখিতে গিয়াছিলেন। গায়কবাড়রা কুস্তীর বিশেষ আদর করিতেন এবং মলহর রাও ইহার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রিন্সেপ যখন গায়কবাড়ের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন সার তাঞ্জোর মাধব রাও বরোদার "রিজেণ্ট"। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থায় পালোয়ানদিগের জন্য অর্থব্যয় হ্রাস করা হয়। বিরক্ত হইয়া প্রধান পালোয়ান তখন চাকরী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পালোয়ান তরুণ গায়কবাড়কে কুস্তী শিখাইতেছে। সে যেভাবে গায়কবাড়ের সঙ্গে কুস্তী করিত—যেন গায়কবাড়ের সঙ্গে বল পরীক্ষায় পারিয়া উঠিতেছে না—এমনই ভাব দেখাইত, বালকের দ্বারা পাতিত হইত—তাহা হাস্যোদ্দীপক।

প্রিন্সেপ যে অনুমান করিয়াছিলেন, বালক গায়কবাড় আদর্শ শাসক হইবেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। বালকের যমুনা বাঈএর আনুগত্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, অহল্যা বাঈএর মত বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকিলে তিনি হয়ত শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং তিনি হয়ত গায়কবাড় প্রবর্ত্তিত উন্নতির অন্তরায় হইবেন। সে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। হয়ত যমুনা বাঈএর প্রভাব নানারূপ উন্নতিকর কার্য্যে তাঁহার পুত্রকে উৎসাহিতই করিয়াছিল। কারণ এই মহিলা মলহর রাওয়ের মত পিশাচপ্রকৃতির লোকের অত্যাচার লক্ষ্য ও অনুভব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রতিকূল অবস্থায় যে

বরোদার বর্ত্তমান মহারাণী

শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে। যদি তাঁহার শাসকোচিত গুণ না থাকিয়া থাকে, তথাপি একথা বলা যায় যে, উন্নতির রথচক্রের গতিরোধ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। মাধব রাও গায়কবাড়ের নাবালক অবস্থায় রাজ্যে নানা সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া উন্নতির পথ সুগম ও প্রশস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। গায়কবাড় সেই পথে জয়যাত্রা করিয়া আদর্শ শাসকের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

গায়কবাড়ের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার প্রজাদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে সত্যই বলা হইয়াছে :—

"আপনি অগ্রণী হইয়া রাজ্যে বহুদূর-প্রসারী ফলপ্রদ শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধীয় সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, জনগণের জন্য বিনাব্যয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপায়, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন, প্রাচ্য বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহ দান, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের সংস্কার, ধর্ম্ম ও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিধি, অনাবশ্যক ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা বর্জ্জন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকলে কেবল যে আপনার প্রজারাই মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু অন্যান্য স্থানেও বরোদার ব্যবস্থা অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।"

গায়কবাড় নানা প্রদেশ হইতে উপযুক্ত লোককে তাঁহার রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালী রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎসব উপলক্ষে গায়কবাড় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রজার জন্য তাঁহার স্নেহের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—তিনি প্রজার—বিশেষ দরিদ্র ও অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতিসাধন জন্য ১ কোটি টাকা ন্যাসরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সাধারণতঃ এই সব কার্য্যে তাঁহার সরকার যে অর্থপ্রযুক্ত করিবেন, ইহা হইতে তাহাতে আরও অর্থ যুক্ত হইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যসম্পাদনে সাহায্য করিবে।

তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা অবগত আছেন, গত ৫৫ বৎসরকাল আমি পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আর কোন কাযই আমার এত মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। গ্রাম্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই আমার উদ্দেশ্য। আমার প্রজারা জীবনযাত্রাপদ্ধতির উন্নতিসাধন করিবে—উন্নত পদ্ধতিতে জীবনযাপনের সঙ্কল্প করিবে—স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিবে—ইহাই আমার অভিপ্রেত। যাহাতে গ্রাম্যজীবন আকর্ষক হয়—কৃষিকার্য্য লাভজনক হইয়া সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে—তাহাই আমি দেখিতে চাহি।"

অর্ঘ্য

শ্রীনীরদবরণ—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

কবে বল্‌ব শুধু তোমার কথা
গাইব তোমার গান ?
তোমার প্রেমের সুধাধারায়
সিক্ত হবে প্রাণ!
তোমার মৃদুল পরশ লাগি'
চিত্ত আমার রইবে জাগি'
সকল রাত্রিদিন,
তোমার অমল অরুণ হাসি
আমার দুঃখ-আঁধার নাশি'
করবে বাধাহীন
শুক্ল রাতের স্নিগ্ধ আলোয়
পুঞ্জ মেঘের কালোয় কালোয়
ভুলবে তোমার রূপ,
একলা মনের বিজন কোণে
গাঁথ্‌ব মালা-সঙ্গোপনে
জাল্‌ব প্রেমের ধূপ;

জীবন-বীণায় তন্ত্র 'পরে
ঝঙ্কবে তান তোমার করে
নিত্য সুমধুর,
সকল ক্ষণে, সকল কাজে,
অবসরের শান্তি মাঝে
বাজবে তোমার সুর;
কবে তোমায় ভালোবেসে
তোমার পথে চলব হেসে,
করব না আর ভয়;
আমার তনুর প্রতি অণু
হবে তোমার বর্ণ-ধনু—
তোমার স্বপ্নময়;
মাগো, পঙ্ক-মলিন মর্ম্ম-নীরে
সূর্য্য-শতদলে
মুক্ত করি' অর্ঘ্য করো
তোমার চরণ তলে।

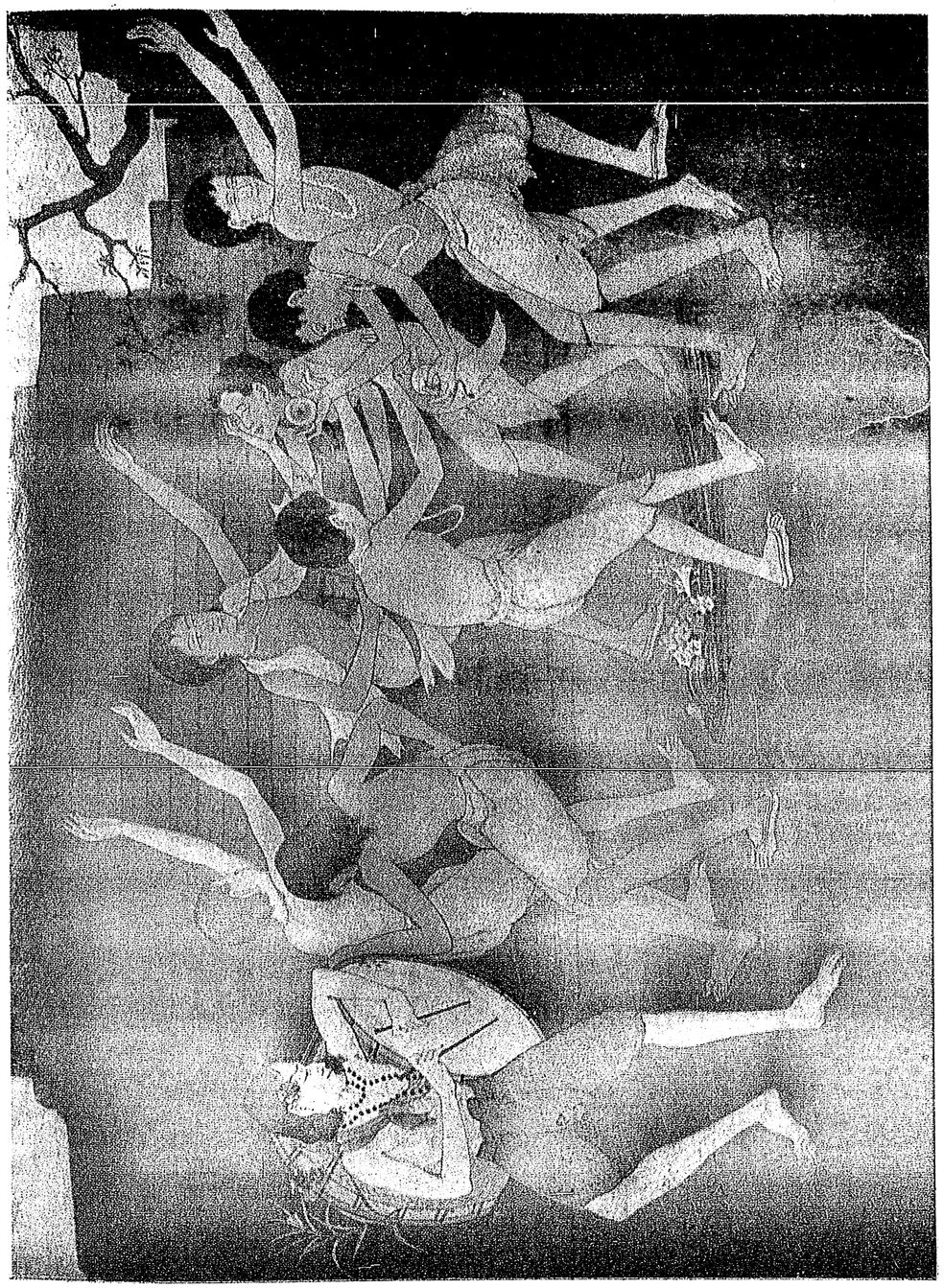

তাণ্ডব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

COLOURED ILLUSTRATION

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দ

[ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে (১৮৩৬ খৃঃ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি) হুগলী জেলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বড় ভাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়া শিক্ষা কিছুই হইল না। ব্রাহ্মণের ছেলে সামান্য পূজা-অর্চনা মাত্র শিক্ষা করিলেন এবং জানবাজারের রাণী রাসমণির অনুগ্রহে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পূজকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি প্রধান পূজকও হন। সেই সময়েই তিনি সাধন-পথে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সময় সময় তিনি এমনই তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে মায়ের পূজার্চনার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল ঠাকুর পাগল হইয়াছেন। সত্যই তিনি মায়ের দর্শনলাভের জন্য পাগল হইয়াছিলেন এবং সেই পাগলই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় তিনি অবতীর্ণ হন। আজ সমগ্র সভ্যদেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। আমরাও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে প্রণাম করিতেছি।

তাঁহার জীবন-কথা, তাঁহার সাধনার কথা বলিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, যে শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। আমরা কতকগুলি শুষ্ক কথার দ্বারা কোন রকমে একটা মালা গাঁথিতে পারি। কিন্তু এই পবিত্র দিনে—সে মালা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের চরণে অর্পণ করা কিছুতেই শোভন হইবে না। তাই—যিনি তাঁহার কথা বলিবার প্রকৃত অধিকারী, যিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন, যিনি জগৎময় তাঁহারই মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই যুগমানব সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা এই শতাব্দী-জয়ন্তীতে পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।]

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতাম। আমি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাবসানে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—"এই যে সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তরে বলিতেন—"এ সকল আমার মত ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। আমার এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত একটি শ্লোক মনে পড়িতেছে—

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি ও শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন; আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন; আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারা জীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"হাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি

তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?" "হাঁ"। "কি প্রমাণ?" "আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি—ধর্ম্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এ একটা তামাসার কথা নয় অথবা ইহা মানুষের করা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট আসিতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম্ম যে দেওয়া যাইতে পারে তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে, একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বার বার হইতে দেখিয়াছি। আমি বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম; তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিলাম, ইহা সত্য; যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্ম দান সম্ভব, আর মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন—"জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া যায়, ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে।" অতএব আগে ধার্ম্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জ্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দাও গিয়া। ধর্ম্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। উহা লইয়া সমাজ গঠন কিরূপে হইবে? কোন ধর্ম্ম কি কখন কোন সমিতি বা সংঘ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ সমাজ করিলে ধর্ম্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়—আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম্মের লোপ। এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মের প্রাচীন জন্মভূমি। উহাদের মধ্যে এমন একটি ধর্ম্মের নাম কর, যাহা প্রণালীবদ্ধ সংঘের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটিরও তুমি নাম করিতে পারিবে না। ইউরোপই এই উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল—আর সেই জন্যই উহা এশিয়ার মত কখনই সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা ছুটাইতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্ম্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্ম্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ্চ নির্ম্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে বা বচনে বা বক্তৃতায় বা সংঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের মোট কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলে প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, আমরা যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিষেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে—তাহা এই—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি—আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পার, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। "তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে সেবা করিতে পার না।"

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব—সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে

যাইতেছ তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল। এইটি করিতেই হইবে—এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে—সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত, অপরিণামী, নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—সমষ্টির ক্ষুদ্রাকারে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকালকার দিনে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের লোক, যেখানে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্ত নাই—সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়—আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মর্ম্মনেরা (Mormons) * পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে। সেই ত ধর্ম্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা সেখানেই ধর্ম্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কর, উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরণের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে, আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে পূজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ, ইহাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে ভারতে আমরা এই এক বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে উহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি তাহারা সকলেই বলিবে উহারা এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"যেমন বিভিন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পর্ব্বতসমূহে উৎপন্ন হইয়া ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।" ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্য্যে স্বীকার করিতে হইবে—তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া অপর ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলেন, সেরূপ ভাবে নহে—'হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে।' (আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে")। একজন বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না উহা সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম; আবার অপর একজন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুক্তি দিবার শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চ্চে উহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন—আর তুমি, আমি বা অপর কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী।

* ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইঁহারা বাইবেলের মধ্যে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ এক পত্নী সত্ত্বেও বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী।

আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাঁহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্ম্মলাভের এক মাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন—

"ন ধনেন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

"—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়।" যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"

সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না, সকল ধর্ম্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে, আর যতই ত্যাগের ভাব কমিয়া যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, আর ধর্ম্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়, আর মদীয় আচার্য্যদেব এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না; তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্য্যন্ত এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, এমন কি, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহটা যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই সব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণ জয়ের তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ। এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর কিছুমাত্র ছিল না—আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের অতিশয় প্রয়োজন। এখনকার কালে লোকে যাহাকে আপনাদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত এক মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—আজকালকার দিনে এই ত্যাগের প্রয়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন—যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন লোক আছে যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহে। বাস্তবিকই এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত—আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০

ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন। আর এরূপ ঘটনা যে দুই একদিনের জন্য ঘটিত তাহা নহে; মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম, তাঁহার কষ্ট যাহাতে না হয় এই কারণে লোকজনের সঙ্গে তিনি যাহাতে দেখা না করেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত—"এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?"—তিনি হাসিয়া এই মাত্র উত্তর দিতেন—"কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে ত ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।" একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনি ত একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।" প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন—"তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দেখিতেছি অপর সংসারী লোকদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?"

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইঁহার শীঘ্র দেহ যাইবে—তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাঁহাদের চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশায়ই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরের ভিতর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আদর হইতেই লোকের ভিতর আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, যত বড় বক্তৃতাই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বচনে হইবে না, নিজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে। যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল—আর মদীয় আচার্য্যদেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর দূর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব"—আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে—সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন—ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলাম। (মদীয় আচার্য্যদেব)

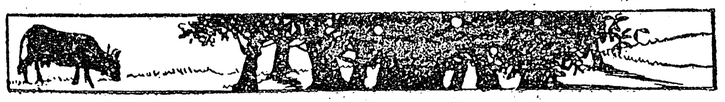

'শব্দরত্নাবলী' ও মূসা খাঁ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

পরলোকগত হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন-কালে যে সকল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের 'শব্দরত্নাবলী' অন্যতম (১)। পরলোকগত হেন্‌রী টমাস্ কোলব্রুক্ সাহেবও তাঁহার 'অমরকোষ'-এর সংস্করণ সঙ্কলনকালে এই 'শব্দরত্নাবলী'র সাহায্য লইয়াছিলেন (২)। এই অভিধান সম্বন্ধে উইলসন্ সাহেবের অভিমত এই যে, পর্য্যায়শব্দগুলির মধ্যে নানা বিভিন্ন পাঠ প্রবেশনের জন্যই ইহা প্রধানতঃ প্রয়োজনীয়, নচেৎ ইহাতে নূতনত্ব কমই আছে। কোলব্রুক্ বলেন, ইহা অমরকোষের অনুক্রমে লিখিত, সেই হেতু ইহাকে অমরকোষের টীকা-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় এখানি সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যতগুলি শব্দ-কোষ তিনি দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (৩)।

আধুনিক কোষগ্রন্থের মধ্যে 'শব্দরত্নাবলী'ই শ্রেষ্ঠ কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অমরকোষের তুলনায় ইহাতে অনেক বেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা, অমর স্বর্গবর্গে বুদ্ধের যতগুলি সংজ্ঞা বা সমার্থ দিয়াছেন, মথুরেশ তদ্ব্যতীত আরও ২৭টি বেশী সংজ্ঞা দিয়াছেন; তন্মধ্যে 'ধর্ম্মচক্র, গুণাকর, অসম, খসম, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বজ্রী, বাগীশ, মহাসুখ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, পঞ্চজ্ঞান, মহাবোধি, ত্রিমূর্ত্তি ও শক' এইগুলি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ডশেষে'র অনেকগুলি সংজ্ঞা 'শব্দরত্নাবলী'তে নাই, যথা 'মহাশ্রমণ, কুলিশসন, গোপেশ' ইত্যাদি। অমরকোষ অপেক্ষা 'শব্দরত্নাবলী'তে বিষ্ণুর ৬৪টি বেশী প্রতিশব্দ আছে, তন্মধ্যে 'ইরেশ, জিতামিত্র, ঊর্দ্ধদেব, হরিগৃধ্র' প্রভৃতি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। দুর্গার আছে প্রায় ৪৭টি বেশী, তন্মধ্যেও কতকগুলি পুরাণ বা তন্ত্র (আগম) শাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় না। এইরূপ সমগ্র গ্রন্থেই কিছু কিছু বেশী শব্দ আছে।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নদীয়া রাজবংশের রাজা রাঘব রায়ের সভায় যে স্মার্ত্ত-পণ্ডিত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ছিলেন, তাঁহার পিতা মথুরেশ তর্কপঞ্চানন ও মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার একই ব্যক্তি নহেন। ঐ মথুরেশের নিবাস ছিল রাণাঘাটের অন্তর্গত উলায় (৪)। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার 'শব্দরত্নাবলী' ব্যতীত 'সারসুন্দরী' নামে অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় ইনি নপাবীয় বন্দ্যঘটীয় কুলোদ্ভব। ইহার প্রারম্ভ ও পুষ্পিকা হইতে আরও জানা যায় যে, ইনি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র ছিলেন এবং ইঁহার মাতার নাম ছিল পার্ব্বতী (৫)।

'শব্দরত্নাবলী' ও 'সারসুন্দরী' ব্যতীত মথুরেশ প্রণীত আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়— 'নানার্থশব্দ'। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

"নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খাঁন নৃপাজ্ঞয়া
নানার্থশব্দ লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ।" (৬)

কিন্তু এই 'নানার্থ শব্দ' স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, ইহা 'শব্দরত্নাবলী'রই অন্তর্গত নানার্থ-বর্গ। অথচ একই গ্রন্থের অন্তর্গত মাত্র একটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা কেন, ইহা বোঝা দুষ্কর।

'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথি সুলভ নয়। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উহার যে পুঁথিখানির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"বন্দে সদানন্দময়ং সমন্তাজ্‌জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম ভবাদিসেব্যম্
ধ্যানৈকগম্যং জগদেকরম্যং যদিচ্ছয়া কারণকার্য্যভাবঃ।
আসীৎ ক্ষ্মাতলমণ্ডলে নৃপকুলৈঃ সংসেবিত শ্রীযুতৈ-
র্ভূপালঃ শিতমানখান ইতি যঃ কীর্ত্তিপ্রতাপোজ্জ্বলঃ।
যদ্দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপচণ্ডদহনৈঃ কল্পান্তসূর্য্যপ্রভৈঃ
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালকা রণভুবি ক্ষোভাকুলাঃ শেরতে।
তস্যৈব জগদেকবীরতনুজঃ খ্যাতো জগন্মণ্ডলে
মূর্চ্ছা খাঁন মহীপতিঃ স্থিরমতির্বঙ্গৈকরঙ্গোৎসবঃ।
দীপ্তৈর্দ্বাদশ ভূমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ
শ্রীধাতু প্রতিদেশপালনবিধৌ সংসেব্যমানোঽভবৎ।

* * * * * * *

ধীর শ্রীমথুরেশ এষ তনুতে শ্রীশব্দরত্নাবলীং
সদ্যঃ সন্ত বিনোদিনো নৃপসমং সন্তোষবন্তোঽনয়া।" (৭)

'সারসুন্দরী'তে মূর্চ্ছা খাঁর নাম নাই। মথুরেশের পৃষ্ঠপোষক 'বঙ্গে'র নৃপ, 'দ্বাদশ-ভূমিপে'র (বার ভুঁইয়ার) তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভায় দীপ্ত এই মূর্চ্ছা খাঁন যে পূর্ব্ববঙ্গের 'বাইশ পরগণা'র অধীশ্বর মসনদ্-ই-আলি ইশা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান মূসা খাঁ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবুল ফজলের 'আইন্-ই-আক্‌বরি' ও 'আকবর-নামা', ইনায়েৎ-উল্লার 'তক্‌মিল্‌ল-ই-আকবর-নামা' (Elliot's History of India, vol. VI.), ইংরেজ র‍্যাল্‌ফ্ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (Horton Ryley, 1899), ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 'রাজমালা', ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের জঙ্গলবাড়ীতে ইশা খাঁর বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ, জনপ্রবাদ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত গ্রাম্য-গীতি প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিবরণ দ্বারা গঠিত বীরবাহু ইশার কাহিনী নানা সাময়িক-পত্রে ও গ্রন্থে আলোচিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা ইহা অতি-পরিজ্ঞাত কথা যে, ইশার পিতা কালিদাস গজদানী (যদিও 'আকবর-নামা'য় ইশার পিতার নামোল্লেখ নাই) মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুলেমান খাঁ যে 'শব্দরত্নাবলী' বর্ণিত 'সিতমান খান' ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কিন্তু 'শব্দরত্নাবলী' অনুসারে সিতমান খান ইশা খাঁর পিতা নহেন, মূর্চ্ছা খানের পিতা। ভুলটা অবশ্যই মথুরেশের এবং কোনও রাজার বা রাজস্থানীয় ব্যক্তির সভাপণ্ডিতের পক্ষে তাঁহার প্রভুর পিতার নাম সম্বন্ধে এরূপ ভুল বা অজ্ঞতা আশ্চর্য্যের কথা।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁর প্রকৃত অভ্যুদয় এবং ১৫২৮ অথবা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে (ইনায়েতুল্লার মতে ১০০৭ হিজরী ও 'আকবর-নামা'র মতে ১০০৮ হিজরী) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র, দেওয়ান মূসা খাঁ ও দেওয়ান মহম্মদ খাঁ এবং এই দুইয়েরই সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু মূসার পুত্র মশূম খাঁর জীবনের ১৬৩২ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা মুসলমানী ইতিহাসে পাওয়া যায় (৮)। আর পাদ্‌রী জন্ ক্যাব্রাল্ (Fr. John Cabral S. J.) কর্ত্তৃক ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি চিঠি হইতে জানা যায় যে—"Minimican, Son of Massacan, who had been Emperor of Bengal before the Moors conquered it." অর্থাৎ এই চিঠি লিখিত হইবার পূর্ব্বেই Massacan-এর প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই Massacan মূসা খাঁ (৯)।

কিন্তু কোলব্রুক্ 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ (১০)।

উইলসনের পুঁথিতেও ঐ একই তারিখ ছিল এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে 'শব্দরত্নাবলী' ১৫৮৮ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল (১১)।

রাজা রাজেন্দ্রলাল 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন উহা খণ্ডিত, উহার শেষাংশ নাই। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে মথুরেশের একখানি 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথিতে পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে (১২),

"শাকাব্দে রস দোষ বাধব (সৈন্ধব) ধরামানে ধরা নির্জর
কোঽপ্যেতামলিখচ্ চ কোবিদং (ক্ব) তাং শ্রীশব্দরত্নাবলীম্।"

(১) Works of H. H. Wilson, Vol. V., London, 1865, p. 233.
(২) Miscellaneous Essays, Cowell's ed., Vol. II, London, 1873, pp. 51-52.
(৩) A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language, Analytical, Historical and Lexicographical, Vol. III, Part I, Calcutta and London, 1884, Introduction, p. 36.
(৪) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS., under the care of the Asiatic Society of Bengal, by MM. H. P. Sâstrî, Vol. III, (Smriti) Cal., 1925, Intro. pp. XXX.
(৫) R. L. Mitra's Notices of Sanskrit MSS., Vol. VII., pp. 221 and 222.
(৬) Ibid, Vol. I. No. 354.
(৭) Ibid, Vol. III, No. 1105, p. 65.
(৮) J. A. S. B., Vol. XLIII, 1874, James Wise, p. 210.
(৯) Ibid, 1913, p. 445.
(১০) Colebrooke, op. cit., p. 52 footnote.
(১১) Wilson, op. cit., p. 233.
(১২) Eggeling's Catalogue, No. 1512.

কিন্তু ইহা হইতে তারিখটা জানা যায় না; কারণ ইহার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলাল[১৩] 'সারসুন্দরী'র যে পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দুইটি তারিখ দেওয়া আছে, একটি গ্রন্থ-রচনার, অপরটি পুঁথি-নকলের। নকলের তারিখটি—'পক্ষাভ্ররসচন্দ্রাব্দ' অর্থাৎ ১৬০২ শক বা ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ। রচনার তারিখ, 'গজাষ্টতিথিযুক্শাকে' অর্থাৎ ১৫৮৮ শকাব্দে বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী' ও 'সার সুন্দরী' এই উভয়ই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 'মূসা খান' আসেন কোথা হইতে?

ইতিহাস অনুসারে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূসা-খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'শব্দরত্নাবলী' রচিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু কোলব্রুকের পুঁথিতেও '১৫৮৮' শকাব্দ-এর সহিত 'মূর্চ্ছা খান'এর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, উইলসনের পুঁথিতেও তাই এবং 'সারসুন্দরী'তে 'মূর্চ্ছা খান' না থাকিলেও ১৫৮৮ শকাব্দটা ঠিকই আছে। এই তারিখ ও মূর্চ্ছা খানের সহিত ইতিহাসের মূসা খাঁ'র কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে কি এই সকল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পুঁথির তারিখটা প্রক্ষিপ্ত? ভরসা করি, কোনও পণ্ডিত এ রহস্য ভেদ করিয়া দিবেন। ইতিহাসে পাই, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, মূসা-খাঁর পৌত্র ও মশূম-খাঁর পুত্র জমিদার মুনব্বর-খাঁ চট্টগ্রাম অবরোধকারী সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ১,০০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হইয়াছিল (১৩)। কিন্তু ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মশূম-খাঁ জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ তারিখে সায়েস্তা-খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত একখানা সনদ ঐ বংশের উত্তরাধিকারিদের নিকট রক্ষিত আছে (১৪)।

১৩১০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার (দশম ভাগ) তৃতীয়-চতুর্থ (অতিরিক্ত) সংখ্যায় মুবারিজ খাঁর পুত্র কবি মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তাল-হোছন'-এর একখানি পুঁথির বিবরণ (পৃঃ ১৫৭-১৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল, ইশা খাঁ ও মূসা খাঁর উল্লেখ আছে। পুঁথিখানি জীর্ণ, কাজেই মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার হইতে পারে নাই এবং গ্রন্থের ভাষাও সুখবোধ্য নয়। ইশা খাঁ সম্বন্ধে এইটুকুই পাইতেছি,

"বার বাঙ্গালার পতি ইছা খান বির
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধির॥" (পৃঃ ১৫৯)

ইহার খানিকটা পরে পাইতেছি,

"কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিন খান রূপে অনুপাম॥
তান পুত্র গুণবান * * *
জার কৃতি গৌর (ড়) দেশ ভরি॥
* * * * *
গাভুর খনি গুণনিধি থিরপির রসদধি
তাহানে প্রণমি বহুতর॥
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠানগণ জিনি॥
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহুবলে অভি জয়
বাপ হন্তে কৈল রাজধানী॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার॥
হাম খান মুছানন্দ হাস্য বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার॥" (পৃঃ ১৬০)

যাহা পাইতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, কবি মহম্মদ খাঁর মতে মুছানন্দ খান বা মূসা খাঁ 'মিন খান'-এর পুত্র। এই 'মিন খান'কে মশূম খাঁ ধরিয়া লইলে 'শব্দরত্নাবলী'র বিবরণের এইভাবে একটা মীমাংসা করা যায় যে, ঐ বংশে দুইজন 'মূর্চ্ছা খান' ছিলেন। কিন্তু ঐ বংশের উল্লিখিত সনদ ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মশূম খাঁকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কাজেই তৎপূর্ব্বে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশের পক্ষে মূর্চ্ছা খানকে 'মহীপতিঃ' 'দীপ্তৈর্দ্বাদশভূমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। তা ছাড়া, দ্বিতীয় মূসা খাঁর কথা ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

অতএব মিন খাঁর পুত্র মুছানন্দ, কবি মহম্মদ খাঁর এই উক্তি অসত্য। কিন্তু দ্রষ্টব্য—মুছানন্দ "লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রকথা অনুক্ষণ, রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার।" এই পণ্ডিত-

(১৩) James Wise, op. cit., p. 211.
(১৪) Ibid.

গণের অন্যতম বিদ্যালঙ্কার মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী' অভিধান ও 'সারসুন্দরী' টীকা লিখিয়াছিলেন।

'শব্দরত্নাবলী' যে মথুরেশের লিখিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সকল পুথিতেই একথা লেখা আছে; ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথিতেও আছে—"ধীর শ্রীমথুরেশ এষ তনুনে (তে) শ্রীশব্দরত্নাবলীম্।" কিন্তু আমার পুঁথিখানা অদ্ভুত। পুঁথিখানা লেখা হইয়াছিল—"শাকে যুগ্মনভোহঙ্গ-চন্দ্রগণিতেন" অর্থাৎ ১৬০২ শকাব্দে বা ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। উপরে যে 'সারসুন্দরী'র পুঁথির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানাও এই একই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। আমার পুঁথির প্রথম পত্র খানি নাই, কাজেই উহাতে কি ছিল জানা গেল না। কিন্তু পুঁথির শেষ পত্রে (২১৫।ক) সর্ব্বশেষ পুষ্পিকায় লেখা আছে—"ইতি শ্রীমহারাজ শ্রীযুত মুছাখান মশনন্দ এল্লি বিরচিতায়াং শব্দরত্না (ব) ল্যাং ত্রীলিঙ্গ সংগ্রহবর্গপ্রকাশঃ"। স্বর্গবর্গের শেষেও আছে (পৃঃ ২৪।ক)—"ইতি মহারাজ শ্রীযুত মুশাখান মশনন্দ এল্লি বিরচিতায়াং স্বর্গবর্গ প্রকাশঃ"। এইরূপ আগাগোড়া সকল বর্গেরই শেষে, কেবল কোথাও 'মুশা খান' 'কোথাও বা 'মুছা খান', আর (মসনদ-ই-) 'আলি'র স্থলে কোথাও 'এল্লি', কোথাও বা 'এল্লি'। অনুগৃহীত কবির রচনা সময়ে সময়ে কেমন করিয়া পৃষ্টপোষক প্রভুর নামে চলিয়া যায়, ইহা তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাণের লেখা কাব্য হর্ষের নামে চলে—শ্রীনিবাস ভট্টের লেখা 'দানসাগর' বল্লালসেনের নামে চলে—ইত্যাদি। তেমনই মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের অভিধান মূশা খাঁর নামে চলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা এই পুঁথির সাহায্যে ধরা পড়িয়াছে। অনুমান হয়, মূশা বা মূসা খাঁ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, নতুবা এরূপ চেষ্টা চলিতে পারিত না। কিন্তু এত করিয়াও লিপিকর পুঁথিতে 'নানার্থশব্দ' হইতে মথুরেশের নামটা বাদ দিতে পারেন নাই, সেটা ঠিকই আছে—"নত্বা জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম মুছাঁ খান নৃপাজ্ঞয়া। নানার্থশব্দ লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ॥" (পৃঃ ১১৫।ক)

মূসা খাঁর পিতা ইশা খাঁ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এগার-সিন্দুর দুর্গ বানারের অপর পার হইতে আক্রমণ করিলে ইশা খাঁ মানসিংহকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিলেন এবং অবশেষে শক্তি পরীক্ষার জন্য মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ নিজে না গিয়া তাঁহার জামাতাকে প্রেরণ করিলেন এবং জামাতা যুদ্ধে হত হইলেন। মানসিংহের এতাদৃশ কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহারে ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া নিজের দুর্গে চলিয়া যান। এবারে মানসিংহ নিজে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধেই ইশা মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন (অথবা মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল)। মহাবীর ইশা তখন মানসিংহকে হত্যা না করিয়া তাঁহাকে নিজের তরবারিখানি দিতে চাহিলেন। ইশার এই উদার ব্যবহারে স্তম্ভিত মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব ভিক্ষা চাহিলেন। উভয়ের মধ্যে তখন বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। অনন্তর ইশা মানসিংহের সহিত আগ্রায় (অথবা দিল্লীতে) গেলেন। সেখানে আকবর তাঁহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু এগারসিন্দুর যুদ্ধে ইশার মহত্ত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত ত করিয়া দিলেনই, উপরন্তু 'দেওয়ান মসনদ-ই-আলি' উপাধি-খেলাৎ ও তৎসহ বহু পরগণার জমিদারী উপঢৌকন দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন (১৫)।

আমার 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মূসা খাঁরও 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি ছিল এবং বাঙ্গালার 'বার-ভুঁইয়ার' ইতিহাসে ইহা একটি গুরুতর তথ্য। ইশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি আকবর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে মূসা খাঁর উপাধিও মোগল দরবার কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'Bengal: Past and Present' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'Bengal Chief's Struggle' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে (১৬) প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আগ্রায় গিয়া ইশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি প্রাপ্তির কথা

(১৫) সাহিত্য, ১৩১১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৩০-২৩১; ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৭, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৪২-৩৪৬; ইত্যাদি।

(১৬) ১৩৩৬ আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৫৯৯-৬০২) এই প্রবন্ধের একটি বাঙ্গালা অনুবাদ-জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

মিথ্যা (পৃঃ ২২-২৩)। 'আকবর-নামা'য় যখন স্পষ্ট লিখিত আছে যে ইশা কখনও মোগল-দরবারে যান নাই, তখন আকবর কর্ত্তৃক তাঁহাকে ঐ উপাধি দানের কথা অবশ্যই অলীক। কিন্তু ঢাকা মিউজিয়ামের কামানের খোদিত-লিপির প্রমাণে, ইশার 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি অবশ্য স্বীকার্য্য। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় আছে যে ঐ উপাধি ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক ইশাকে প্রদত্ত হইয়াছিল (ঐ, পৃঃ ৪৩ এবং পাদটীকা ১৩)। ইহার আর এক বিকল্প এই যে, ইশা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উক্ত উপাধি নিজে নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ উহা কাহারও দান নয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'Dacca Review' পত্রিকায় (পৃঃ ২২২) খাঁ বাহাদুর আওলাদ হাসান সাহেব এই অনুমান করিয়াছিলেন (ঐ পাদটীকা ১২)। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের মতে 'রাজমালা'-র উক্তিই ঠিক, তিনি বলেন ইশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন 'রাজমালা'-য় স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে ঐ উপাধি অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তখন এই উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখি না। একথা কেহই যথার্থভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না যে, অমরমাণিক্যের ন্যায় একজন প্রতাপশালী ও স্বাধীন রাজার তাঁহার আশ্রিত একজন আফগানকে (কারণ আফগান জাতীয় অন্য কোনও কোনও জমীদার ঐ সময়টায় এই জাতীয় উপাধি ধারণ করিতেন) এইরূপ উপাধি প্রদানের অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ৪৩ ; ভারতবর্ষ, ১৩৩৬, আশ্বিন, পৃঃ ৬০২)।

কিন্তু 'রাজমালা'-য় যে গল্পই থাকুক, ইশা খাঁ অমর-মাণিক্যের অধীনস্থ ভূস্বামী ছিলেন, একথা ভট্টশালী মহাশয় ('রাজমালা'র উক্তি বাদে) প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। মোগল-সৈন্যের আক্রমণে ইশার সরাইল হইতে পলাইয়া অমরমাণিক্যের নিকট গিয়া 'যোড়হস্তে' তাঁহাকে রক্ষা করিবার অনুরোধ, অমরমাণিক্যের রাণীর "স্তনধৌত জল ইছা খাঁ খাইল" ইত্যাদি কতকগুলি নূতন কথা 'রাজমালা'য় আছে বটে, কিন্তু নূতন কথা মাত্রই সত্য না-ও হইতে পারে। পক্ষান্তরে 'আকবর-নামা'য় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে—"Out of foresight and cautiousness, he (Isa) refrained from waiting upon the rulers of Bengal." (Akbar-nama, III, p. 647.) অর্থাৎ ইশা তাঁহার দূরদৃষ্টি ও সতর্কতার প্রভাবে বাঙ্গালার নৃপতিদিগের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে বিরত ছিলেন। ইলিয়ট্ সাহেবের তর্জ্জমায় পাই—"he took care not to see them" অর্থাৎ বাঙ্গালার নৃপতিদের সন্নিধানে গিয়া দেখা না করিতে ইশা সাবধান ছিলেন (Elliot and Dowson, Vol. VI., p. 73.) বস্তুতঃ ইশার ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় না, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ভারত-সম্রাট ব্যতীত অপর কোনও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজার প্রদত্ত উপাধি সগৌরবে (এবং বংশানুক্রমে) বহন বা ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইশার মোগল-দরবারে যাওয়ার প্রবাদটা যখন ভিত্তিহীন, তখন এই একমাত্র অনুমানই বা সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, ইশা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (নামে বা কাজে) নিজেই 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথিতে মূসা খাঁরও এই উপাধি ধারণ—এই অনুমান বা সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি 'শ্রীচৈতন্য ও জাতিভেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। মাঘের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথমে বন্ধুবর রমেশ বাবুর প্রবন্ধটি আলোচনা করা যাক।

রমেশবাবু যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের কোনও সন্দেহ নাই যে শ্রীচৈতন্যদেব "জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানিতেন না।" আমাদেরও এ বিষয়ে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইত—যদি রমেশবাবু নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন।

(১) শ্রীচৈতন্যদেব যদি জাতিভেদ না মানিতেন তাহা হইলে যখন তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, তখন কেন বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণের পাদোদক আন, উহা পান করিলে আমার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে ?"

(২) চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন দেব ও দ্বিজে ভক্তিমান বলা হইয়াছে ?

(৩) তিনি কেন শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, কেবল ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিতেন ?

(৪) শ্রীসনাতন যখন বলিয়াছিলেন যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের 'সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার" তখন শ্রীচৈতন্যদেব কেন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু রমেশবাবু এ সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নাই। এ জন্য মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে তিনি অসমর্থ।

রমেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমেই বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন—ইহা স্যর গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বলিয়াছেন। ইঁহাদের নজির দেখাইয়া রমেশবাবু নিজের ভ্রম লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকাংশ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছে। স্যর রামকৃষ্ণ বাঙ্গালা জানিতেন না। তাঁহার ভ্রম মার্জনীয়। কিন্তু বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রমেশবাবু কেন এ ভ্রম করিলেন ?

রমেশবাবু দীনেশবাবুর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"চৈতন্য-ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি (চৈতন্য) হীন শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" কিন্তু চৈতন্যভাগবতে একথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই রামানন্দ রায় বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের আচার পালন করাই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান।

প্রভু কহে পর শ্লোক শাস্ত্রের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ,—"বর্ণাশ্রমবিহিত আচারবান্ পুরুষের দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন—তাঁহার সন্তোষের অপর কোনও কারণ নাই।"

সুতরাং দীনেশবাবু ও রমেশবাবু যে বলিয়াছেন—রামানন্দ রায় দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের অসারতা দেখাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম অনুসারে শূদ্রের বেদ পাঠ নিষেধ, অতএব বেদ ব্যাখ্যাও নিষেধ। কিন্তু পুরাণ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে সকলের সম্পূর্ণ অধিকার আছে—শূদ্রেরও আছে। রামানন্দ রায়ের নিকট চৈতন্যদেব যদি বেদের ব্যাখ্যা শুনিতেন তাহা হইলে রমেশবাবুও দীনেশবাবু বলিতে পারিতেন যে চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম মানেন নাই। কিন্তু রামানন্দ রায় বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামানন্দ রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই।

নিম্নবর্ণের নিকট ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন ইহা হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। নৈমিষারণ্যে প্রতিলোমজ সূতের নিকট ব্রাহ্মণগণ ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সূতবংশোদ্ভব সৌতির নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্মব্যাধ ব্যাধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন যে জাতিভেদ মানিলে নিম্নবর্ণের লোকের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করা যায় না, তাঁহারা জাতিভেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারা জাতিভেদের যে নিন্দা করেন তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হইবে।

রমেশবাবু অপর যে সকল যুক্তি দিয়াছেন নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হইতেছে। প্রথম যুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দ নামক শূদ্রকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে রমেশবাবু যে কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন—চৈতন্যদেব

জাতিভেদ মানিতেন না—তাহা রমেশবাবুই বলিতে পারেন। জাতিভেদ সংক্রান্ত একথা কোথাও বলা হয় নাই যে ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্র ভৃত্য রাখিবে না? আমি পূর্ব প্রবন্ধে ইহা কোথাও বলি নাই যে চৈতন্যদেব কখনও শূদ্র ভৃত্য রাখেন নাই। রমেশবাবু এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের কৃপা কেবল উচ্চবর্ণের ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয় না, নিম্নবর্ণের ব্যক্তিও ঈশ্বরের কৃপা পাইতে পারে। অতি সত্য কথা এবং ইহা দ্বারা মোটেই প্রতিপন্ন হয় না যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

এই প্রসঙ্গে এবং অন্য স্থলেও রমেশবাবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এবং শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে—নিম্ন জাতির লোক যদি ঈশ্বরভক্ত হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে; পরন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঈশ্বর-ভক্ত না হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হয় না, তাহার জীবন ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জাতি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। রমেশবাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জাতিভেদ অসার, কিন্তু রমেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত ভুল। কেহ যদি বলেন রমেশবাবু অপেক্ষা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন, তাহা হইলে কি ঐতিহাসিক হিসাবে রমেশ বাবুর অসারতা প্রতিপাদন করা হয়? কখনই নহে। সেইরূপ কেহ যদি জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন—তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেব শূদ্র গোবিন্দকে এবং শূদ্র ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—"জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই"—চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি কখনও ব্রাহ্মণের পাদোদক পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না এবং অব্রাহ্মণের অন্ন খাইতে আপত্তি করিতেন না। শ্রীচৈতন্যের জীবনীর যে ঘটনাগুলি রমেশ বাবুর মত সমর্থন করিতে পারে, রমেশবাবু কেবল সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর মতের বিরোধী কয়েকটি ঘটনা আমি পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। রমেশবাবু সেগুলি চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ওকালতী হিসাবে রমেশ বাবুর আচরণ প্রশংসার্হ হইলেও ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সকল উক্তি এবং আচরণগুলি আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কর্তব্য। এই ভাবে সিদ্ধান্ত করিলে দেখা যায় যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে উচ্চ স্থান দিতেন এবং সেজন্য নিম্নজাতির ভক্তকে আলিঙ্গন করিতেন।

দ্বিতীয় যুক্তি—চৈতন্যদেব আহার করিতে বসিয়া রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন সুতরাং—"নীচজাতীয় লোকের সহিত আহার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।"

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে পরম ভক্তদিগকে চৈতন্যদেব অতিশয় পবিত্র বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি আহারের সময় রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহারা ভক্ত নহে এরূপ শূদ্রকে একত্র আহারের জন্য আহ্বান করেন নাই। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবিচারে সকল জাতির লোকের সহিত একত্র ভোজন করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই।

তৃতীয় যুক্তি—তিনি যবন হরিদাস এবং আরও কয়েকটি মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

জাতিভেদের মধ্যে এমন কোনও নিয়ম নাই যে মুসলমানকে শিষ্য করা যায় না। মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন, অতএব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন এই যুক্তি অতুলনীয়।

এই প্রসঙ্গে রমেশবাবু একটি বড় রকম ভুল করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে মুসলমান ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিবে ইহাতে চৈতন্যদেবের কোনও আপত্তি ছিল না এবং তাহারূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে চৈতন্যদেব হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। চৈতন্যদেব কখনও হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করেন নাই। রমেশবাবু যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার এয়োদশ পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশবাবু একটু ধীরভাবে ইহা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কাশী মিশ্রের গৃহে বসিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হরিদাসও সে সময়ে মন্দির মধ্যে যাইবার কথা বলেন নাই, মন্দিরের নিকটে যাইবার কথাই বলিয়াছেন।

অতএব রমেশবাবু যে এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ দূষণীয় নহে—তাহা সম্পূর্ণ নির্মিত সৌধমালার ন্যায় অলীক। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যের পক্ষে মন্দির প্রবেশ দূষণীয় ছিল। তাই সনাতন যখন বলিয়াছিলেন "সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার" তখন চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির মন্দির প্রবেশ শাস্ত্রনিষিদ্ধ সে যদি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার দ্বারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় এবং সে ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে রমেশবাবু আমার কয়েকটি যুক্তির কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু রমেশবাবু আমার একটি যুক্তির উত্তর দিয়াছেন ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার যুক্তি ছিল—শ্রীচৈতন্য বেদ ও পুরাণ মানিতেন, বেদ ও পুরাণে জাতিভেদ আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব

জাতিভেদ মানিতেন। ইহার উত্তরে রমেশবাবু বলিয়াছেন—প্রাচীন হিন্দুধর্মসংস্কারকগণ মুখে কখনও বেদ ও পুরাণের অপ্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মত ও প্রদর্শিত পথ অনেক স্থলেই সনাতন ধর্ম ও আচার হইতে ভিন্ন।"

অর্থাৎ তাঁহাদের মনে একরূপ এবং কার্যে অন্যরূপ; সহজ কথায় তাঁহারা কপটাচারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপর এবং যাবতীয় সাধু পুরুষদের উপর—কি সুগভীর ভক্তি! শ্রীচৈতন্য যে বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না তাহার প্রমাণস্বরূপ রমেশবাবু বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়াছেন।" ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিলে বেদকে ভুল বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহা রমেশ বাবুর আর এক অদ্ভুত যুক্তি। কেহ যদি বলেন ধর্ম-জীবনের তুলনায় ধর্মপুস্তকের জ্ঞান তুচ্ছ, তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ধর্মপুস্তকগুলি মিথ্যা?

ভক্তির তুলনায় বেদের জ্ঞান তুচ্ছ—ইহা বলিয়া যে শ্রীচৈতন্য বেদের বিরোধিতা করেন নাই তাহার আর একটি কারণ এই যে—বেদেই এই কথা আছে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

নায় মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাং॥

এখানে বলা হইল যে বেদে এবং অন্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন তাঁহারই ব্রহ্মলাভ হয়। অবশ্য যাঁহার ভক্তি আছে তাঁহাকেই ব্রহ্ম কৃপা করেন। সুতরাং বেদেই আছে যে ভক্তির নিকট বেদের জ্ঞান তুচ্ছ।

গীতাতেও ভগবান এই কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা॥১১।৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহম্ এবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥১১।৫৪

"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ দ্বারা আমার সে রূপ দেখা যায় না। কেবল আমার প্রতি অনন্য ভক্তি থাকিলে আমাকে এই ভাবে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।"

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের এই মত হিন্দুর বেদ-পুরাণ-ইতিহাস সকল ধর্মশাস্ত্রেই আছে। এই মত প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিরোধিতা করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য তাঁহার সকল মত এবং আচরণ বেদ-পুরাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যে ভগবদ্ভক্ত শূদ্র এবং পতিতদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, ইহাও পুরাণবাক্য দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। তথাপি রমেশবাবু কিরূপে এই গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলেন যে বেদ ও পুরাণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের আন্তরিক আস্থা ছিল না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রমেশবাবু আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলিয়াছেন:

চৈতন্যদেব যাহা যাহা করিয়াছিলেন আমি এবং আমার দলভুক্ত শাস্ত্রীয় আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি কি? আমি শূদ্র ও, মুসলমানকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষা দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি কি? তাঁহাদিগকে লইয়া একসঙ্গে ভোজনে ও মন্দির প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে কোনও আপত্তি আছে কি? ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ—ইহা কি আমি বিশ্বাস করি?

আমাদের মীমাংসার বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমত। এই প্রসঙ্গে আমার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের (?) আচরণ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক। রমেশ বাবুর এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যে যুক্তি নিহিত আছে তাহা এইরূপ:—

শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, বসন্তবাবু সে সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন; বসন্তবাবু জাতিভেদ মানেন অতএব শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না।

সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে অথবা পাশ্চাত্য Logicএ এবম্বিধ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ করি রমেশবাবু গবেষণা বলে সুমাত্রা বা জাভা দ্বীপ হইতে এই অপূর্ব যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রমেশবাবুর এই নবাবিষ্কৃত যুক্তি অনুসরণ করিয়া (এবং মহর্ষি গৌতমের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া) আমরা বলিতে পারি,—

শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না, রমেশবাবু জাতিভেদ মানেন না, সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, রমেশবাবুর সেই সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক খাইয়াছিলেন, রমেশবাবু খাইতে প্রস্তুত আছেন ত?

অবশ্য শ্রীচৈতন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত নহি, ইহা রমেশবাবুর অনুমান মাত্র। হরিদাস, রূপ ও সনাতন সকলেরই পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন—কোনও কারণে ইঁহাদের পাতিত্য জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের আচার ব্যবহার পরম পবিত্র, ইঁহাদের ভক্তি ও সাধনা অতুলনীয়। এরূপ মহাপুরুষগণের পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে অথবা ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আমার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না—অথবা আপত্তি এই যে আমি তাঁহাদের আলিঙ্গনের যোগ্য নহি। শ্রীচৈতন্য যে ইঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করেন নাই তাহা আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি। ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল যে সম্মানার্হ তাহাও আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

কোনও কোনও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হরিদাস প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতে আপত্তি থাকিতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু যত লোক জাতিভেদ বিশ্বাস করে সকলের আচরণ একরূপ হইবে, এই মতটি যুক্তিসিদ্ধও নহে, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়কও নহে। রমেশবাবুর ইহা বোঝা উচিত যে জাতিভেদে আস্থা থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। শাস্ত্রে জাতিভেদের বিধান আছে, আবার ইহাও লিখিত আছে যে কোনও ব্যক্তি যদি

অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তিমান হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া মনে করা উচিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিধান অক্ষরে অক্ষরে (literally) পালন করিতেন। কিন্তু এই বিধানের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে ভক্তির প্রশংসা করিবার জন্যই শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নজাতীয় ভক্তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রের এই বিধানটি পালন করা হইবে, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই; তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবারও প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত, কোন্ ব্যক্তি নহে—তাহা সকল ক্ষেত্রে নিশ্চয় করাও সম্ভবপর নহে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে এইপ্রকার মতভেদ থাকিলেও জাতিভেদের প্রধান নিয়মগুলি সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই—সকলেই স্বীকার করেন যে প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ পাপকার্য্য, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজন করা উচিত নহে, চণ্ডাল নিজেকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিবে, মন্দিরে প্রবেশ করিবে না। এই সকল বিষয়ে সকল নিষ্ঠাবান হিন্দুর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের যখন কোনও মতভেদ নাই—তখন ভক্ত চণ্ডালকে আলিঙ্গন করা উচিত কি না, এই প্রকার ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া, কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এক সম্প্রদায় জাতিভেদ মানেন এবং এক সম্প্রদায় মানেন না। অথচ রমেশবাবু ঠিক এই অপসিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

অতঃপর রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে রমাপ্রসাদবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়কে "জাতিভেদের বিরোধী বলা যায় না।" কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল কথাও আছে। তিনি বলিয়াছেন—"ভক্তিমার্গে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারী ভেদ নাই।" তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন সনাতনকে বলিলেন—"তুমি মন্দিরের নিকট না গিয়া ভাল কাজ করিয়াছ, সকল ব্যক্তিরই মর্য্যাদা পালন করা উচিত।" রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন বৈষ্ণবধর্মে— পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া লৌকিক ব্যাপারে তাহার অনুসরণ" করা হইয়াছে। কিন্তু পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হয় নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এই "মর্য্যাদা" হইতেছে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারভেদ। শ্রীচৈতন্যের মতে ইহা লঙ্ঘন করিলে পরলোকে সর্বনাশ হয়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হইয়াছে। রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—যাহার অর্থ "হরিভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ দ্বিজরূপে গণনীয়।" কিন্তু এই বাক্য হরিভক্তির প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। সত্য সত্যই এইরূপ ভক্ত চণ্ডালের জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। ভক্ত চণ্ডালকে কোনও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কন্যা-সম্প্রদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির বংশ জন্মগত ব্রাহ্মণবংশের সহিতই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণেতর ভক্তবংশের সহিত করেন নাই। রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে কোনও একটি মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —সকল জাতির এই মন্ত্রে অধিকার আছে। এই মন্ত্রটিতে সকল জাতির অধিকার থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অন্য কোনও বিষয়ে জাতি অনুসারে অধিকারভেদ নাই। বৈষ্ণবদের মন্দিরে ব্রাহ্মণগণই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকে, অন্য জাতির ভক্তদের স্বহস্তে সেবা করিবার অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তিমার্গেও জাতি অনুসারে অধিকার ভেদ আছে। বস্তুতঃ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি যে মার্গই গ্রহণ করা হউক, যদি বেদের প্রতি আস্থা থাকে, তাহা হইলে জাতিভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ জাতিভেদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি যে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তিমার্গের অনেক সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছেন। ভক্তিমার্গে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই ইহা ভুল।

রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে হরিদাস ঠাকুরের—"জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের বাধা ছিল না।" কিন্তু ইহা শ্রীচৈতন্যের মত নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন—শাস্ত্রে যে জাতির লোককে মন্দির প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই তিনি মন্দির প্রবেশ করিলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন" হয় এবং তাহাতে "ইহলোক পরলোক" নষ্ট হয়। রমাপ্রসাদবাবু ভক্তিরত্নাকর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু নীচ জাতির সহিত ব্যবহার করিতেন বলিয়া নিজদিগকে নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমি এ বিষয়ে শ্রাবণ ১৩৪১এর ভারতবর্ষে এবং পৌষ ১৩৪২এর বঙ্গশ্রীতে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাঁহার পিতা শ্রীকুমার কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন—"জাতিভেদজনিত অনৈক্য যে হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি কারণ এই তথ্য বোধ হয় প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়।" ইহার কারণ এই যে রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টধর্মকে সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। Digby সাহেবকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি একথা প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম এবং সমাজকে খৃষ্টানধর্ম এবং সমাজের অনুকরণে গঠিত করিবার জন্য তিনি প্রতিমা পূজা এবং জাতিভেদের নিন্দা করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ রাজা রামমোহন বুঝিতে পারেন নাই যে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ ঐক্যের কারণ, অনৈক্যের নহে। জাতিভেদের মূলশ্রুতি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ বলা হইয়াছে। বিভিন্ন অঙ্গের কর্ম বিভিন্ন হইলেও সকল অঙ্গই এক উদ্দেশ্যের সহায়ক, এ জন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সেইরূপ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন কর্ম নির্দ্দিষ্ট হইলেও, সকলেরই উদ্দেশ্য সমাজদেহের কল্যাণ সাধন—এ জন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সকল ব্যক্তির সকল

কাজে সমান অধিকার থাকিলে প্রবল প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। প্রবল প্রতিযোগিতা হইতে দ্বন্দ্ব এবং অনৈক্যের উদ্ভব হয়। হিন্দু-সমাজে জন্ম অনুসারে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিযোগিতাকে মৃদুতর করা হইয়াছে। তাহাতে অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম হয়। প্রত্যেক হিন্দু জানে যে অপর সকল জাতির সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে জীবনযাত্রা করা দুরূহ, এ জন্য সকল জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন থাকে। যাঁহারা প্রাচীন পল্লী-সমাজ দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সদ্ভাব এবং ঐক্য থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে জাতিভেদ নাই, কিন্তু ধনিকে এবং শ্রমিকে যেরূপ চিরন্তন বিবাদ বর্তমান হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ বিবাদ কখনও ছিল না। হিন্দুসমাজ হইতে জন্মগত জাতিভেদ তুলিয়া দিলে পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজেও ধন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইবে এবং ধনের আধিপত্য উগ্রভাবে প্রকাশিত হইবে। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা (heredity and environment) অনুসারে কর্মভেদ স্বাভাবিক। অপর উপায়ে কর্মভেদ করিলে সমাজে সুব্যবস্থা থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়া বেকার সমস্যা প্রবল হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্বেষ দেখা যায়।

জাতিভেদ যদি হিন্দুর জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইত তাহা হইলে সুদূর অতীত কাল হইতে জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারত সর্বাগ্রে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, শিল্প—সকল বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত না। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় হিন্দুর বিভিন্ন জাতি কলহ করিয়াছিল এরূপ দেখা যায় নাই। কলহ হইয়াছিল স্বজাতির মধ্যেই এবং তাহাই হিন্দুর পতনের অন্যতম কারণ। বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইল যে সকল অবস্থায় অহিংসা পরম ধর্ম—দেশ রক্ষার জন্য শত্রু হিংসাও যে ধর্ম—ইহা বৌদ্ধধর্মে বলা হইল না। এই অতি অহিংসাবাদের প্রভাবও পতনের অন্যতম কারণ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—সকল ধর্মগ্রন্থেই জাতিভেদকে সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর প্রণীত ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্কর, রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য সকলেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহাদের সর্ববাদিসম্মত মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টানধর্মভক্ত রাজা রামমোহনের মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

[অতঃপর এ সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে না।— ভারতবর্ষ-সম্পাদক।]

গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কি না ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

দেশের ও বিদেশের অনেক মনস্বীই বলিয়া থাকেন যে ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা একান্ত উচিত মনে করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে তাহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

প্রক্ষিপ্তবাদী—মহাশয়! ভগবদ্গীতাটা যে ভীষ্মপর্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা জানেন?

প্রতিবাদী—কি করিয়া জানিব; কাহাকেও প্রক্ষিপ্ত করিতে দেখি নাই, শুনা কথারও কোন মূল্য নাই, প্রক্ষেপের যুক্তিও খুঁজিয়া পাই না।

প্রক্ষিপ্তবাদী—কেন প্রক্ষেপের যুক্তি খুঁজিয়া পাইবেন না; ভীষ্মপর্বের যে স্থানে গীতা সন্নিবেশিত আছে, সে স্থানে গীতা উঠিবার কোন প্রসঙ্গই নাই।

প্রতিবাদী—প্রসঙ্গ নাই একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ভীষ্ম কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন—ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই ধৃতরাষ্ট্র জানেন এবং যুদ্ধের সমগ্র বৃত্তান্ত জানিয়া আসিয়া তাহা বলিবার জন্য সঞ্জয়ের উপরে আদেশও করিয়াছেন। এই অবস্থায় দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম নিপতিত হইলে সঞ্জয় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিলেন—"মহারাজ! ভীষ্ম আজ শিখণ্ডীর হস্তে যুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে"—ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বহুতর বিলাপ করিয়া যুদ্ধের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শুনিবার ইচ্ছায় সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পুত্রেরা ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া প্রথমে কি করিলেন?" ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নই ত গীতা উঠিবার প্রসঙ্গ; এইরূপ প্রসঙ্গ লইয়াই ত মহাভারতের এবং অন্যান্য উপাখ্যানময় গ্রন্থের উপাখ্যানগুলি উঠিয়াছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—সে যাহা হউক। উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন সেনাপতির

আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সে আদেশ হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়—এমন সময়ে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে থাকিয়া পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সহায় কৃষ্ণ গীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন—আর প্রধান যোদ্ধা অর্জ্জুন তাহা শুনিতে থাকিলেন। 'ধান ভাণতে মহীপালের গীত' আরম্ভ হইয়া গেল'—মহাযুদ্ধারম্ভে অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকিল! এমন ঘটনা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নিরুদ্বেগ না হইলে, গীতার মত বিষয়ের আলোচনা হইতেই পারে না।

প্রতিবাদী—মহাশয়! এই ভীষ্মপর্বেরই প্রথম অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় আপনি এরূপ অসামঞ্জস্যের অবতারণা করিতেন না। উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া যুদ্ধের প্রারম্ভে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা ভীষ্মপর্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে; তাহার মধ্যে এই কথাটুকুও আছে যে—"সমাভাষ্য প্রহর্ত্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে" অর্থাৎ 'আমরা বলিয়া কহিয়া বিপক্ষের উপরে প্রহার করিব এবং কোন পক্ষ বিশ্বস্ত বা বিহ্বল থাকিলে তাহার উপরে প্রহার করিব না'। সুতরাং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল যে, আমাদিগকে না জানাইয়া কেহই প্রহার করিবে না। অতএব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই তখনও নিরুদ্বেগ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনাও সম্ভবপর হইয়াছিল।

প্রক্ষিপ্তবাদী—মহাশয়! আসামিপক্ষের অনেক উকীলেরই মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা থাকে যে—'আমার মক্কেল দোষীই হউন আর নির্দোষই হউন, আমি তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিব'—আপনারও যদি সেইরূপই প্রতিজ্ঞা থাকে যে, আমি গীতাকে মূলগ্রন্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিব, তাহা হইলে আমার আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

প্রতিবাদী—'গ্রন্থকার জীবিত নাই বা উপস্থিত নাই, গ্রন্থ নিজেও অচেতন পদার্থ বলিয়া কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। সুতরাং এই সুযোগে গবেষক নাম বাহির করিয়া লই'—এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপনারাও যদি মূলগ্রন্থ গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, তাহা হইলে আমারও বিবাদে প্রয়োজন নাই। তবে সর্বপ্রযত্নে গীতাকে মূলগ্রন্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে হইবে এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা আমার নাই বা সেরূপ ইচ্ছাও নাই।

প্রক্ষিপ্তবাদী—তাহা হইলে বলুন দেখি, যে দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বিষপ্রয়োগ, জলে নিক্ষেপ এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই দুর্য্যোধন প্রভৃতিরই "সমাভাষ্য প্রহর্ত্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে" এই কথাটুকুর উপরে বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ সময়ে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মত লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ লোকদের অন্যমনস্ক হওয়া কি সম্ভবপর হয়?

প্রতিবাদী—অবশ্যই হয়। কেন না, সে সময়ে অসাধারণ ধার্ম্মিক ভীষ্ম কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিও সেই নিয়মপ্রবর্ত্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ ব্যতীত কৌরবপক্ষের কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কচি খোকা ছিলেন না। উভয়েই অতিরথ ও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন—একথা সকলেই জানিত। অতএব দৌড়াইয়া যাইয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার সাহস বা তীর ছুটাইয়া মারিয়া ফেলিবার ভরসা কাহারও হয় নাই, কিংবা তাঁহারাও সেরূপ আশঙ্কা করেন নাই। তাই তাঁহাদের গীতার আলোচনায় অন্যমনস্ক হওয়া অসম্ভব হয় নাই।

প্রক্ষিপ্তবাদী—আচ্ছা যাউক। পুরাণরচয়িতা বেদব্যাস চিরকালই সাপের গল্প ও ব্যাঙের গল্প প্রভৃতিই লিখিয়া আসিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি যে গীতার মত সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযোগী মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি?

প্রতিবাদী—এইবার আধুনিক রুচির অনুরূপ কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদী—আপনার সেকেলে ধরণের কথা শুনিব বলিয়া।

প্রতিবাদী—মহাশয়! সে কাল যে হিন্দুর সুবর্ণযুগ ছিল তাহা জানেন? সে যাহা হউক, বেদব্যাস কেবল পুরাণই রচনা করিয়া যান নাই, তিনি অধ্যাত্মবিষয়ের চরমগ্রন্থ বেদান্তদর্শন এবং পাতঞ্জলভাষ্য প্রভৃতিও লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদী—তবে কি আপনি মনে করেন যে বেদব্যাস একজনই ছিলেন?

প্রতিবাদী—বেদব্যাস একজন বা অনেকজন ছিলেন

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই মহাভারতেরই উদ্‌যোগপর্ব্বে 'সনৎসুজাত' নামে যে অধ্যাত্মশাস্ত্র দেখিতে পাই তাহা যদি বেদব্যাস রচনা করিতে পারিয়া থাকেন, তবে এই গীতাও যে তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বেদব্যাসের মত জ্ঞানী লেখক ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না!

প্রক্ষিপ্তবাদী—সে যাহা হউক। শুনিতে পাই—জাভাদ্বীপের মহাভারতে নাকি ভগবদ্‌গীতা নাই। সুতরাং ভগবদ্‌গীতা যদি মহাভারতের মৌলিক অংশই হইত, তবে জাভাদ্বীপের মহাভারতেও তাহা অবশ্য থাকিত।

প্রতিবাদী—অবশ্যই থাকিত একথা বলিতে পারেন না। কারণ জাভাদ্বীপবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল, মধ্যে বৌদ্ধ হইয়াছিল, পরে মুসলমান হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহারা যখন হিন্দু ছিল, তখন তাহাদের মহাভারতে ভগবদ্‌গীতা ছিল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে; তাহার পর তাহারা যখন বৌদ্ধ এবং মুসলমান হইয়াছিল সম্ভবতঃ তখন তাহাদের মহাভারত হইতে গীতা এবং ঐরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তিবোধক অংশগুলি নিষ্কাশিত হইয়াছিল। কেন না, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই; অথচ ভগবদ্‌গীতার বক্তা কৃষ্ণ আপনাকে বহু স্থানে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাহা প্রমাণিতও করিয়াছেন—আবার পার্থসারথিমূর্ত্তিতে সকলের দৃষ্টিগোচরও হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের ঐ গীতা যে বিরক্তিকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর এক কথা, জাভাদ্বীপের ভাষায় সে দেশের মহাভারতের যখন অনুবাদ হইয়াছিল, তদবধি তাহাদের মহাভারতে বহু উপাখ্যান নূতন প্রবেশ করিয়াছে, অনেক বিষয় নিষ্কাশিত হইয়াছে এবং বহু স্থান অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় সে দেশের মহাভারতে গীতা না থাকিলেও তাহা গীতার অমৌলিকতা প্রমাণিত করিতে পারে না।

প্রক্ষিপ্তবাদী—ভাল; গীতার মৌলিকতাসম্বন্ধে আপনি নির্দোষ যুক্তি দেখাইতে পারেন কি?

প্রতিবাদী—অবশ্যই পারি।

মহাভারতের পূর্ব্বাপর স্থানগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অন্যান্য স্থানে যেরূপ ভাষা, যেমন ভাব, যে প্রকার ছন্দ এবং যে জাতীয় অপাণিনীয় (আর্ষ) প্রয়োগ আছে, গীতাতেও সেইরূপই সে সমস্ত আছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদও আছে।

প্রতিবাদী—থাক; শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন-সরস্বতী প্রভৃতি যোগী মহাপুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তেই এই গীতার ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহাতেও গীতার মৌলিকতাই প্রমাণিত হয়।

প্রক্ষিপ্তবাদী—গীতা প্রক্ষিপ্ত বা মৌলিকগ্রন্থ এ বিষয়ে শঙ্কর প্রভৃতি কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহা করিয়া থাকিলে শ্রীধরস্বামী যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে তাহার মহাপুরাণত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ গীতার প্রারম্ভেও শঙ্কর প্রভৃতির —অন্ততঃ শ্রীধরস্বামীর কিছু লেখা থাকিত। সুতরাং উঁহাদের ভাষ্য ও টীকা থাকায় এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, উঁহাদের সময়ে মহাভারতে গীতা ছিল।

প্রতিবাদী—তাহার পর গীতায় যে সকল আধ্যাত্মিক শ্লোক আছে, তাহার প্রায় শ্লোকই মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত রহিয়াছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—ভাল, তাহা হইলে অবশ্যই একথা বলা যায় যে, মহাভারত রচনার পরে কোন বিশিষ্ট বিদ্বান্ লোক মহাভারতের সেই সকল স্থান হইতে আধ্যাত্মিক শ্লোক-গুলিকে একত্র করিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজেও কিছু কিছু লিখিয়া 'ভগবদ্‌গীতা' নাম দিয়া ভীষ্মপর্ব্বে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিবাদী—তাহাও হইতে পারে না। কারণ, মহা-ভারতের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম—'পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়'। তাহাতে—কোন্ পর্ব্বে কতগুলি অধ্যায়, কতগুলি শ্লোক, কতগুলি উপপর্ব্ব এবং কি কি বৃত্তান্ত আছে, তাহা মহর্ষি বেদব্যাস নিজেই সূচিপত্রের ভাবে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে দেখিতে পাই—"পর্বোক্তং ভগবদ্‌গীতা পর্ব্ব ভীষ্মবধস্ততঃ"—ইহার পরে আবার লেখা আছে—"কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ। মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥"

তার পর আবার আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"পূর্বমপ্যেত-

দেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে। ময়া তব মহাবাহো! তস্মাদত্র মনঃ কুরু॥" (বঙ্গবাসীর পুস্তকে ও কুম্ভঘোণমের পুস্তকে আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে ৫১ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক)। অতএব বেদব্যাস আদিপর্ব্বে ভগবদ্গীতাকে একটি উপপর্ব্ব বলিয়াছেন এবং তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন; আবার কৃষ্ণ আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে অর্জ্জুনকে সেই ভগবদ্গীতার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; এ অবস্থায় কোনরূপেই ভগবদ্গীতাকে সংগ্রহ-গ্রন্থ কিংবা প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

প্রক্ষিপ্তবাদী—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) যদি সেই অংশগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলি?

প্রতিবাদী—তাহা হইলে, সম্পূর্ণ মহাভারতটাকেই কিংবা নিজেকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিয়া যান।

সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়া

ডাঃ সুরেশচন্দ্র সান্যাল এল্-এম্-এফ

দিবারাত্র কাজকর্ম্মের পেষণে শরীর ক্লান্ত ও শুষ্ক হইয়া পড়িলে স্বাভাবিক রক্তশূন্যতা, গ্রন্থিবেদনা, পেটের পীড়া, বাতরোগ, যক্ষ্মা, শিরঃপীড়া, পেশীবেদনা প্রভৃতি উৎকট রোগ সকল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া ফেলে। তীর্থকামী যাত্রীর মত ধনীরা পর্ব্বতময় স্বাস্থ্যকর স্থানের দিকের ধাবিত হয়, সামর্থ্য থাকিলে কেহ কেহ বা সুইজারল্যাণ্ডের অপূর্ব্ব দৃশ্যপূর্ণ স্থানসমূহে কিছুদিনের জন্য

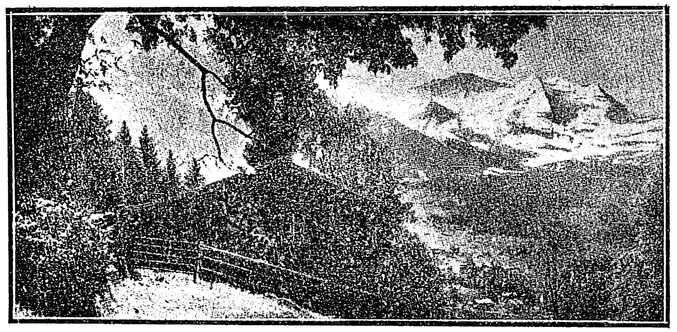

বার্ণিজ ওবারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড

আশ্রয় গ্রহণ করে। কেহ বা গ্রীষ্মকালের আল্পাইন্ পর্ব্বতশ্রেণীর স্নিগ্ধ বায়ু সেবন না করিলে জীবন সার্থক মনে করে না। শীতের দিনে বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বত রেখার অপূর্ব্ব দৃশ্য, স্কি-খেলার অফুরন্ত আমোদ, পাহাড়ের ধাতব জলপূর্ণ ঝরণাসমূহে স্নান, বৃক্ষশ্রেণীর নগ্নাবস্থা, প্রকৃতির উপমাহীন শোভা, রুগ্ন লোকের প্রাণেও আশার সঞ্চার করে; হতাশ লোকের প্রাণে দ্বিগুণ সাহস ও শক্তি আনিয়া দেয়। বিশুদ্ধ বায়ু, তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি রোগীদিগকে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে ধাবিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পর্ব্বতশিখরের রৌদ্র শীতার মূল্য অধিকতর, কারণ নিম্নস্থান সমূহে রৌদ্র কিরণ পৌঁছাইতে হইলে ধূলিকণা ও বাষ্পস্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ইহা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, উচ্চ স্থানের আবহাওয়া বিশুদ্ধ ও বীজাণুশূন্য বলিয়া অসংখ্য ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে নানারকম ধাতুমিশ্রিত জলপূর্ণ ঝরণা, জলপ্রপাত এবং সুন্দর সুন্দর হ্রদ বর্ত্তমান থাকায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে জল-চিকিৎসার জন্য বৎসরের সকল সময়েই নানা জাতীয় নরনারীর সমাগম হয়। আদিমকাল হইতে মানবের কোন না কোন রোগাক্রান্ত হওয়া স্বভাবগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই জল-চিকিৎসার পন্থা বহু পুরাতন হইলেও সেই আদিমকাল হইতে অধুনা সভ্যযুগ পর্য্যন্ত উহার অবাধ ব্যবহার হইতেছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, এরূপ ঝরণায় সাধারণতঃ ৩০।৪০টি স্নানের পর বহু রোগী সম্পূর্ণ

নিরাময় হইয়াছে। যে কোন প্রকার বাতরোগে, স্নায়েটিকায়, গ্রন্থি-বেদনায়, শিরঃপীড়ায় এবং পেশীবেদনায় ইহাতে আশাতীত ফল দর্শে।

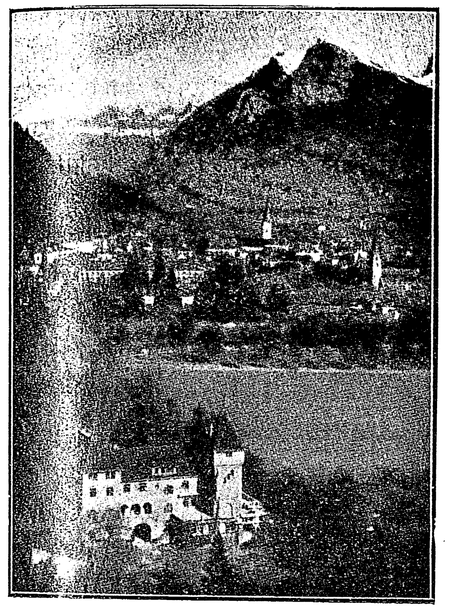

রাগাজ

সুইজারল্যাণ্ডের নিম্নলিখিত ঝরণাগুলি বাতরোগের চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত—যথা—এগেল্ (Aigle), আল্ভানিউ (Alvanue), আন্দির (Andeer), বেক্স (Bex), গিউরনিগেল্ (Gurnigle), হেনিজ (Henniez), রাগাজ (Ragaz), ভিজবাদ্ (Weissbad) ইত্যাদি।

স্নায়বিক বেদনার জন্য অনেকে আকোয়া রোজা (Aqua Rossa), আন্দির (Andeer), লাভি (Lavey), বাইন্জ লেক্. (Loeche Les Bains) প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসার জন্য গমন করিয়া থাকেন।

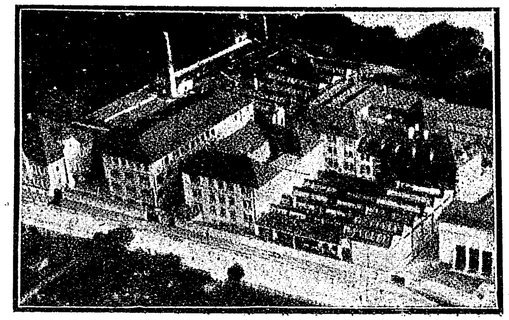

রচি ইনিষ্টিটিউট

কিন্তু সাধারণের পক্ষে সুদূর সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার্থ যাওয়া অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বিধায় একপ্রকার অসম্ভব। বিশ্বশ্রুত "সারিডন্" "সিরোলীন রচি" প্রভৃতি সর্ব্বত্র-ব্যবহৃত ঔষধের বিশাল কারখানা এই সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল নামক সহরে অবস্থিত। ডাঃ বারেলের অপরিসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে রচি কোম্পানীর শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে। বহু বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে "সারিডন" সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ বেদনা-নাশক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রচির বিশাল ল্যাবরেটরী বাজেল সহরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল।

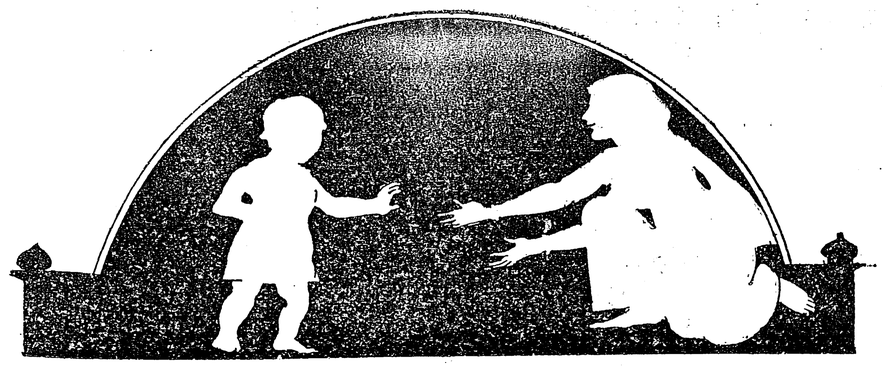

সাময়িকী

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট—

গল্প আছে, কোন বাত-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়াছিল ঃ—

"কোন দিনই বা ভাল ;
একাদশী গেল, আবার পৌর্ণমাসী এল।"

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট পরীক্ষা করিয়া ও অর্থ-সচিব সার জন উডহেডের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদিগের সেই গল্প মনে পড়িল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনাবধি বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি তাহার পথের সাথী হইয়া আছে। প্রথম বৎসরেই আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য—২ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তাহার পর ৪ বৎসর ব্যয় অপেক্ষা আয় সামান্য কিছু অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে আমোদ-কর ও ঘোড়-দৌড়ে বাজি রাখার উপর নূতন কর সংস্থাপনের এবং সাধারণ ও কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করায়। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে নূতন করদ্বয়ের আয় যথাক্রমে—৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ব্যয়ের আধিক্য ৪০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা হয় ও ১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের বাজেটে তাহা ২ কোটি ১০ লক্ষ ১০ হাজারে পরিণত হয়।

এ বার অর্থ-সচিব বলিয়াছেন—অবস্থা মন্দের ভাল। বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয়াধিক্য ৬৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হইবে—অনুমিত হইয়াছিল ; আগামী বর্ষে উহা ৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ উন্নতি যৎসামান্য এবং তাহাতে সুবিধাও হইবে না। অর্থ-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে যৎসামান্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহা ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশ প্রদানের ফল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যদি ঐ শুল্কের সম্পূর্ণ অংশ বাঙ্গালাকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গালার যশোদার দড়ীর দুই মুখ মিলিবে না। অথচ শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য—এই সকলের জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত বাঙ্গালার লোকের কর দানের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইতে পারে না।

অর্থ-সচিব সব মামুলী কারণেরই উল্লেখ করিয়াছেন—মেষ্টনী ব্যবস্থা, ব্যবসা মন্দা, সন্ত্রাসবাদের জন্য ব্যয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যয়সঙ্কোচের জন্য প্রশংসালাভের চেষ্টাও করিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতভেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কারণ, আমরা মনে করি, শাসনের ব্যয় সঙ্কোচ না করিলে উপায় নাই এবং ব্যয়সঙ্কোচ করাও অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে প্রথম কথা—এ দেশে সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের বেতনের হার অকারণ অত্যধিক এবং তাহা এ দেশের—এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার মাত্র। আর কোন দেশে সিভিল সার্ভিসে এত অধিক বেতন নাই। কেবল তাহাই নহে—অন্য অনেক চাকরীতে বেতন সিভিল সার্ভিসের চাকরীয়াদিগের বেতনের আদর্শে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দরিদ্র দেশে বাঙ্গালী মন্ত্রীরাও অনায়াসে শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সমান বেতন লইতেছেন—তাহাতে লজ্জানুভব করা ত পরের কথা। বোধ হয়, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, বিলাতে লর্ড অক্সফোর্ড, লর্ড বার্কেনহেড, সার জন সাইমন প্রভৃতি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন—ত্যাগ করিয়াছেন; আর এ দেশে মন্ত্রীরা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিত্রয় মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে কে কত টাকা আয়-কর দিতেন, তাহার হিসাব দেখিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর নির্দ্ধারণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"I have no doubt that under normal conditions we can carry on the work fairly comfortably with a Government of six members and if there were no question of preserving a communal balance the number

might even be reduced to five as recommended by the Committee."

অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ৬ জনে কায চলে এবং সাম্প্রদায়িকতার আবদার না থাকিলে ৫ জনই কায চালাইতে পারেন। তখন গভর্ণর বলিয়াছিলেন—শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কায বাড়িয়াছে। এখন ত তাহা আর নাই, তথাপি যে ৭ জনই বহাল রহিয়াছেন তাহার কারণ কি? মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাসের কোন চেষ্টাও হয় নাই। কারণ—"লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।"

ইহার উপর আবার বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণরের শাসনকালে সিভিলিয়ানদিগের জন্য নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে—(১) গভর্ণরের অতিরিক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী—১জন ; (২) ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার—১জন ; (৩) অতিরিক্ত সেক্রেটারী—১জন ; (৪) অতিরিক্ত সেক্রেটারীর জন্য ডেপুটি সেক্রেটারী ১জন ; (৫) সমবায় বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী—১ জন ; (৬) সমবায় বিভাগে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার—১জন।

দপ্তরখানায় রাজনীতিক বিভাগে চীফ সেক্রেটারীর অধীনে ১জন ডেপুটি সেক্রেটারী ও ১জন সহকারী সেক্রেটারী থাকিলেও সরকারের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ রচনার জন্য কয় মাস ১জন অতিরিক্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান আমদানী করা হয়। তিনি ক্লার্কই হউন, আর হিজলী বন্দিবাসের কমাণ্ডাণ্ট বেকারই হউন, আর হিউজই হউন—তাঁহাদিগের কার্য্যের পরিচয়—গত বৎসরের রিপোর্টে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে যে উক্তি সরকারকে প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করাতেই বুঝিতে পারা যায়।

যে ইংরাজ সিভিলিয়ান এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কমিশনার থাকা পর্য্যন্ত শৈলাবাসে না যাইয়াও কায করিতে পারেন, তাঁহারই শাসন পরিষদের সদস্য বা সেক্রেটারী হইলে—গ্রীষ্মকালে শৈলশিরে শৈত্য সম্ভোগ না করিলে চলে না। আবার এই সব ইংরাজের মত বাঙ্গালী সদস্য ও মন্ত্রীরাও শৈলশিরে কয় মাস যাপন করেন। ইহাতেও যে সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি হয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে যে ৬টি নূতন পদের উল্লেখ করিয়াছি, সে সব পদে অধিষ্ঠিত কর্ম্মচারীদিগের প্রত্যেকেরই কেরাণী হইতে চাপরাশীর ব্যয় অতিরিক্ত হয়।

বাঙ্গালা হইতে যে পাট রপ্তানী হয়, তাহার জন্য লব্ধ শুল্ক যে বাঙ্গালার প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেই কি বাঙ্গালার দুঃখ ঘুচিবে? গত বৎসর বাঙ্গালা সরকার ৫খানি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া—ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফীর মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের ও তামাকের উপর কর সংস্থাপন এবং আমোদ করের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। এই সকলে মোট প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু যতক্ষণ সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ-কার্য্য সম্পন্ন না হইবে ততক্ষণ যে বাঙ্গালায় কৃষির ও সেচের, শিক্ষার ও শিল্পের, স্বাস্থ্যের ও পথের উন্নত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—সেই জন্য বাঙ্গালা সরকারের বাজেটেও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

এ দিকে আমলাতন্ত্র সরকারের চেষ্টা না থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের বা বেদনার কারণ থাকিতে পারে না ; কিন্তু এ দিকে দেশবাসীর ও যাঁহারা দেশবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টির অভাব কি একান্তই পরিতাপের বিষয় নহে?

নারী-নির্য্যাতনে বেত্রাঘাত—

বাঙ্গালার নানা স্থানে নারী-নির্য্যাতন যে সমাজের পক্ষে বিপদের ও লোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, সরকারের হিসাবে এইরূপ লজ্জাজনক ঘটনার সংখ্যা—১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ এই কয় বৎসরে যথাক্রমে—৮ শত ৩৮, ৯ শত ২৮, ১ হাজার, ১ হাজার ৬৪, ৯ শত ১০ ও ৯ শত ৩৩—মোট ৫ হাজার ৬ শত ৭৩। বলা বাহুল্য, এরূপ অনেক ঘটনা লোক—বিশেষ হিন্দুরা—লোকলজ্জাভয়ে বা সংস্কার হেতু বা দুর্ব্বৃত্তদিগের ভয়ে—পুলিসের গোচর করে না। আর ইহা হিন্দুদিগের সম্বন্ধেই সমধিক প্রযোজ্য। যাহাদিগের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ী ফেলে না"—তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ে ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত। যে

সব সম্প্রদায়ে বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন, সে সব সম্প্রদায়ের লোকই সহজে এরূপ ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য লইতে অগ্রসর হয়। সুতরাং বুঝা যায়, প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা ৫ হাজার ৬ শত ৭৩ হইতে অনেক অধিক। যে প্রদেশে এইরূপ ঘটনা এত অধিক ঘটে, সে প্রদেশে এই পাপের প্রশমনকল্পে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন কে অস্বীকার করিতে পারে? এই অপরাধে অপরাধীর অন্য দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা সরকার যে এত দিন করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এত দিনে সরকার এই ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা-সচিব সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ে যে আইন মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনাকালে কয় জন মুসলমান সদস্যের ব্যবহারে অনেকে স্তম্ভিত হইয়াছেন। সার ব্রজেন্দ্রলালের বিশ্বাস ছিল, এই ব্যবস্থায় মতভেদ হইবে না। বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি ইহার সমর্থনে বক্তৃতা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কিন্তু মেদিনীপুরের মুসলমান মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন! ইনি বোধ হয়, পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। কারণ, কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়—মীণা পেশাওয়ারীর ব্যাপারে ইঁহার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সরকারী হিসাবে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ৬ বৎসরে ধর্ষিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা—৩ হাজার ৫ শত ২৫। অথচ প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিয়া মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন:—

(১) নারী ধর্ষণের অপরাধ অপেক্ষা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অধিক দোষাবহ।

(২) এই সব ব্যাপারে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। নিরপরাধ মুসলমানদিগকে এই অপরাধে অভিযুক্ত করিবার জন্য নানা (হিন্দু) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) হিন্দু জুরাররা প্রমাণ না থাকিলেও মুসলমান অভিযুক্তদিগকে দণ্ড দেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বিচারকদিগের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সভাপতির নির্দ্দেশে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়েন। সভাপতি যে হিন্দু জুরারদিগের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিতে আপত্তি করেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আরও যে সব আপত্তিজনক উক্তি হিন্দুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে সকলের আলোচনা আমরা করিতে চাহি না। ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রলাপোক্তির উল্লেখমাত্র করিলাম। কিন্তু—ইহা যদি প্রলাপোক্তি হয়, তবে আমরা অবশ্যই বলিব—"Though this be madness, yet there's method in it." আমাদিগের সময় সময় আশঙ্কা হয়, এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে হয়ত পরে সাম্প্রদায়িকতার প্রচারকদিগের জন্যও বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। যাহারা অতি ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধীর দণ্ডবিধান সম্বন্ধেও সাম্প্রদায়িকতার অবতারণা করিতে পারে, তাহারা কিরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাহ সহজেই অনুমেয়।

টুণ্ডলা ষ্টেসনে কয়টা ফিরিঙ্গী রেলের চাকরীয়া যখন নারীধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হয়, তখন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের পক্ষে ডাক্তার গিডনী বিশেষভাবে আবেদন করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে যদি বেত্রাঘাত করা হয়, তবে যেন ভারতীয়ের দ্বারা দণ্ডাদেশ তামিল করান না হয়। সুখের বিষয়, বাঙ্গালার বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা যেমনই কেন হউক না—সে সভাতেও মিষ্টার সুরাবর্দ্দী তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করাইতে পারেন নাই।

মানুষ যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউক না, সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা তাহার ধর্ম্মমতানুমোদিত। হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ—সকল ধর্ম্মেই নারীর প্রতি অত্যাচার নিন্দিত। সেই জন্য কেহ যদি মনে করেন, মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল হিন্দুবিদ্বেষবশে এই বিধানের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলা যায় কি না সন্দেহ। আর যে মুসলমান সমাজের ৩ হাজার ৫ শত ২৫ জন নারী ৬ বৎসরে ধর্ষিতা হইয়াছে, সেই মুসলমান সমাজ যদি মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর কার্য্যের সমর্থন করেন, তবে বলিতে হইবে—এইরূপ নেতার নেতৃত্বে কি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে? মুসলমান-শাসিত দেশে এইরূপ হীন অপরাধে অপরাধীদিগের কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে? এরূপ অপরাধে বেত্রাঘাত-দণ্ডের উপযোগিতা বিলাতেও স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকার যে এখন বেত্রাঘাত-দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন, ইহাও হয়ত পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে নিবৃত্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি না হয়, তবে আমরা নবীন জার্ম্মানীর বিধাতা হিট্‌লারের ব্যবস্থার অনুমোদন করিব। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীকে নির্ব্বীর্য্য করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখনও সে ব্যবস্থার ফল পরীক্ষাধীন। পরীক্ষা সফল হইলে deterrent দণ্ড হিসাবে উহার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ হিসাবে দেখা যায়, বাঙ্গালায় এই ঘৃণ্য অপরাধের বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সমাজের কল্যাণকল্পে ইহার দমন প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে এইরূপ অপরাধে অপরাধীকেও যথাসম্ভব কঠোর দণ্ড দিতে অনিচ্ছুক তাহারা হিন্দুই হউক—আর মুসলমানই হউক, তাহাদিগের বৃত্তি-বিকার ঘটিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিমাত্রেরই কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। সেইরূপ দণ্ড-ব্যবস্থায় যিনি বিরোধী হইবেন, তিনিই যে সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে অনবহিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ডাক বিভাগের আয়-ব্যয়—

১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকারের ডাক বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, ডাক ও তার বিভাগে আয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সরকারের বিবরণে বলা হইয়াছে—কেবল ব্যবসা মন্দা দূর হওয়াতেই এই পরিবর্ত্তন হয় নাই; পরন্তু পত্রের, বিমান ডাকের, তারের ও টেলিফোনের মাশুল হ্রাসও পরিবর্ত্তনের কারণ। আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ৪৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে পত্রের জন্য মাশুলের হার প্রথম আড়াই তোলায় ৫ পয়সা ছিল—পরে স্থির করা হয়, অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের পত্র ১ আনা মাশুলে যাইবে। বিমান ডাকে মাশুলও ঐ ভাবে কিছু হ্রাস করা হয়। তারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয়—প্রথম ১২ কথার জন্য যে ১৩ আনা দিতে হইত, তাহার স্থানে প্রথম ৮ কথার জন্য ৯ আনা দিতে হইবে। টেলিফোনের জন্য বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকার স্থানে ১ শত ৯২ টাকা দেয় স্থির করা হয়। কিন্তু পুস্তকাদির মাশুল বাড়ান হয়। এই শেষোক্ত ব্যবস্থার ও ভি, পি মাশুলের ফলে পুস্তকের ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে লোকের জ্ঞানার্জ্জনের পথ বিঘ্নাস্তৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

যখন দেখা যাইতেছে, পত্রের মাশুলে বা তারের মাশুলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ হ্রাস-ব্যবস্থা না করিলেও যথাক্রমে ওজনের ও কথার পরিমাণ অনুসারে সামান্য মাশুল হ্রাসেও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন এ কথাও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, বুকপ্যাকেটের ও ভি, পি'র মাশুল হ্রাস করিলে সেইরূপ ফললাভই হইবে। কেন যে সে দিকে ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ও অর্থ-সচিবের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেশের লোক বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ডাকবিভাগের একটি বিস্ময়কর ব্যবস্থার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিব। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও টেলিফোন কর্পোরেশন প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট যে "বিল" ডাকে পাঠান, তাহা "বুক পোষ্ট" হিসাবে গৃহীত হয়। অথচ সংবাদপত্রের বা মাসিকপত্রের মূল্যের জন্য গ্রাহকদিগকে যে পত্র লিখিত হয়, তাহাতে পত্র হিসাবে অধিক মাশুল দিতে হয়! এই ব্যবস্থা-বৈষম্যের কারণ কি? "বিল"-গুলি প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র এবং তাহাতে দেয় টাকার পরিমাণও নির্দ্দেশ করা হয়।

সরকারের টেলিফোনের জন্য মাশুল বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকার স্থলে ১ শত ৯২ টাকা করিয়াও লাভ হইতেছে। বার্ষিক ১ শত ৯২ টাকা দিলে সরকারী টেলিফোনে গ্রাহক যত বার ইচ্ছা লোকের সহিত কথা বলিতে পারেন। অথচ কলিকাতায় টেলিফোন কর্পোরেশনে গ্রাহককে অনেক অধিক টাকা দিতে হয়! টেলিফোন যদি "পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস" অর্থাৎ লোকের সুবিধার জন্য স্বীকার করিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে, যে স্থানে একচেটিয়া

ব্যবসায়ের সুযোগে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান টেলিফোনে অকারণ অতিরিক্ত লাভ করেন, সে স্থানে সরকার উহা লইয়া পরিচালিত করিলেই ভাল হয়। সরকারের হিসাবে দেখা গিয়াছে, টেলিফোনের মাশুল বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকা হইতে ১ শত ৯২ টাকা করা সম্ভব। তবে কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানী কি জন্য তাঁহাদিগের মাশুল হ্রাস করিতে বাধ্য হইবেন না? সংপ্রতি কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনের মূল্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, সে কোম্পানী বিদ্যুতের মূল্য যে হারে আদায় করিতেছেন, তাহা কেবল অসঙ্গতই নহে—অন্যায়ও বটে।

ডাকবিভাগে ব্যয়সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও সংশোধিত হইতে পারে। কারণ তাহাতে নিম্নদিকে যত মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, উচ্চদিকে তত দেওয়া হয় নাই।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে ভারত সরকারের বাজেট ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ব্যয় অপেক্ষা আয় মাত্র ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা অধিক দেখান হইয়াছে। ইহাতে যাঁহারা মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে "গেল কুদিন সুদিন ভেল" আমরা তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। কারণ এই বাজেট পরীক্ষা করিয়া আমাদিগের সেই প্রচলিত কথা মনে পড়িল—"উপরে চিকণ - ভিতরে খড়।" তাহার কারণ, ২ কোটি টাকা ভারতের রাজস্বের তুলনায় নগণ্য। যত দিন বর্ত্তমান আয় ব্যয়-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত না হইবে, ততদিন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে না। আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়—৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা; আর আনুমানিক ব্যয়—৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই যে ৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা—ইহার মধ্যে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয় বাবদে বরাদ্দ হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে বড়লাটের বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া শাসন বিভাগের সব ব্যয় বাদ দিলে প্রজার কল্যাণকর কার্য্যের জন্য কত টাকা অবশিষ্ট থাকে?

আমেরিকা তাহার বেকারদিগের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করিয়াছে এবং ইংলণ্ড বেকারদিগের সাহায্যকল্পে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহা মনে করিলে কি বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে যে বাজেটে কিছুই বরাদ্দ করা হয় নাই, সে বাজেট উপহাস—নিষ্ঠুর উপহাস বলিয়াই মনে হয় না? যতদিন সমর বিভাগের ও শাসন বিভাগের অত্যধিক ব্যয় সঙ্কুচিত করা না হইবে, ততদিন আশার অবকাশ কোথায়? গত কয় বৎসরে প্রজার কর-ভার যেরূপ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে তাহার সেই দুর্ব্বহ ভার লঘু করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন বাজেটে নাই। কেবল :—

(১) বার্ষিক ২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ে আয়-কর দিতে হইবে না।

(২) আয় করের ও সুপার ট্যাক্সের অতিরিক্ত ভার কিছু লঘু করা হইবে।

বার্ষিক ২ হাজার টাকা আয় এই দরিদ্র দেশে কয় জনের আছে? সুতরাং এই ব্যবস্থায় তেলা মাথায় তেল ঢালা না হইলেও প্রজাসাধারণের যে কোন উপকার হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য।

লবণের শুল্ক সমান রহিল—অর্থাৎ সমভাবে দরিদ্রকে পীড়িত করিতে থাকিল।

ডাকের মাশুলে যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে দরিদ্রের ব্যবহার্য্য পোষ্টকার্ডের মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লাটের সফর ও কর্ম্মচারীদিগের শৈলবিহার সম্বন্ধে আর অরণ্যে রোদন করিব না। যখন লবণের শুল্কই হ্রাস করা হইল না, তখন এ সব বিলাস-ব্যয় যে হ্রাস করা হইবে, এমন আশা আমরা করি না—করিতে পারি না।

সিন্ধু ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে। সেই জন্য প্রদেশদ্বয়কে যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ ও ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে।

কৃষি গবেষণা, উটজ শিল্পের উন্নতি ও বেতারের প্রসার—এই সব বাবদে টাকা প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে স্থানে উটজ শিল্পের উন্নতি সাধনকল্পে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে, সে স্থানে বেতারের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই! অথচ কোনটির প্রয়োজন অধিক তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার নাই, ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না।

মোট কথা—বাজেটের ব্যবস্থায় সঙ্গতি-সম্পন্নদিগের কিছু উপকার হইলেও দরিদ্র ও পিষ্ট প্রজাসাধারণের প্রয়োজন একেবারে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। আমরা ইহাকে কোন মতে সমৃদ্ধির বাজেট বলিতে প্রস্তুত নহি।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার—

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্বশাখার ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ননীগোপালবাবু ১৯২০ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন

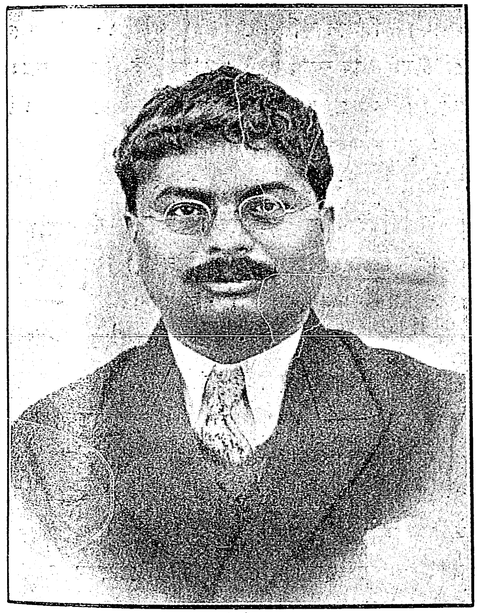

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার

ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং মৌলিক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কিউরেটারের কাজ করার পর তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি সিন্ধুদেশস্থ মহেঞ্জোদাড়ো ও অন্যান্য স্থানে খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার খনন বিবরণ সম্প্রতি "Exploration in Sind" নামে গ্রন্থাকারে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাস হইতে মজুমদার মহাশয় উত্তর বিহারে চাম্পারণ জেলায় লৌড়িয়া নন্দনগড়ে খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্প্রতি তাঁহাকে অবৈতনিক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া গুণের সমাদর করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গত বৎসর স্ত্রী ও শিশু-রোগ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন।

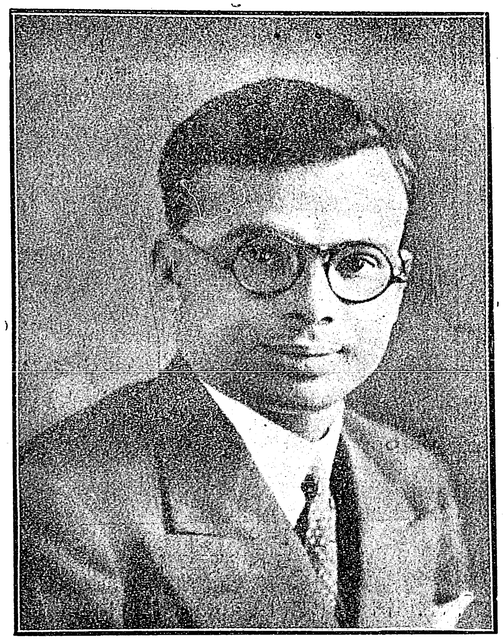

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

তিনি ডাবলিনের রোটাণ্ডা হাসপাতাল হইতে ধাত্রী বিদ্যা ও স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা বিষয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোস সমাপ্ত করিয়া এল, এম উপাধি লাভ করিয়াছেন। সুরমা উপত্যকায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন। তিনি লণ্ডন মেডিকেল ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েশনের সদস্য। ডাক্তার দত্ত সিভিলিয়ান শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন—

শ্রীযুত বিনয়কুমার সেন সম্প্রতি লণ্ডনের চার্টার্ড একাউণ্টেন্সী এবং ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেন্সীর শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত, উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পর পর দুইটি কঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সাফল্য লাভ করা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস সি পরীক্ষা পাশ করিয়া মাঞ্চেষ্টারের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, কম

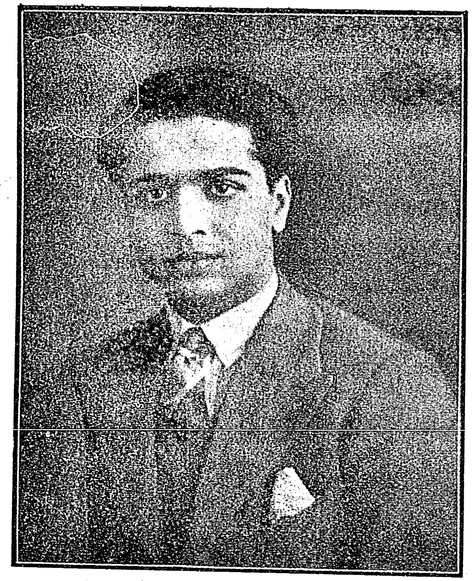

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন

পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। ইনি বর্দ্ধমান-কালনার সুপ্রসিদ্ধ সেন পরিবারের স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র সেনের পুত্র এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কবিরাজ শ্রীযুত সত্যব্রত সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

খাল খনন—

বাঙ্গালা সরকার ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় কুড়ুলিয়া খাল খননের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোকের স্বাবলম্বন পরিচয়ে সকলেই প্রীত হইবেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই খাল ব্রাহ্মণবেড়িয়া সহরের উত্তর-পশ্চিমে নদীর দুইটি শাখা সংযোগ করিত। এই খাল মজিয়া যাওয়ায় ৩০ বর্গমাইল স্থানব্যাপী বিলে বার বার বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে লোকের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। কয় বৎসর হইতে জেলাবোর্ড ও সরাইল জমীদারীর পক্ষ হইতে খালটির সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

তাহার পর যাহাদিগের কায সেই স্থানীয় লোকরা—পদমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে—এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া সমবায় গ্রাম-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে জরীপের কায শেষ হইলে ৩ মাইল দীর্ঘ, ৬৫ ফিট প্রস্থ ও ১০ ফিট গভীর খাল খননের সঙ্কল্প করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় খালের উত্তর কূলে ৩০ ফিট চওড়া রাস্তা করা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হয়, যদি ১০ হাজার লোক প্রতিদিন কায করে, তবে ৩ মাসে এই কায সম্পন্ন হইতে পারে। সমগ্র স্থানটি ২৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবকরা কায পর্য্যবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মার্চ্চ মাসের শেষেই যাহাতে খনন কার্য্য শেষ হয় তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ বর্ষার পূর্ব্বেই কায শেষ করিতে হইবে। চারিদিকের লোককে এই কার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বান ব্যর্থ হওয়া ত পরের কথা ইহাতে অপ্রত্যাশিত আগ্রহ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী তারিখে যখন কায আরম্ভ হয়, তখনই ১০ হাজারের অধিক লোক কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা কায করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি হইতে কৃষক ও শ্রমিক আছেন। কেহ কেহ দিনের পর দিন আসিয়া কায করিতেছেন। কোন দিন লোকের সংখ্যা ১০ হাজারের কম হয় নাই এবং কোন কোন দিন ২০ হাজার লোক কোদালী লইয়া মাটী কাটিয়া ঝুড়ী পূর্ণ করিয়া মাথায় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রাত্রিতে দীপালোকেও কায চলে। ২০ হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোক কায করিতে আসিতেছেন। কায যেরূপ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই খাল খনন ও রাস্তা গঠন শেষ হইবে।

এই খাল সম্পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে ভৈরবে গতায়াতের অনেক সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে নৌকায়

ভৈরবে উপনীত হইতে ৬ দিন অতিবাহিত হয়। খালের পথে নৌকা ১ দিনে ভৈরবে আসিতে পারিবে। বিল হইতে জলনিকাশের এই ব্যবস্থায় বন্যায় শস্যহানি নিবারিত হইবে এবং তাহা আবার শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

এখন ব্রাহ্মণবেড়িয়ার লোক বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের কল্যাণকর কার্য্য আপনারা সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। অর্থাৎ সরকারের কাছে—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে বহে নতশির"

হইয়াও যখন তাহারা আবশ্যক সাহায্য লাভ করে নাই, তখন তাহারা আপনাদিগের কায আপনারা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছে এবং স্বাবলম্বনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি অনুভব করিয়াছে। এ দেশের জনগণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ নূতন শাসনের ফলে বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে জনগণের সমবেত চেষ্টায় এইরূপ বহু কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হইত। যদি আবার সেই সঙ্ঘ-শক্তির সাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারি, তবে যে আমাদিগের অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর প্রয়োজন—

পাবনা জিলার জামতৈল নামক স্থানে "রায়ত ও খাতক সম্মিলনে"—নবাব সার কে, জি, এম, ফারুকী সাহেব বাঙ্গালার কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী যে জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য প্রদেশের লোকের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার পঙ্কে পতিত হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ কথার বিশেষ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। নবাব সাহেবের কথার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উচ্চ বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করেন নাই, সহানুভূতিসিক্ত কথায় লোককে কর্ত্তব্য কি—সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা, বাঙ্গালার কৃষক বুদ্ধিমান হইলেও অলস। বাঙ্গালার "৫ কোটি লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ১ কোটি ৩৭ লক্ষ লোক উপার্জ্জন করে" —অবশিষ্ট তাহাদিগের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালার পাটের কলে মজুর প্রায় সবই বাঙ্গালার বাহিরের—কলিকাতার শ্রমিক অধিকাংশই অবাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় হয়ত তাহার শ্রমবিমুখতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল :—

"A leading cause of poverty and of many other disagreeables in a great part of Bengal is the prevalence of Malaria. For a physical explanation of the Bengali's lack of energy, Malaria would count high."

সেই জন্য নবাব সাহেবের অভিভাষণে বলা হইয়াছে —"আপনাদিগকে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। আপনি যদি প্রত্যহ একটু সময়ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিবেশ করেন, তাহা হইলে আপনি কেবল আপনার নয়—আপনার পরিবারের প্রত্যেককে সুস্থ রাখিতে সমর্থ হইবেন। আপনার বাড়ীর চারিদিকে যে আগাছা ও জঙ্গল জন্মায়, তাহা কাটিয়া ফেলা আপনারই কর্ত্তব্য। আপনার ডোবায় যে মশা হয়, তাহা ধ্বংস করিবেন—আপনি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা এবং অপরিষ্কার খাদ্য খাওয়া এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য সামান্য নিয়ম পালন না করা আপনার পাপ।"

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডাফরিণ এ দেশের লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যাহারা যে পুষ্করিণীতে স্নান করে, সেই পুষ্করিণীর জলই পান করে—তাহাদিগের মধ্যে সংস্কারের প্রয়োজন যত অধিক, তত আর কোথাও নহে। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে পুষ্করিণীর অভাবই ইহার কারণ। কিন্তু সে অভাব—গ্রামের সকল লোকের অভাব এবং গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টা ও সঙ্কল্পই সে অভাব দূর করিতে পারে।

দারিদ্র্য যেমন মানুষের শক্তি হরণ করে, শক্তির অভাবে তেমনই দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য মানুষ সুস্থ ও সবল হইয়া আলস্য বর্জ্জন করিলে দারিদ্র্যের দংশন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গ্রামে থাকিয়া কিরূপে লোক আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে—কিরূপে নিজ চেষ্টায় সে কায করিতে পারে, তাহারও আলোচনা এই অভিভাষণে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

"ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আমরা আমাদের

প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাউলও উৎপন্ন করি না।" এইরূপে ডাউল সরিষা প্রভৃতির জন্য আমরা অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করি। এই সব জিনিষ যে বাঙ্গালায় উৎপন্ন করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ আমরা অপরের মুখাপেক্ষী।"

যদি দেশের অজ্ঞ জনগণকে এই সব কথা সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়া—বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে সুফল ফলে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাশীধামে রামকৃষ্ণ মন্দির—

বহু ধর্ম্মের মিলনভূমি মন্দিররাজি পরিশোভিত কাশীধামে আর একটি নূতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য অধুনা

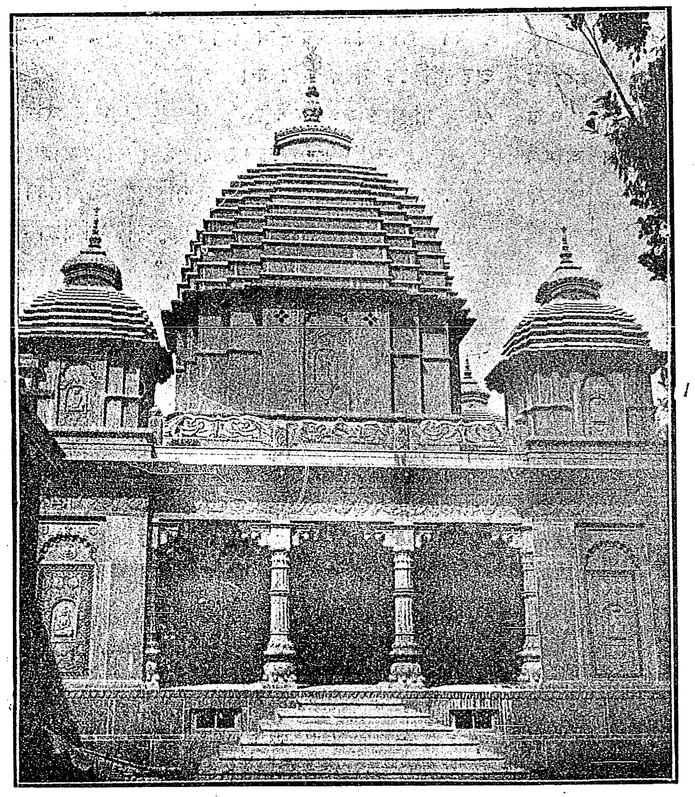

কাশী রামকৃষ্ণ মন্দির

সমাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে উৎসৃষ্ট। কারুকার্য্য ও বিস্তৃতি হিসাবে এইরূপ দেবালয় কাশীধামে বিরল। বিন্ধ্যাচল হইতে আনীত প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রস্তরগাত্রে দশাবতার, দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য দেবদেবী এবং পরমহংসদেব, তাঁহার পত্নী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসিগণের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৫৫´ ফুট এবং গর্ভ-মন্দিরের আয়তম ১৯৬´ বর্গ ফুট্। মন্দিরের অন্তর্ভাগ দুইভাগে বিভক্ত। মন্দিরের নিম্নে ভূগর্ভে চারিদিকে যে "তয়খানা" নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে এক অংশে পূজা ও ভোগরাগের উপযুক্ত দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকিবে এবং অপর তিন অংশে সাধু ও ভক্তেরা ভগবানের ধ্যান-ধারণাদি করিতে পারিবেন। কাশীর মত হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য মন্দিরের পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা উহার জন্য গত পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অর্থাদি সংগ্রহ ও কর্ম্ম-পরিচালনাদি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্ভয়ানন্দ। কঠিন রোগে চলচ্ছক্তিহীন হইয়াও তিনি যে ভাবে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী এই কার্য্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য এবং বহু ইঞ্জিনিয়ার অক্লান্তভাবে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী জন্ম-মহোৎসব উপলক্ষে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কাশীর সাধু ভক্ত ও বিদ্বজ্জন সমক্ষে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মহিলা কবির সম্মান—

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলা কবি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে পদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন। কবি ও উপন্যাসলেখিকা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী 'জগত্তারিণী পদক' ও কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু 'ভবতারিণী পদক' লাভ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ জন্ম-শত-বার্ষিকী—

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে জাহ্নবীর কূলে যে ভক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান কিতাবতী শিক্ষার অনুশীলন না করিয়া সত্যের সন্ধানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহার ভাবোন্মাদ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত সত্যান্বেষীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং বিবেকানন্দ স্বামীর মত প্রতিভাবান যুবককে তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল—যাঁহার সর্ব্বধর্ম্মের মূলগতঐক্যবোধ আজ সমগ্র সভ্য জগতের মনীষীদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে—যাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা একদিকে যেমন বিদেশে বেদান্ত-বাণী প্রচারিত হইতেছে, অপরদিকে তেমনই সেবা-ধর্ম্মে দেশের লোক শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতেছে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক। যে ধর্ম্মের বক্ষে তাঁহার জন্ম ও যে ধর্ম্ম তাঁহার সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মের উদারতা তাঁহার উপদেশে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। আজ যে হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ হিন্দুস্থানের বাহিরে—ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপে ও আমেরিকায়—এই যান্ত্রিক যুগে—প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে বহু পরিমাণে রামকৃষ্ণ শিষ্যদিগের চেষ্টায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইয়াছে।

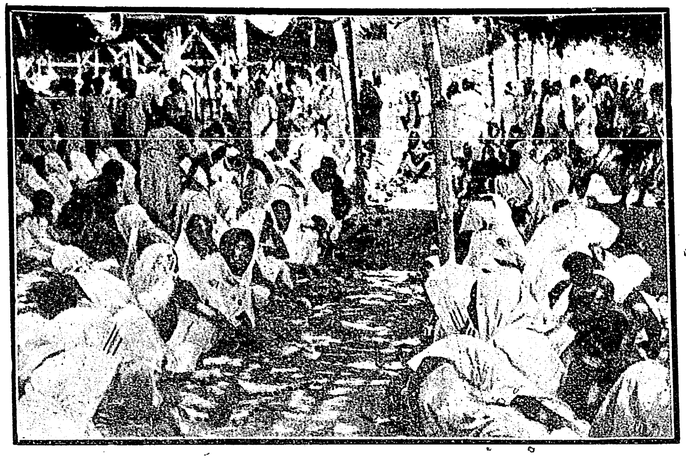

গত ১লা মার্চ্চ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে দুই সহস্র মহিলা একত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন

ফটো—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে প্রসাদ গ্রহণের স্থানের প্রবেশপথে সমবেত জনতা

ফটো—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য—

মাত্র এই একজন বাঙ্গালী এবার আই, পি, এস চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

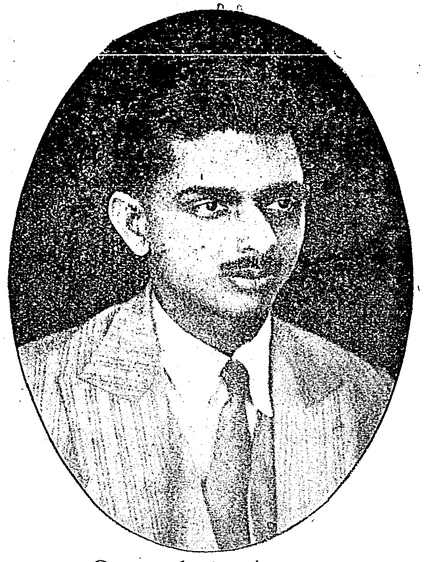

শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—

কালীকৃষ্ণবাবুর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর—ইনি ভারত-

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গভর্ণমেণ্টের মিলিটারী হিসাব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি বিলাতের 'টেম্‌স নটিকাল ট্রেণিং কলেজ' হইতে নৌ-বিদ্যার পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া বি, আই, এস, এন কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হইয়াছেন!

কুমারী সুকৃষ্ণা বসু—

আসাম ডিব্রুগড়ের ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা কুমারী সুকৃষ্ণা বসু গত বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলনীতে যোগদান ফলে সেতারে চতুর্থ এবং এসরাজে প্রথম স্থান অধিকার

কুমারী সুকৃষ্ণা বসু

করিয়া সুবর্ণ-খচিত পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি গত বৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতেও এসরাজে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে এক বৈঠকে সুকৃষ্ণা তাঁহার ধ্রুপদ গানে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ডিব্রুগড়নিবাসী প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত হরিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকট সুকৃষ্ণা গীতবাদ্য শিক্ষা করিয়াছেন।

রেল বাজেট—

এদেশে রেলপথের বিস্তার কত অধিক এবং তাহাতে কত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা মনে করিলে স্বতঃই আশা করা যায়, ইহাতে সরকারের প্রভূত লাভ হইবার কথা। ইহাতে মূলধন হিসাবে প্রায় ৮শত ৮৫ কোটি টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বহুদিন রেলে লাভ হয় নাই—গত কয় বৎসর হইতে আবার তেমনই লোকসান হইতেছে। ভারতে রেলপথের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য দেশে যেমন অন্তর্বাণিজ্যের জন্যই রেলপথ রক্ষিত হয়, এদেশে তেমনই বহির্বাণিজ্যের জন্য অর্থাৎ বিদেশের সহিত বাণিজ্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করা হয়। সেচের খালের উপযোগিতা যত অধিকই কেন হউক না এবং তাহাতে যত লাভই কেন হউক না—সরকার রেলের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়া আসিয়াছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, যখন রেল ব্যবসা—তখন ঋণ করিয়া মূলধন দ্বারা রেলপথ রচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা না করিয়া ভারত সরকার যে রাজস্বের উদ্বৃত্ত টাকাও রেলে ব্যয় করেন তাহার কারণ—

"I know there is the standing pressure of the European Mercantile Community, to expend every available rupee on Railways and these men are powerful both in this country and in England."

মধ্যে কয় বৎসর লাভের পর ভারতে রেলে আবার ক্ষতি আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর বাজেটে যে লোকসান হইবে মনে হইয়াছিল, তদপেক্ষা লোকসানের পরিমাণ ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। অথচ লোকসান কম হইবে, এই অনুমানে নির্ভর করিয়া কর্ম্মচারীদিগের বেতনহ্রাস-ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছিল!

এবার আনুমানিক ঘাটতী—সাড়ে ৩ কোটি টাকা। এই লোকসানের কারণ-নির্দ্দেশকল্পে রেলওয়ে সচিব সার মহম্মদ জাফর উল্লা খাঁ বলিয়াছেন, কারণ ত্রিবিধ :—

(১) পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা মন্দা—পণ্যের অসাধারণ মূল্য-হ্রাস।

(২) পৃথিবীর সকল দেশে (ভারতবর্ষেও) স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা এবং পণ্যের ও অন্তর্বাণিজ্যের পুষ্টি।

(৩) মোটরের প্রতিযোগিতা এবং অল্প পরিমাণে—জলযানের প্রতিযোগিতা।

আমরা এই কারণ-নির্দ্দেশ সমর্থন করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসা মন্দা হইয়াছে ও পণ্যের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু আর সব দেশ কিরূপে লোকসান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে?

পৃথিবীর সব দেশের স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টার সঙ্গে ভারতে রেলপথের আয়ের সম্বন্ধ কতটুকু। অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধিতে যে রেলের আয় বৃদ্ধিই অনিবার্য্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে বহির্বাণিজ্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যে ক্রমাগত রেলপথ রচনা করা হইয়াছে, তাহারই ফলে যে আজ এই দুরবস্থা তীব্র হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি।

মোটরের ও জলযানের প্রতিযোগিতা প্রহত করিবার একমাত্র উপায়—রেলে ভাড়া হ্রাস করা। সে বিষয়ে যে আবশ্যক চেষ্টা হইয়াছে ইহা মনে হয় না।

কেবল ইহাই নহে—যখন এই কারণত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি স্থায়ী হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত ভ্রমের সংশোধন ও ব্যয়সঙ্কোচ ব্যতীত উপায় কি? রেলওয়ে-বোর্ডের প্রয়োজন আছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বার বার ব্যবস্থা পরিষদে দেখান হইয়াছে, যে পদ্ধতিতে কয়লা ক্রয় করা হয় তাহার পরিবর্ত্তন করিলে অনেক টাকা ব্যয়-হ্রাস হয়। সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগেও চাকরীয়াদিগের বেতন অনেক ক্ষেত্রে অকারণ অধিক।

এই সব ত্রুটি সংশোধিত হইলে যে ব্যয়-সঙ্কোচ ও তাহার ফলে লোকসান হ্রাস হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শোক-সংবাদ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ারোধহেতু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা যোঁড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র হেমেন্দ্রনাথের তিন পুত্রের মধ্যে ঋতেন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁহার সহোদরদ্বয়ের নাম—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ। পরিবারের সাহিত্যানুরাগ ও

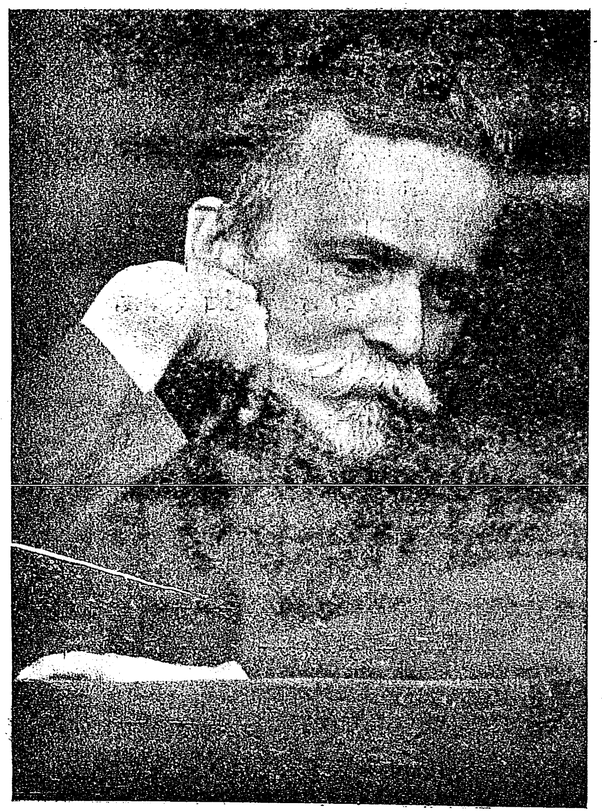

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ঋত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন এবং সে সকলের উদ্ভব-কারণ ও উপযোগিতা, অনুসন্ধানফলে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি নানা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার 'জয়ন্তী' নামক পুস্তক পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। তবে তিনি যে সব রচনা করিতেন, সে সব সাধারণ পাঠকের অধিকার সীমা বহির্ভূত ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ—ভ্রাতৃত্রয়ই অধ্যযনশীল ও বঙ্গ-ভারতীর সেবকরূপে পরিচিত। জ্ঞানানুশীলনাদি সম্বন্ধে ঠাকুর-পরিবারের সেকালের অনেক বৈশিষ্ট্য ঋতেন্দ্রনাথের ছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যত্নে যে সাহিত্য সভা গঠিত হইয়াছিল ঋতেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন। স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধী, মিষ্টভাষী ও সাহিত্যানুশীলনানুরাগী ঋতেন্দ্রনাথ পরিচিত মাত্রেরই প্রীতি অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বহু পরিচিত লোক দুঃখানুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

কমলা নেহরু—

জেনিভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরু—রোগজীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

কমলা নেহরু

ইনি দিল্লীর জৌহরমল কৌলের কন্যা। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলালের পুত্র জওহরলালের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তখন পণ্ডিত মতিলাল যুক্তপ্রদেশে ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী—সার সুন্দরলাল, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও পণ্ডিত মতিলাল এই তিনজন এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রাধান্য

করিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কমলাও রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অসুস্থতাহেতু মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় তাঁহার যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহাতেই ক্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় ও তিনি চিকিৎসার্থ য়ুরোপে গমন করিলে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁহার নিকট যাইতে পারিবেন বলিয়া কারারুদ্ধ জওহরলালকেও মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহার অকালমৃত্যু বিশেষ দুঃখের বিষয়।

সার দীনশা ওয়াচা—

পরিণত বয়সে সার দীনশা ইদালজী ওয়াচার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল তিনি ত্রিবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—(১) রাজনীতি, (২) ব্যবসা—বিশেষ কাপড়ের কল ইত্যাদি, (৩) সংবাদপত্র-সেবা।

যদি সম্মান ও প্রসিদ্ধি সাফল্যের পরিমাপ হয়, তবে সার দীনশার সাফল্য সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। কেন না, তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ও পরে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন; তিনি ৩১ বৎসর কাল বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ও ৩৫ বৎসর কাল বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির কার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থাপন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীও ছিলেন। আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবধি বহুদিন কংগ্রেসে তাঁহার স্থান নেতৃগণের মধ্যে ছিল এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে অধিবেশন কলিকাতায় হয়, তিনি তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিক ব্যাপারে সার ফিরোজশা মেটার অনুসরণ করিতেন এবং কলিকাতার অধিবেশনের পর মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক—জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছিলেন—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে যথেচ্ছা আকার দান করে, ফিরোজশা তেমনই সভাপতি দীনশা ওয়াচার মতকে যথেচ্ছা আকার দিয়াছিলেন। সুতরাং সার দীনশা যে পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মডারেটদিগের প্রতিষ্ঠান—ন্যাশান্যাল লিবারল ফেডারেশনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সার দীনশা যৌবনে 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার' পত্রের প্রধান লেখক ছিলেন। বহুদিন তিনি কলিকাতার 'বেঙ্গলী' ও মাদ্রাজের কোন পত্রের নিয়মিত সংবাদদাতা ছিলেন এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন পত্রেও লিখিতেন। তিনি নানা বিষয়ে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে বোম্বাইয়ে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার আরম্ভ ও ক্রমবিকাশ, জামশেদজী টাটার জীবনচরিত, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জীবনচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সার দীনশা ওয়াচা

বিলাতে ভারত সরকারের ব্যয় সম্বন্ধে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাহাতে সাক্ষ্য দিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। সে বার গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মাদ্রাজের জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহগামী ছিলেন। ইঁহাদিগের সাক্ষ্যে এ দেশে বিদেশী সরকারের ব্যয়বাহুল্য ও এ দেশের লোকের আয়ের তুলনায় তাহার আধিক্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু শাসনের ব্যয় হ্রাস হওয়া ত পরের কথা—বর্দ্ধিতই হইয়াছে। তাহার পর শাসন-সংস্কারে প্রদেশের সংখ্যা বাড়িয়াছে—প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাণ্ড, বডিগার্ড ও শৈলাবাসসম্বলিত গভর্ণরের সৃষ্টি হইয়াছে; যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এক জন ছোটলাটের দ্বারা শাসিত হইত, তাহার মধ্যে কেবল বাঙ্গালাই এখন একজন গভর্ণর—৭জন মেম্বার ও মন্ত্রিসহ—শাসন করিতেছেন! ইহাই যদি স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ হয়, তবে এ কথা অস্বীকার করিবার

উপায় থাকে না যে, এই স্বায়ত্ত-শাসন দেশবাসীর আয়ত্তাধীন নহে বলিয়াই এমন হয়।

কাপড়ের কলের সম্বন্ধে সার দীনশার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালায় বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাহার পরামর্শদাতৃ-রূপে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক লাভ করিতেন।

শেষ বয়সে দৈহিক দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও তিনি নানা কাযে সময় অতিবাহিত করিতেন। সমস্ত জীবন কাযের সাধনা করিয়া তাহা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সার দীনশা ইদালজী ওয়াচা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জনগণানুষ্ঠানে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ নহে।

নবীনচন্দ্র বরদলই—

গত ৩রা ফাল্গুন আসামের অন্যতম নেতা নবীনচন্দ্র বরদলই লোকান্তরিত হইয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর মাধবচন্দ্র বরদলই মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি কলিকাতায় অধ্যয়নান্তে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে গৌহাটিতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্যারম্ভ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ডিব্রুগড়ে আসাম এসোসিয়েশনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তখন তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন এবং অভিভাষণে ইংরাজের নানারূপ প্রশংসা করিয়া মতপ্রকাশ করেন—যে সময় মগরা আসামে অত্যাচার করিতেছিল, সেই সময় ইংরাজের তথায় গমন বিধাতার বিধান। ঘনশ্যাম বড়ুয়া আসামের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলে নবীনচন্দ্র তাঁহার স্থানে আসাম এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। তখন আসামের সকল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেই তিনি যোগ দিতেন। মণ্টেগু চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কমিশনার সার নিকোলাস বিটশন-বেল অনুন্নত বলিয়া আসামকে শাসন-সংস্কারের পরিধির বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতায় মিষ্টার মণ্টেগুর সহিত আলোচনা করিবার জন্য নবীনচন্দ্র প্রমুখ যে সব আসামী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আসামে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে বলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা বিলাতে জয়েণ্ট কমিটীতে আসামে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। বিলাতে তিনি এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের পরামর্শে কায করিতেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শিবসাগরে নবীনচন্দ্র আসাম ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং জোড়হাটে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আসাম রায়ত সম্মিলনে প্রজার অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

কারাগারে অবস্থানকালে তিনি আসামী ভাষায় কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

রাজনীতিই তাঁহার প্রধান সাধনার বিষয় ছিল। তিনি আসামের অন্যতম নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মতে নিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

বরদলই মহাশয়ের মৃত্যুতে কেবল আসাম নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ এক জন দেশাত্মবোধের সাধক ও প্রচারক হারাইয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেম যে অনাবিল ছিল, তাহার জন্যই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এটর্ণী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মোহিনী বাবুর খ্যাতি—প্রসিদ্ধ এটর্ণী বলিয়া নহে; পরন্তু পণ্ডিত বলিয়া। পঠদ্দশা হইতেই মোহিনীমোহন মনীষার পরিচয় দেন এবং দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চায় মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি থিয়জফিষ্ট সম্প্রদায়ে আকৃষ্ট হইয়া ঐ সম্প্রদায়ের কোন সভায় যোগ দিতে বাঙ্গালার বাহিরে গমন করেন ও তথা হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি গীতার যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, তাহা বোদ্ধাদিগের নিকট আদরলাভ করে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রথম কালের কংগ্রেসে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অনেকেরই

প্রশংসা লাভ করিত। সাধারণ কথোপকথনে তিনি হিন্দুর নানা সংস্কারের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন এবং দার্শনিক বিষয় অত্যন্ত সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। আমাদিগের মনে আছে, নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন-কালে যখন ভূমিকম্পে নাটোর সহর প্রায় বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি তাঁহার আলোচনার দ্বারা শঙ্কাকুল প্রতিনিধি-দিগের মনের চাঞ্চল্য প্রশমনে সহায় হইয়াছিলেন। মোহিনী বাবু পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মত নিষ্ঠা-সহকারে প্রচার করিতেন।

মোহিনী বাবু ও তাঁহার অনুজ রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। রমণী বাবু ত্রিপুরা রাজ্যে দাওয়ানের ও কলিকাতা কর্পোরেশনে নানা পদে কায করিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবু অন্য বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

পরলোকে রামেশ্বরপ্রসাদ—

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী আমাদের পরমস্নেহভাজন রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা সেদিন অকালে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। রামেশ্বরপ্রসাদ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ, চিত্র-শিল্পী, কলিকাতা আর্ট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিতঈশ্বরীপ্রসাদের পুত্র ছিলেন। আর্টস্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই রামেশ্বর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; মহারাজ তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রাজ-শিল্পী পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর পরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর নিজ ব্যয়ে রামেশ্বরকে উচ্চ চিত্রকলা শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের নিকট শিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রায় চারি বৎসর শিক্ষালাভের পর কয়েক মাস পূর্ব্বে রামেশ্বর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উৎসাহে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি চিত্রাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহার অঙ্কিত অনেক চিত্র 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রামেশ্বর যখন বিলাতে ছিলেন সেই সময়ই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়; এখন একমাত্র কন্যার ভার অশীতিপরবৃদ্ধ পিতার উপর সমর্পণ করিয়া রামেশ্বর অকালে চলিয়া গেলেন; আমরা একজন অকৃত্রিম বন্ধু, প্রতিভাশালী চিত্র-শিল্পী হারাইলাম।

মনোহর মুখোপাধ্যায়—

উত্তরপাড়ার জমীদার-পরিবারের মনোহর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার সমসাময়িকরা সকলেই ইতঃপূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ঃ—

"তারপরে গুড়ি গুড়ি এস বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভুত নসিব।"

মনোহর জয়কৃষ্ণের ভ্রাতা রাজকৃষ্ণের চারি পুত্রের অন্যতম। জয়কৃষ্ণের পুত্র রাজা প্যারীমোহন নানারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে হরিহর ও ও মনোহরই জমীদাররূপে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বগৃহে বিজ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ও গোপালনের পক্ষপাতী ছিলেন।

কোণার্ক

অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

১৯৩৪—ডিসেম্বর মাসে স্বাস্থ্যান্বেষণে ও বিশ্রামার্থে ৺পুরীধামে গমন করি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু এবং তীর্থরাজ সমুদ্রের কৃপায় অল্পদিনেই অভীষ্টলাভের পরে মনে বাসনা জাগিয়া উঠে, অবকাশের বাকী দিন কয়টা আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থানাদি দর্শন করিয়া কাটান যাইবে। অবস্থান করিতেছিলাম সমুদ্রতীরে বারিধিশোভা (sea-view) নামক হোটেলের দ্বিতলের একটি ঘরে, একাকী। হোটেলে নানারূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে, সকলের সহিত আলাপ করার বিশেষ প্রবৃত্তি ও অবসর আমার ছিল না, অথচ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিবার জন্য একাকী যাইতেও মন সরে না, সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। একদিন বৈঠকখানায় গিয়া কথাপ্রসঙ্গে কোণার্কের উল্লেখ করিলাম; কথায় কথায় ২।৪ জন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারাও যাইতে পারেন, যদি যাতায়াতের খরচ তেমন বেশী না হয়। হোটেলের একটি ভৃত্যের বাড়ী কোণার্কের নিকটে, সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। যান স্থির হইল ভারতের 'আদি ও অকৃত্রিম' গো-যান। নামটা গো-যানই বলিতে হইবে বটে, যানের আকৃতি সাধারণ গো-যানের ন্যায়ই বটে, কিন্তু চক্রগুলি অতি বৃহৎ—আর বসিবার স্থান সেই অনুপাতে অপ্রশস্ত; আর বলীবর্দ্দগুলি দেখিলে 'গোজাতি' না বলিয়া ঈষৎ বৃহৎ ছাগ বলিতে ইচ্ছা হয়; শীর্ণ শরীরে পঞ্জরাস্থি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, না চলিলে মনিব প্রহার করিবে এই ভয়েই তাহারা চলে, নিজের স্ফূর্ত্তিতে চলে না।

বৈকালে গো-যান-চালক গো এবং যানের নমুনা দেখাইয়া গেল; পরদিন বৈকালে 'যাত্রা' হইবে, ভাড়া যান প্রতি ৫৷৷০ (সাড়ে পাঁচ টাকা) স্থির হইল; আমার যানের বায়না বাবদ কিছু পয়সাও চালককে দিলাম। তিন দল যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, প্রত্যেক যানে ২ জন করিয়া যাওয়া হইবে; ২৪ মাইল পথ, সঙ্কীর্ণ গাড়ীতে শয়ন করিয়া যাইতে হইবে; অতএব স্থির হইল যে weightage (আজকাল কথায় কথায় weightage—ভারসমতা) ঠিক রাখিবার জন্য আমার সঙ্গে handicap (প্রতিবন্ধক) অর্থাৎ একটি বালক বা বালিকা থাকিবে; "তথাস্তু" বলিয়া সকলকে 'অভয়'দান করিয়া নিজের ঘরে যাইবার সময় পাচককে বলিয়া গেলাম, পরদিন বৈকালে যেন ভাল রকমের জলযোগের ব্যবস্থা থাকে।

যাত্রার সবই স্থির, কিন্তু মনটা বেশ প্রসন্ন হইল না। অতখানি পথ, সারারাত যাইতে হইবে, অল্পপরিসর যান, নিজের দীর্ঘায়ত কলেবর, দ্বিতীয় প্রাণী handicap বালক বা বালিকা যেই হউক পার্শ্বে থাকিবে—এই প্রাণীটির স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই আমাকে করিতে হইবে, অতএব আমায় খাড়া বসিয়া জাগিয়া দীর্ঘপথ অতিবাহন করিতে হইবে—মনটা বেশ প্রসন্ন হইল না। বায়না দিয়াছি, যাইতেই হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রীদিগের সহিত দেখা হইলে কেহ বড় একটা কথা কহিলেন না; ব্যাপার কি? বুঝিলাম, দুইদল পিছাইয়াছেন। একটু বিরক্ত হইয়া স্থির করিলাম, একাকীই যাইব। এমন সময়ে গো-যান-চালক আসিয়া 'দরশন' দিলেন; অন্য ২ খানি গাড়ীর বায়না বাবদ কিছু অর্থ লইয়া তিনি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিবেন এবং বৈকালে যথাসময়ে ৩ খানি গাড়ী লইয়া হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। যাত্রীদের ভাঙ্গমতি দেখিয়া বেচারির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম—"কেহ না যায়, আমি একাকীই যাইব"; তখন বেচারির মুখে উৎসাহের পরিবর্ত্তে 'কাঁচু-মাচু' চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে, সে বলিল—"একাকী যাওয়াটা কি বাবু, বড় ভাল হইবে?" [পরে কোণার্কে শুনিয়াছি, পথে ছইতলা নামক স্থানে একটু ভয়ের কারণ নাকি আছে।] সারথির কথায় যাত্রা বন্ধ করিতে হইল; বায়নার পয়সা ফেরত দিবার কথা বলিতে পারিলাম না। মনটা 'বিষাদ-যোগ' প্রাপ্ত হইল। ইতি উদ্যোগপর্ব্বের উপপর্ব্বাধ্যায়।

অথ উদ্যোগপর্ব্ব। বড়দিনের ছুটি নিকটবর্ত্তী হইলে হোটেলে যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কে আসে, কে

যায়, সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করি না। আমারই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে কে বা কাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ সকলেই বেশী রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এইটুকু লক্ষ্য করিলাম। বৃদ্ধ হইতে যুবা সকল হোটেলবাসীই ইঁহাদের সম্বন্ধে অত্যধিক সজাগ হইয়াছেন। একদিন নীচে নামিয়া যাইতেছি—বৈঠকখানা ঘরে নবাগতদের সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিতেছে শুনিতে পাইলাম। জল্পনার নমুনা—"ইহুদি?" "হ'তেও পারে"; "না, ও বৌ নয়"; "আরে, বৌ নয় ত অমন ক'রে কি বেড়াতে পারে?"—"মাথায় সিঁদুর কই?" "চোখে কাজল * দেখছেন না?" ইত্যাদি···

দুইদিন পূর্ব্বে এক যুবক তাঁহার পত্নীসহ হোটেলে আসিয়াছেন; বুঝিলাম, ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই জল্পনা। জল্পনার হেতু—ইঁহাদের অতি-আধুনিকত্ব (ultra-modernism)। কিশোরী দেখিতে সুন্দরী, মস্তকে রাশীকৃত, হ্রস্ব, কুঞ্চিত, অবেণীসম্বদ্ধ কেশ, পরিধানে অত্যাধুনিকীর বেশ ['আধুনিকা' লিখিতে পারিলাম না, যদিও মস্ত বড় একজন সাহিত্যিক তাহা লিখিতেছেন] মস্তক সম্পূর্ণ অনাবৃত, সুকুমার করে সুকুমারতর যষ্টি দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত; যুবক সাধারণ বেশধারী, যেন বেশ-পরিপাট্যে উদাসীন; কিশোরী যুবকটির সহিত যখন-তখন লীলায়িত গতিতে হোটেল হইতে বাহির হইতেছেন, ঢুকিতেছেন, সমুদ্রতটে বিচরণ করিতেছেন। হোটেলবাসীরা ইঁহাদের আচরণে একটু বিব্রত হইয়াছেন; তদুপরি ইঁহাদের অপরাধ, ইঁহারা কাহারও সঙ্গে মেশেন না; এই হইল ব্যাপার! আমাকে বৃদ্ধগোছের দেখিয়া বৈঠকখানায় সমবেত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়, একটু খোঁজ খবর রাখুন না, আপনারই ত পাশের ঘরে ওঁরা আছেন।" হাসিয়া বলিলাম—"দেখা যাবে।"

২৫শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাত্রি ৮।৩০। উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল কৃত শ্রীশ্রীগোপীগীতের প্রাণ-মাতান ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রায় অন্যমনা হইয়া হোটেলে ফিরিলাম। তখন 'কালরাত্রি' (পঞ্জিকামতে ৭।১ হইতে ৮।৫১ কালরাত্রি)। অন্যমনা হইয়াই নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে চলিয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম—সম্মুখেই জুজু! অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট যুবক ও কিশোরী। পূর্ব্বক্ষণেই শুনিয়া আসিয়াছি, গোপীরা দয়িতের সন্ধানে ঘুরিতেছেন, কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, চিরকালের 'চেনা'র কাছে কত আকূতি নিবেদন করিতেছেন। আজ এই রাত্রিতে, চিরকালের 'অচেনা' আমার কাছে ইঁহারা কিছু চান নাকি! গোপীদের 'নিষ্ঠুর' দয়িতের ন্যায়ই ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, একটি সসঙ্কোচ ধ্বনি কাণে প্রবেশ করিল—'একটা কথা বলিতে চাহি'? শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহিরে গেলাম এবং যেখানে শব্দ উত্থিত হইল সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"কি, বলুন।"

যুবক। শুনিলাম, আপনি কোণারকে যাইতে চাহেন; আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন? আমরা ছেলেমানুষ, বিদেশে কখনও বাহির হই নাই, আপনি বিজ্ঞ (অর্থাৎ কোমল ভাষায়, বুড়ো), আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের কোনও ভয় থাকে না; যাইবেন? আমাদের "মোটর" ঠিক হইয়াছে।

আমি। আমি কোণার্ক যাইতে চাহি বটে; যদি আপনারা আমার নিকট মোটর-ভাড়ার অংশ গ্রহণ করেন, তবেই আমি যাইতে পারি।

যুবক। সে তখন দেখা যাইবে, তার জন্য কি? চলুন ত!···আচ্ছা, আজ ঘুমাইতে যাই, কাল সকালে যাত্রা করা যাইবে, কেমন?···

বেচারির উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি। আরও একটা কথা। আমি আপনাদের নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমি কিরূপ লোক তাহা আপনারা জানেন না, আমাকে সঙ্গে লওয়া কি আপনাদের পক্ষে উচিত হইবে? আর, আমিও আপনাদের কোনই পরিচয় জানি না, আমিই বা আপনাদের সঙ্গে যাইব কেন?

যুবক। আপনাকে আমরা আনন্দের সহিত সঙ্গে লইব,

* সুলক্ষণা রমণীর চোখের পাতা খুব ঘন, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন কাজল পরিয়াছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'ভাবিক' অলঙ্কারের দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়াছেন—"আসীদঞ্জনমত্রেতি পশ্যামি তব লোচনে"—হে নারী! তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে কাজল ছিল (অতীত হইলেও)—দেখিতেছি। সাহিত্য-দর্পণ ১০।৯৩

আপনার পরিচয় আমরা জানি। তবে আমাদের পরিচয় না পাইলে যদি আপনার যাইতে আপত্তি থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।

আমি। আমার আপত্তি না থাকাই কি অস্বাভাবিক নহে?

যুবক তখন নিজের পরিচয় দিলেন; নিজের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম বলিলেন; কি কর্ম্মাদি করেন তাহা বলিলেন; তাঁহার পিশামহাশয়কে আমি হয় ত জানিতে পারি—ইহাও বলিলেন। ইঁহার পিশামহাশয় সত্যই আমার বিশেষ পরিচিত, সোদরপ্রতিম। এই সময় কিশোরী আসিয়া আমাদের নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন নব-অনুরাগ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কিশোরীর দিকে চাহিয়া যুবক বলিলেন—আপনি অমুক স্থানের ডাক্তার অমুককে জানেন ত? ইনি তাঁহার "পঞ্চমী কন্যা"; ৭ মাস হইল ইঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। কিশোরী ঈষৎ লাজ-বিনম্র হইলেন। যুবক হাসিয়া বলিলেন—"এখন ত সব জানিলেন, এখন ত আপনার আমাদের সঙ্গে যাওয়ায় আপত্তি হইবে না?" হাসিয়া সম্মতি দিলাম। তখন কত ঘরোয়া কথা হইল। পরের দিন কি কি পাথেয় সঙ্গে লইতে হইবে সে সবের হিসাব হইল, কখন যাত্রা করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে হোটেলের 'খাদ্য' পাওয়া যাইবে কি না, সমস্তই আলোচিত হইল।

পরদিন সকালে আহারান্তে যাত্রা করিতে হইবে। 'শ্রীমান্'—বলিলেন, সমুদ্র স্নানটা ত সারিয়া যাইতে হইবে। 'শ্রীমতী' বলিলেন যে সমুদ্রে নামিতে তাঁহার বড় ভয় হয়। আমি বলিলাম—"তুমি (আমার কন্যার অপেক্ষা বয়সে ছোট কিশোরীকে 'তুমি'ই বলিয়া ফেলিলাম, 'আধুনিক'গণ ক্ষমা করিবেন) মা, আমার সঙ্গে যাইও, ভয় পাইবে না। বেচারিরা হোটেলে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে না পারায়, বোধ হয় হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল; আমাকে আত্মীয়ের মতই গ্রহণ করিল।

অথ যাত্রার পূর্ব্বে সমুদ্র স্নান। সকালে উঠিয়াই তাগাদা দিলাম—"কৈ গো মা, যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত ত? স্নানে যাবে না?" মা আমার স্নানের নীল-পোষাকের* (bathing costume) উপর সাড়ী পরিধান করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত, আর সঙ্গে শ্রীমান্ একটা এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত 'মগ'-হস্তে প্রস্তুততর! জিজ্ঞাসা করিলাম, সমুদ্রটা কি কলিকাতার চৌবাচ্ছা, মগে করিয়া জল তুলিয়া স্নান হইবে? উভয়েই হাসিলেন, কিন্তু মগ-মহাশয় সঙ্গেই চলিলেন। তারপর সমুদ্র-স্নানের সে কি (দীর্ঘ ঈকার দিতে ইচ্ছা হয়) দৃশ্য! আমি গভীর জলে চলিয়া গিয়াছি, তরঙ্গের সঙ্গে আমার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ তীরের দিকে ফিরিয়া দেখি যে, শ্রীমতী ভিজা বালুকায় দাঁড়াইয়া আছেন, ক্ষুদ্র তরঙ্গের শেষ ফেনিল প্রান্তটুকু তাঁহার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া আত্মনিবেদন করিতেছে এবং তাহারই একটুখানি ফেনিল ও বালুকামিশ্রিত জল 'মগে' তুলিয়া লইয়া শ্রীমান্ শ্রীমতীর গায়ে ঢালিতেছেন! তখন জলে আমি একাকী, একাকী কত হাসিব! চীৎকার করিলাম—"এগিয়ে এসো, ভয় নেই, ও কি হ'চ্ছে?" কে শোনে সে কথা! বালুকার উপরে দাঁড়াইয়া 'মগে' সমুদ্র জল লইয়া তাহাতে স্নান—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, কখনও কল্পনায় আনা যায় না। হাতের কাছে 'ক্যামেরা' থাকিলে এই দৃশ্যের 'ফটো' তুলিয়া কাগজে পাঠাইলে কিছু অর্থ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত! যাক, যথাসম্ভব শীঘ্র স্নান সমাপ্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে হোটেলে ফিরিয়া বলিলাম—'মা তোমার এই স্নানপর্ব্বটির বিবরণ আমি লোকের সমক্ষে প্রচার করিব।' শ্রীমতী হাসিমুখে অনুমতি দিয়া বলিলেন—"আমার নামটা দিবেন না ত?" সকলেই খুব হাসিলাম।

বেলা ৯।১৫ মিনিট, মোটরে যাত্রা করা গেল। পাথেয় আমার সঙ্গে থাকিল কিছু রসগোল্লা ও ৪টি ডাব। শ্রীমানেরা কেট্‌লি, কাগজের পুটুলি, থার্ম্মো-বোতল ইত্যাদিতে কি—কি—সব লইলেন। মোটরের মাইল-মিটারের অঙ্কটা লিখিয়া রাখিলাম—৪২৮৭৫। চালক বলিলেন, রাস্তায় নদী আছে তাহাতে পুল নাই, অতএব ঘুরিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে ৫০।৫২ মাইলের স্থানে ৭২ মাইল হইবে। তাহাই স্বীকার। গো-যানে পথের পরিমাণ অল্প, দেশী 'আদি ও অকৃত্রিম' যানে ব্যয়ও অল্প, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে, আজকালকার মানুষের নাকি অবসর বড় অল্প; আর গো-যানে গতির বা চলার একটা উৎকট ঝাঁঝালো আনন্দ নাই, মোটরের দ্রুতগতিতে সেটা পাওয়া যায়। ব্যয়ও হয় ৩০।৩৫৲ টাকা। ৭২ মাইল! আচ্ছা তাহাই স্বীকার!

মোটর দ্রুতবেগে প্রায় উত্তরমুখী কটক-রোড দিয়া ছুটিল। পুরীর বাহিরের দৃশ্য বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের দৃশ্য হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। তবে এ অঞ্চলে জগন্নাথদেবের বিশেষ প্রাধান্য থাকায় পথের ধারে মাঝে মাঝে দেখা গেল "চন্দন-সরোবর"; সরোবরের মাঝখানে ক্ষুদ্র মন্দির; গ্রামবাসীরা সেখানে দেবমূর্ত্তি লইয়া গিয়া পুরীর চন্দনযাত্রার অনুকরণে উৎসবাদি করেন। মাঝে মাঝে বস্তি, মাঝে মাঝে মাঠ। পথ অতি প্রশস্ত, দুই পার্শ্বে নানাবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শ্রেণী পথের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথে উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কেবল শ্রীমান্ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—হোটেলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কোনও জল্পনা চলিতেছে। শ্রীমতী প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন। ব্যাপারটা যতদূর বলা চলে, ততদূর বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বুঝাইলাম যে, সংসারে চলিতে হইলে সমাজের নিয়ম-কানুন কিছু মানিয়া চলা ভাল, তাহাতে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীমান্ বলিলেন—"ও ত (অর্থাৎ শ্রীমতী) মাথায় কাপড় দিতেই চায়, আমার ওটা ভাল লাগে না বলিয়া জোর করিয়া মাথার কাপড় খসাইয়া দিই। আর, আমার বন্ধু মিঃ অমুক আই, সি, এস (I. C. S.) তাঁহার পত্নীকে লইয়া এই ভাবেই ত বেড়াইয়া থাকেন, আমাদের বেলায় তাহাতে দোষ হইবে কেন?" হাসিয়া উত্তর দিলাম—"আই, সি, এসরা প্রকাণ্ড ব্যক্তি, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন; অন্যের কি তাহা করা শোভন? তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা খাটে—'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'—অতি তেজস্বীর পক্ষে অনেক কার্য্য দোষাবহ না হইতেও পারে। আর দেখুন, অনুরূপ আই, সি, এসও আছেন। আমার একজন অধ্যাপকের পুত্র যুবক আই, সি, এস কাছারীর বাহিরে এমন গৃহস্থ চা'লে থাকেন যে, কেহ না বলিয়া দিলে বুঝিতেই পারা যায় না যে তিনি প্রকাণ্ড হাকিম।" এইরূপে যথাসম্ভব কোমল করিয়া, শ্রীমান্‌দের আচরণ কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিলাম। হোটেলের লোকজনেরা আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেখিবেন মহাশয়, একটু সামলাইয়া দিবেন।" ইঁহারা ভালভাবেই সকল কথা গ্রহণ করিলেন, তাহা ইঁহাদের পরবর্ত্তী আচরণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছিল।

আমরা প্রায় ২৫।২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময়ে মোটর-চালক বলিলেন—'ঘোরা-পথে না গিয়া দেখিব নাকি—এ পথে যাওয়া যায় কি না।' সকলেই য়্যাড্‌ভেঞ্চারের (সঙ্কট)—গন্ধে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"নিশ্চয়ই।" তখন গাড়ী পাকা রাস্তা ছাড়িয়া ডানদিকে এক অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ধরিয়া চলিল এবং অল্পক্ষণ পরে এক নদীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। নদীর উপরে সেতু নাই, অথচ নদী পার হইতে হইবে! চালক, শ্রীমান্ ও আমি নামিয়া পড়িলাম। আমার যষ্টি হাতে লইয়া ও জুতা খুলিয়া শ্রীমান্ পল্লীর বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে জলে নামিলেন—"এক বাম্ মিলে" কি না দেখিবার জন্য। চালকও নামিলেন। জল ১॥ হাতের বেশী গভীর নহে, জলের নীচে বালুকা। তখন মোটরের হাতল ঢুকাইবার গর্ত্তে খানিকটা ছিন্ন বস্ত্র গুঁজিয়া দেওয়া হইল, নতুবা ইঞ্জিন-যন্ত্রে জল ঢুকিতে পারে। শ্রীমতী পাছে ভয় পান এজন্য গাড়ীতে আমায় থাকিতে হইল। শ্রীমান্ হাসিতে হাসিতে নদী পার হইয়া গেলেন; তদ্দর্শিত পথে আমাদের মোটর নামিয়া ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জলের নীচেকার বালুকার উপর দিয়া নদী পার হইয়া গেল। মাইল-মিটারে উঠিয়াছে ৪২৯০২ অর্থাৎ আমরা পুরী হইতে ২৭ মাইল আসিয়াছি। ২।৪ জন গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইঁহারা মুসলমান। গ্রামের নাম জানিয়া লইলাম—'হরিপুর শাসন'; উত্তীর্ণ নদীটির নাম—'ভার্গবী'।

মোটর আবার যাত্রা আরম্ভ করিল; এবার সোজাসুজি গন্তব্যস্থানে পৌছান যাইবে। দুই পার্শ্বে মাঠ, মধ্যে উঁচু পথ, কাঁচা পথ হইলেও পথ ভাল। হু হু শব্দে মোটর ছুটিতেছে, হঠাৎ মোটর থামিয়া গেল, মাঠের মাঝে পথ নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়াছে। আবার নামা হইল; এবার নদী নহে, জলা; বর্ষায় পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাইল-মিটার জানাইল, হরিপুর শাসন হইতে মাত্র ৮ মাইল আসিয়াছি। আবার জলে নামিয়া জল মাপা হইল, আবার হাতলের গর্ত্তে বস্ত্রখণ্ড গুঁজিয়া দেওয়া হইল, আবার মোটর

* পুরী-যাত্রীর নাকি ওটা (bathing costume) সঙ্গে রাখিতেই হয়, নতুবা ফ্যাসান মারা যায়! তা স্নানটা যে ভাবেই হয়, হউক!

জলে নামিল; এবার জলের নীচে বালুকার পরিবর্ত্তে কর্দ্দম; চালক কৌশল করিয়া মোটর চালাইয়া জলা পার হইলেন; সকলেই নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম। মোটর চলিতে লাগিল। 'গোপ' থানা ও 'গোপ' গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা পৌঁছিলাম "মৈত্রেয়-অরণ্যে"; তখন বেলা ১২।৩৫ মিনিট। এক ক্ষুদ্র পুন্নাগ-ঝোপের মাঝে মোটর বিশ্রাম লইল। মাইল মিটারে উঠিয়াছে ৪২৯২৭ অর্থাৎ ৫২ মাইল অতিক্রম করা হইয়াছে। অরণ্যের চিহ্ন বড় একটা নাই, আছে সুদূর বিস্তৃত প্রান্তর—আর সম্মুখে প্রসারিত বালুময় দীর্ঘ পথ। "দীর্ঘ পথ হেরি ক্ষান্ত" হইলে চলিবে না; মোটর হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাত্রা সুরু করা গেল। একটি স্থানীয় লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ডাব চারিটি বহনের ভার দেওয়া গেল। আরও ডাব সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তাহা গাছে আছে, সংগ্রহ করিতে সময়ক্ষেপ হইবে; আমাদের সময় সংকীর্ণ, ডাবের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। যাত্রা চলিতে থাকুক, মৈত্রেয় অরণ্যের কথা কহিয়া রাখি।

শাম্বপুরাণ নামক একখানি উপপুরাণ আছে। তাহাতে শাম্বের অভিশাপ-প্রাপ্তির এক বিবরণ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জাম্ববতী-নন্দন শাম্ব দেহ-সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এজন্য তাঁহার মনে সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব ছিল। এই গর্ব্ব নাশ করা আবশ্যক হওয়ায় এক কূট-চক্রের আয়োজন হইল। নারদ একদিন কৌশল করিয়া শাম্বকে এক জলাশয়ের তীরে লইয়া গিয়া তত্রস্থ উদ্যানের শোভা দেখাইতেছিলেন। ঐ জলাশয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ জলক্রীড়া করিতেছিলেন, শাম্ব তাহা জানিতেন না। শাম্বকে উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণে ব্যাপৃত রাখিয়া নারদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিলেন যে, শাম্ব নিজের রূপ-গৌরবে এতই মত্ত হইয়াছেন যে, নিজ রূপ দেখাইবার জন্য জলক্রীড়ারত মহিষীগণের সম্মুখে নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন এবং অভিশাপ দিলেন—শাম্বের রূপ নষ্ট হইবে এবং তাঁহার শরীর কদর্য্য হইয়া যাইবে। শাম্ব পিতার শ্রীচরণে পতিত হইয়া নিজের নির্দ্দোষত্ব নিবেদন করিয়া শাপ-মোচনের প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শাম্বের নির্দ্দোষত্বের প্রমাণ পাইয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন—"মৈত্রেয় অরণ্যে গমন করিয়া সূর্য্যের প্রসন্নতা অর্জ্জনের জন্য দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর।" শাম্বের কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিল, নবনীত-কোমল অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ কুৎসিত আকার ধারণ করিল। লজ্জায় শাম্ব দ্বারকা ত্যাগ করিলেন এবং লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার উপদেশ অনুসারে মৈত্রেয় অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি মৈত্রেয় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন; ইহা পূর্ব্বসমুদ্রের তীরে অবস্থিত।*

শাম্ব কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। নিত্য প্রাতঃস্নান, নিত্য সূর্য্যপূজা, রোগক্লিষ্ট নগ্নগাত্রে সূর্য্য কর-আলিঙ্গন ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে সূর্য্য স্বপ্নে শাম্বের নিকটে আবির্ভূত হইয়া উপদেশ দিলেন—তুমি আমাকে যে নিত্য পূজাদি করিতেছ ইহাতে তোমার অত্যধিক ক্লেশ হইতেছে; দীর্ঘ স্তবপাঠে তোমার রুগ্ন কৃশ ধমনিসন্তপ্ত শরীর অতিমাত্রায় ব্যথিত হইতেছে; কল্য হইতে তুমি এই স্তব পাঠ করিবে, ইহাই আমার স্তবরাজ।

* সূর্য্যের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিবার জন্য ভারতবর্ষের পশ্চিম-কূলে অবস্থিত দ্বারকা হইতে পূর্ব্বকূলে অবস্থিত মৈত্রেয়ারণ্যে শাম্বের আগমনের ভিতর উন্মুক্ত সমুদ্রতীরে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের রোগ-অপনয়ন-কর ultra-violet-rays সেবনের ইঙ্গিতাদি আছে কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

শাম্বের কুষ্ঠরোগপ্রাপ্তি ও আরোগ্য সম্বন্ধে অন্যবিধ উল্লেখও পুরাণে দেখা যায়, যথা—

(১) পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড—১৩, শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হন।

(২) স্কন্দপুরাণ—নাগরখণ্ড—২১৩, শাম্ব পরম রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পুরনারীগণের মোহের কারণ হইয়াছিল। একবার শাম্বের এক বিমাতা-নন্দিনী শাম্বের রূপে মুগ্ধ হইয়া শাম্বের অজ্ঞাতসারে তাঁহার শয্যাভাগিনী হন (৩০ শ্লোক)। এই অজ্ঞাত পাপের জন্য শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তৎপরে তিনি হাটকেশ্বর তীর্থে কুহরদেবের (সূর্য্যের) আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। (নাম কুহরবাসাখ্যা সংজ্ঞা মম ভবিষ্যতি—১১ শ্লোক)।

(৩) বরাহপুরাণ—১৭০—একদিন শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও গোপিকাগণ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শাম্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। শাম্বকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীদের মনোবিকার উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শাম্বের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া 'বিকৃতাকার হও' বলিয়া অভিশাপ দেন। শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে নারদের পরামর্শে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া শাম্ব রোগমুক্ত হন। (পূর্ব্বাচলে তু পূর্ব্বাহ্নে উত্তস্তং তু বিভাবসুম্। নমস্কুরু যথান্যায়ম্ ..... ৩৩।৩৪ শ্লোক)।

বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥
.....ইত্যাদি

শাম্ব এই স্তবরাজের দ্বারা সূর্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া পবিত্রদেহ, নীরোগ ও সৌন্দর্য্যবান্ হইলেন।

কপিলসংহিতায় (উপপুরাণ) আছে—তপস্যান্তে শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে উঠিবামাত্র পদ্মের উপরে আসীন সূর্য্যের একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শাম্ব তাহাতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং এই মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে সহসা রোগমুক্ত হইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

গৃহীত্বা প্রতিমাং তাঞ্চ যযৌ শাম্বো মহামতিঃ।
প্রাসাদং কারয়িত্বা চ স্থাপয়ামাস সদ্বরঃ॥
তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্ ভক্ত্যা নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বিমুক্তরোগঃ সহসা যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্॥*

শাম্বকর্ত্তৃক স্থাপিত বিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির অবশ্যই এখন নাই; তাহার পরিবর্ত্তে কোণার্কের বিখ্যাত মন্দির এক্ষণে আকাশ ভেদিয়া দণ্ডায়মান।** দূর হইতে এই মন্দির দেখিয়া আমি যখন সূর্য্যস্তবরাজ পাঠ করিতেছিলাম, তখন আমার সঙ্গিনী অত্যাধুনিকী শ্রীমতী ও শ্রীমান্ আমার সহিত স্তবপাঠে যোগ দিলেন, ভক্তিসহকারে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ভাবিলাম, একমাত্র পোষাক ছাড়া আর কিছুতে আমাদের মেয়েরা এখনও অতি আধুনিক হইতে পারেন নাই; আধুনিক পোষাকের দ্বারা আচ্ছাদিত বাঙ্গালী নারীর হৃদয় এখনও দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণই আছে।

ব্রহ্মপুরাণমতে এই স্থান "লবণস্যোদধেস্তীরে"—লবণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। কিন্তু আজকাল এই স্থান হইতে সমুদ্র ২ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে; এককালে যে এইস্থানে সমুদ্র ছিল তাহা বালুময় প্রান্তর দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রভাগা নদী এখন ১½ মাইল দূরে বালুময় হইয়া পড়িয়া আছেন। এই চন্দ্রভাগার তীরে একদিন এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। কপিলসংহিতায় এই স্থানের নাম মৈত্রেয়-অরণ্য; শিবপুরাণে স্কন্দের তীর্থযাত্রা প্রকরণে এই স্থানকে বলা হইয়াছে সূর্য্যক্ষেত্র; ব্রহ্মপুরাণে এই স্থানের নাম কোণাদিত্য (কোণাদিত্য ইতি খ্যাতস্তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থিতঃ। যং দৃষ্ট্বা ভাস্করং মর্ত্তাঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়); অর্ককক্ষেত্র এবং পদ্মক্ষেত্রও ইহার নাম। চক্রক্ষেত্র (আজকালকার পুরীধাম) হইতে ঈশান কোণে ব্যবস্থিত বলিয়া এই ক্ষেত্রের নাম হইয়াছে কোণ-ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের সূর্য্যের নাম কোণাদিত্য বা কোণ-অর্ক=কোণার্ক; চলিতভাষায় স্থানের নাম হইয়াছে কোণারক।

* পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড—১৩ অধ্যায় মতে শাম্ব সৌরশাস্ত্রপ্রণেতা এবং মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্যে অতিশয় কুশলী ছিলেন।

** মন্দিরের উচ্চতা ২২৮ ফুট; জগন্নাথের মন্দির ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি।

যে স্থানে আমরা মোটর ত্যাগ করিয়াছি, সে স্থান হইতে কোণার্কের মন্দির ১½ মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র; শীতের রৌদ্র হইলেও প্রখর; ১½ মাইল বালুময় পথ; আমরা সকলেই ছত্রহীন—মোটরে চড়িয়া মন্দিরের দ্বারে নামিব ভাবিয়া কেহই ছত্র সঙ্গে আনি নাই; এই পথ অতিক্রম করিতে কাহারও কাহারও ক্লেশ যে না হইল এমন নহে, তবে পুরাণ-কথা আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় অনুভূত ক্লেশ কেহই বড় গ্রাহ্য করিলাম না।

কপিল-সংহিতা অনুসারে মৈত্রেয়-অরণ্য, সূর্য্যমন্দির, শ্রীমঙ্গল ও শ্রীশাল্মলী তীর্থ পুষ্করিণী, সূর্য্যগঙ্গা, চন্দ্রভাগা, সমুদ্র, সমুদ্রতীরে রামেশ্বর-মন্দির এবং কল্পবট—এই পাঁচটি স্থানগুলি কোণার্কের সন্নিকটে অবস্থিত। আমাদের সময়-সঙ্কোচ, সকল স্থান দর্শন করিবার প্রবৃত্তি হইল না। এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। দু-চার খানি গো-যান একসঙ্গে আসিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গো-যানেই আসা ভাল; গো-যান সকালে পৌঁছে। সারাদিন কোণার্কে থাকিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া সন্ধ্যায় রওনা হইলে পরদিন সকালে পুরীতে পৌঁছান যায়। রেলে মোটরে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, তাড়াতাড়িই ফিরিতে হয়; তীর্থযাত্রীর মন অত ত্বরান্বিত না হওয়াই ভাল। সকল কাজ ফেলিয়া আসিয়াছি, সকাল সকাল না ফিরিলেই কাজ নষ্ট হইবে, আহারের অসুবিধা হইবে, নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে—এই সকল চিন্তা লইয়া তীর্থে (কোণার্ক শিল্পীর তীর্থ, ঐতিহাসিকের তীর্থ, ভ্রমণকারীর তীর্থ) গেলে তীর্থের ফল পাওয়া যায় না। আমরা মোটরে গিয়াছিলাম, মোটরেই ফিরিয়াছি, কিন্তু আমার অভিমত এই যে, যাঁহারা কোণার্কে যাইবেন তাঁহারা যেন পুরা একটি দিন হাতে লইয়া যান; এক কোণার্কেই এত দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে যে, পুরা দিন দেখিলেও তন্ন তন্ন করিয়া দেখা শেষ হয় না।*

বেলা ১।১৫ মিনিটের সময় আমরা সূর্য্যমন্দিরের হাতায় (compound) উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড হাতা, দৈর্ঘ্যে ৮৫৭ ফুট, প্রস্থে ৫৪০ ফুট, চারিদিকে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া

* এস্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য ডাক-বাঙ্গালা আছে। মন্দির হইতে বেশী দূর নয়। মালীকে কিছু বখ্‌শিস দিলে আহার্য্যাদির ব্যবস্থাও হইতে পারে। মন্দিরের নিকটেই নিরঞ্জন-মঠ আছে, সেখানে বসিয়াও বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে। আহার্য্যের অপক্ক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গেলে মঠে রন্ধনাদি করিয়া আহার চলিতে পারে।

প্রাচীর ; এই প্রাচীর একদিন ১৪ ফুট উচ্চ ছিল, এক্ষণে ৩।৪ ফুট হইবে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থমতে প্রাচীর ১৯ হাত চওড়া, ১৫০ হাত উচ্চ ছিল !! হাতার পশ্চিমদিকে ঝাউগাছের ছায়ায় সকলেই বসিলাম। সকলেই অল্পবিস্তর ক্লান্ত। ডাবের ছোবড়া কাটিয়াই আনা হইয়াছিল, এক্ষণে ছুরি দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া ডাবের মুখ খোলা আরম্ভ হইল। প্রথমটি 'মা-ঠাকরুণ'কে দিলাম ; তিনি 'না' 'না' 'আপনি খান' ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। বেচারির মুখ রৌদ্রে লাল হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে আমাদের আত্মীয়তা একটু গাঢ় হইয়াছে ; বলিয়া ফেলিলাম—'বেটি, আগে নিজেকে ঠাণ্ডা কর, তারপর আমাদের কথা ভাবিও।' বেচারি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ডাবের জল পান করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অন্য তিনটি ডাবের সদ্ব্যবহার করা হইল। এর মধ্যে ছুরি ফস্‌কাইয়া নিজের অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিয়াছি, কাহাকেও জানিতে দিই নাই। পরে অঙ্গুলিতে রুমাল বাঁধা দেখিয়া শ্রীমতী বহু আর্ত্তি-কাতরতা প্রকাশ করিলেন। ভাবিলাম—বাঙ্গালীর মেয়ে ত ! যাঁহারা কোণার্ক যাইবেন, তাঁহারা অনেকগুলি ডাব ও কাটারি সঙ্গে না রাখিলে তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পাইবেন।

হাতার পশ্চিম প্রান্ত হইতে মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড ভগ্ন-প্রস্তর-স্তূপ বলিয়া মনে হয়। ইহারই এত প্রসিদ্ধি ! দেশ-দেশান্তর হইতে মানুষ আসে এই মন্দির দেখিতে ! দূর হইতে এইরূপই মনে হয় ; নিকটে গিয়া মন্দিরের কারুশিল্প দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে হয়—"হায় ! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল-গড়া

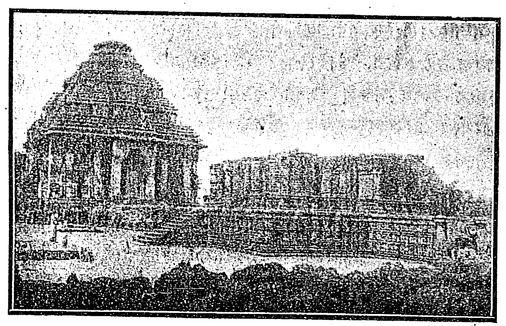

মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

শিখিতে হয়।···কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।"···পাথর "এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু ?···তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক···এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি। তখ মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থ করিয়াছি।" (বঙ্কিমচন্দ্র, সীতারাম ১ খ,—১ পরিচ্ছেদ)

মনে শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত বিস্ময় লইয়া আমরা বসিলা মন্দিরের নিকটে। মন্দিরের ৩ অংশ, বিমান অর্থা দেববিগ্রহের মন্দির, জগমোহন অর্থাৎ আমাদের সাধার চলিত ভাষায় সম্মুখস্থ নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ। মন্দি পূর্ব্বমুখী, প্রকাণ্ড একখানি রথরূপে পরিকল্পিত, যেন র পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। পৃথিবীর আবর্ত্তন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ইহারই কি প্রতীক পূর্ব্বমুখী রথ ? কোণার্কের মন্দির নির্ম্মাতারা সূক্ষ্মরূপে পূর্ব্ব-দিঙ্-নিরূপণ করিয়া লইয়াছিলেন প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের দিঙ্-নিরূপণ বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধা উপায়-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যথা—

শিলাতলেঽম্বুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্কুঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্বাদশাঙ্গুলম্।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্ যত্র বৃত্তে পূর্ব্ব পরার্দ্ধয়োঃ ॥
তত্র বিন্দু বিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বপরাভিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা ॥
যাম্যোত্তরদিশোর্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা।
দিঙ্মধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেব হি ॥

তৃতীয় অধ্যায় ১-৪

শিলাতলকে জলের দ্বারা (পরীক্ষা করিয়া) সমতল অর্থাৎ লেভেল (level) করিয়া লইয়া তাহার উপর, অথবা সমান পাকা চুণের মেঝের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ইহার কেন্দ্রে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ একটি শঙ্কু (gnomon) লম্বভাবে (vertically) স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ঐ শঙ্কুর ছায়ার অগ্রভাগ পূর্ব্বাঙ্কিত বৃত্তকে যে যে স্থানে স্পর্শ করিবে তথায় পশ্চিম ও পূর্ব্ব বিন্দু নামে দুইটি বিন্দু চিহ্নিত করিয়া লইবে। পরে ঐ দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে তিমি (দুই বৃত্তের ছেদে উৎপন্ন মৎস্যাকার ক্ষেত্রের নাম তিমি) হইবে, সেই তিমির মধ্য দিয়া রেখা টানিলেই তাহা যাম্যোত্তর রেখা বা দ্রাঘিমা বা meridian হইবে। এক্ষণে যাম্যোত্তর বিন্দুর মধ্যস্থিত তিমির ভিতর দিয়া রেখা অঙ্কিত করিলেই তাহা পূর্ব্ব-পশ্চিমা (east-west line) হইবে ; এইরূপে নির্ণীত বিন্দুর মধ্যস্থ তিমি দ্বারা অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী ঈশানাদি দিক্ নির্ণয় করিবে।

সঙ্গের চিত্র হইতে প্রক্রিয়া বুঝার সুবিধা হইবে—
ক = শঙ্কু
খ = পশ্চিমবিন্দু
গ = পূর্ব্ববিন্দু

ক খ = পূর্ব্বাহ্নে ছায়া
ক গ = অপরাহ্নে ছায়া
ঙ ঘ = যাম্যোত্তর
পূ = পূর্ব্ব
প = পশ্চিম
পূপ = পূর্ব্ব পশ্চিমা রেখা

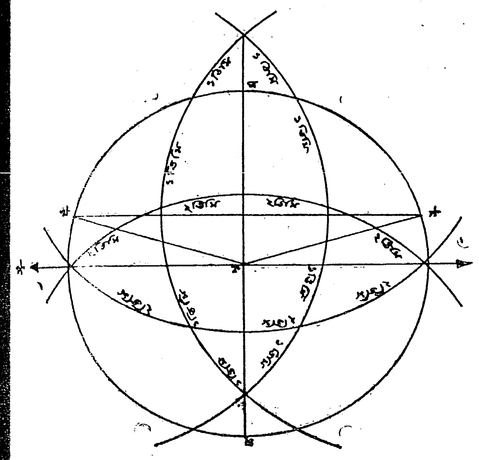

এই প্রণালীতে যে পূর্ব্ব দিক্ নির্ণীত হইত তাহা আজকালকার Prismatic Compass এবং Theodolite যন্ত্রদ্বারা নির্ণীত পূর্ব্বদিক হইতে তফাৎ হইত না। হাওড়ার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় Prismatic Compass এবং Theodolite দ্বারা একাধিকবার মন্দিরের দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার ৩৬০° এবং দক্ষিণদ্বার ২৭০°। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অভাবেও উড়িষ্যার শিল্পীদের এরূপ যথাযথ দিঙ্-নিরূপণ-পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ বড় অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। (মনোমোহনবাবুর Orissa & Her Remains দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমপ্রান্তে বিমান অবস্থিত। জগমোহনে প্রবেশ করিয়া জগমোহন পার হইয়া বিমানে প্রবেশ করিতে হইত। এক্ষণে জগমোহনের দ্বার প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমান ভগ্নদশায় অবস্থিত। পশ্চিমদিকে সিঁড়ি বাহিয়া কিছু উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া বিমানের দেববিগ্রহস্থানে যাওয়া যায়। আমরা সকলেই এইরূপে বিমানের অভ্যন্তরে বা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তর সমচতুষ্কোণ, আয়তন ৩২′—১০″ × ৩২′—১০″। জগমোহন হইতে বিমানে প্রবেশের দ্বারও প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বারের কারুকার্য্যখচিত ঠাট (frame) দাঁড়াইয়া আছে, উচ্চতার মাপ ৯′—১০½″। এই দ্বার বিমানের মেঝে হইতে কিছু উচ্চে অবস্থিত, সম্ভবতঃ দ্বারের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এক্ষণে কোনও সূর্য্যবিগ্রহ নাই, সিংহাসন বা পাদপীঠ খালি আছে। কেহ কেহ বলেন যে, পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের হাতায় সূর্য্যমন্দিরে যে মূর্ত্তি আছে তাহাই নাকি কোণার্ক হইতে তথায় নীত হইয়াছিল। সিংহাসন বা পাদপীঠ কাল মুণ্ডলি প্রস্তরে (chlorite stone) নির্ম্মিত, ৪′—৮″ উচ্চ। পাদপীঠের গাত্রে প্রস্তরে উৎকীর্ণ সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তীর শ্রেণী। তদুপরি অনেকগুলি কুলুঙ্গীর ন্যায় স্থানে (niches) পূজার্থী ও পূজার্থিণীর ভক্তিবিনম্র মূর্ত্তির শ্রেণী। প্রত্যেকের মুখে এমন একটি ভাব প্রকটিত যাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, শিল্পীরা নিজেদের প্রাণের রসে যেন ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এই সিংহাসন ছাড়া দ্রষ্টব্য এখন আর কিছুই নাই। বিমানের উপরে ছাদ নাই। কেমন করিয়া বিমানের ধ্বংস হইল, এ সম্বন্ধে কতকগুলি মত আছে, যথা—

(১) M. H. Arnott, Superintending Engineer এর মত—মন্দির যখন নির্ম্মাণ করা হয় তখন যেমন যেমন গাঁথা হইতেছিল তেমনই বালুকা দ্বারা ভিতর পূর্ণ করা হইতেছিল ; মন্দির-গাঁথা শেষ হইবার পরে যখন ভিতরের বালুকা সরান হয় তখন ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই মত ঠিক হইতে পারে না, কেন না (ক) মন্দিরে যে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহার নিদর্শন রহিয়াছে সিংহাসন, এবং (খ) এরূপ হইলে পাথরগুলি হুড়মুড় করিয়া কতক ভিতরে কতক উপরে চাপিয়া পড়িত ; পাথরগুলিকে সেরূপ দেখায় না।

(২) ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় মন্দিরের ধ্বংস ; ইহাও হইতে পারে না, কেন না ভিত্তি কোথায়ও বসিয়া যায় নাই ; এরূপ হইলে মেঝেতে horizontal ফাটল ও মন্দিরে vertical (প্রলম্ব) ফাটল দেখা যাইত ; তাহা দেখা যায় না।

(৩) A. Sterling, Asiatic Researches, xv. 329—বিমানের উপর একটি প্রকাণ্ড কুম্ভপাথর (loadstone) ছিল ; তাহা সমুদ্রগামী জাহাজকে আকর্ষণ করিত ; একদল মুসলমান নাবিক দূরে জাহাজ হইতে নামিয়া চুপি চুপি মন্দির আক্রমণ করিয়া কুম্ভপাথর চুরি করিয়া লইয়া যায়। পুরোহিতগণ মন্দির অপবিত্র জানিয়া বিগ্রহকে পুরীতে লইয়া যান এবং মন্দির ত্যাগ করেন। পরে প্রকৃতি তাঁহার ধ্বংসলীলা আরম্ভ করেন।

(৪) ভূমিকম্পের ফল। তাহাও হইতে পারে না ; কেন না বিমানের ঠিক সম্মুখেই বিমানসংলগ্ন জগমোহন এখনও ঠিক খাড়া আছে ; ভূমিকম্প জগমোহনকে পরিত্যাগ করিত না।

(৫) পুরীর records মতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কালাপাহাড়ের আক্রমণ।

কারণ যাহাই হউক, বিমানের ধ্বংস শিল্পের জগতে একটা বিরাট শোচনীয় ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

বিমানের উত্তর এবং দক্ষিণ-গাত্রে ৮′—২½″ উচ্চ একটি করিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তি এবং পশ্চিমগাত্রে ৯′—৬″ উচ্চ একটি সূর্য্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটিই শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। বিমান হইতে অবতরণ করিয়া আমরা জগমোহনের দিকে অগ্রসর হইলাম। বিমান-জগমোহন প্রকাণ্ড রথরূপে পরিকল্পিত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে উত্তরদিকে ১২খানি এবং দক্ষিণদিকে ১২খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথচক্র তোলা-করিয়া (relief) ক্ষোদিত দৃষ্টিগোচর হইল। এই রথচক্র শিল্পজগতে বিখ্যাত। পাথরের উপর পাথর বসাইয়া মন্দির গাঁথা হইয়াছে অথচ তাহারই ভিতর হইতে বিরাট চক্র কেমন সুন্দর উৎকীর্ণ হইয়াছে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অতি-বিরাট-সুন্দর কল্পনা হইতে প্রসূত। চক্রগুলির সম্মুখে গিয়া আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়স্তিমিতগতি

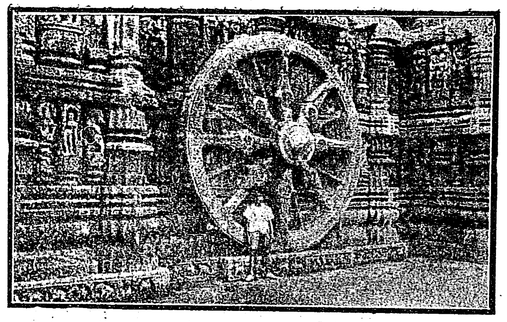

রথ-চক্র—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

হইয়া অনিমেষলোচনে শিল্পীর নৈপুণ্য দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রত্যেকখানি চক্রই অতিসুন্দর, বিরাট; পাথরে তোলা-করিয়া উৎকীর্ণ; অর, অক্ষ, নেমি সবই আছে. আর চক্রের প্রতি অঙ্গে নিপুণ হস্তের নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি বা পদ্ম বা অন্য বস্তু উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চক্রের ব্যাসের মাপ ৯′—৮″; প্রত্যেক চক্রে প্রধান অর (spoke) আটটি. আর অবান্তর অর আটটি; প্রত্যেক অরই কারুকার্য্যবিশিষ্ট; অক্ষ হইতে নেমি পর্য্যন্ত অরের দৈর্ঘ্য ১′—৩″। পূর্ব্বে রথে নাকি ৭টি প্রস্তর নির্ম্মিত অশ্ব যোজিত ছিল, এখন সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রথ-চক্র দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণপ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কোণার্কে গমন করেন। দেখিবার, শুধু দেখিবার নহে, ভাবিবার মত জিনিষ বটে!

উত্তরদিকের গাত্রে চক্রগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা পূর্ব্বমুখে গিয়া জগমোহনের পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বার প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই প্রস্তরের উপরে লেখা আছে—

Interior of Jagamohan was filled in by order of the Hon'ble G. A. Bourdillon, Lt. Governor, Bengal, 1903.

[বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা (লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর) মাননীয় জে, এ, বুর্দ্দীলন বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জগমোহনের অভ্যন্তর (বালুকা প্রভৃতির দ্বারা) পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।]

দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাট (frame) শিল্পীর নৈপুণ্যের নিদর্শন লইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। কাল মুণ্ডি (chlorite) প্রস্তরে ক্ষোদিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি সকল এবং বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি রুচি ও বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। মূর্ত্তিগুলি এখনও এত সুন্দর রহিয়াছে যে মনে হয় এইমাত্র বুঝি তক্ষণ শিল্পী তাহার যন্ত্রাদি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। Sterling (Asiatic Researches. xv. 332) বলেন, Which would stand a Comparison with some of our best specimens of Gothic architectural ornaments—পাশ্চাত্যের গথিক শিল্পের সহিত ইহাদের উপমা চলে।

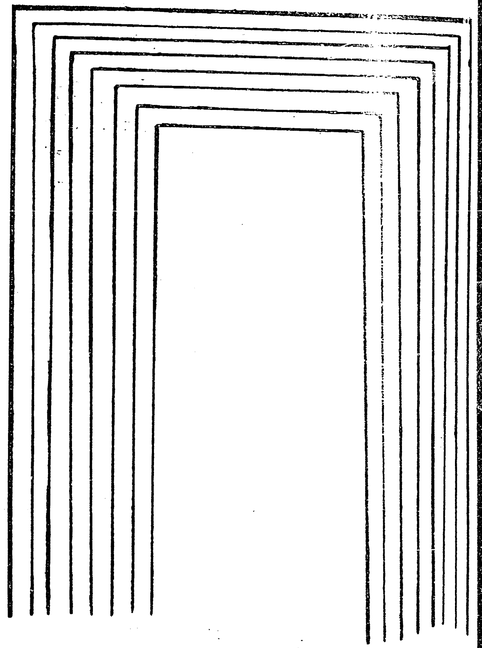

দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাট

এই দ্বারের কারুকার্য্য প্রায় অক্ষত অবস্থায় আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারের ঠাটের দুই পার্শ্বের প্রস্তর দণ্ড ও মস্তকের প্রস্তরে ৭টি নক্সা শ্রেণী বর্ত্তমান।

(১) লতা-পাতার নক্সা।

(২) ঊর্দ্ধে মানব-মানবী, অধোভাগে সর্পের ল্যাজের ন্যায়—এইরূপ যুগলমূর্ত্তি পরস্পরকে জড়াইয়া সমস্ত দ্বার বেড়িয়া আছে।

(৩) দুই পার্শ্বের ডাণ্ডায় মিথুনমূর্ত্তি, দ্বারের উপরে উপবিষ্টা নর্ত্তকী।

(৪) আঁকা-বাঁকা লতার মাঝে নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মানুষের মূর্ত্তি—ডাণ্ডায়; উপরের প্রস্তরে পরী উড়িয়া যাইতেছে।

(৫) নক্সা, নৃত্য ও বাদনরতা নারী।

(৬) মিথুনমূর্ত্তি এবং নৃত্যবাদনরতা নারী।

(৭) পুষ্পের মালা।

জগমোহনের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে। আমরা সকলেই উপরে উঠিলাম; বিভিন্ন 'ভূমি' (storey) অতিক্রম করিয়া আমরা সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলাম। এই স্থানে ৬।৭ ফুট দীর্ঘ মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে নীচের আলিসার উপর দিয়া ও উপরের আলিসার তলা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। প্রত্যেক আলিসাতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি. কেহ বাদ্যবাদনরত, কেহ বংশীবাদনরত ইত্যাদি। চতুর্ম্মুখ-মূর্ত্তি, মৃদঙ্গ-বাদনরতা অপ্সরার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন আমরা জগমোহনের উপর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্র দেখিতে পাইলাম তখন "উৎকট আনন্দে" আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল; সকলেই প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—কি মহীয়ান্ দৃশ্য! শ্রীমতী ত একেবারে বালিকার ন্যায় হাস্যসমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন; শ্রীমানের ভয় হইতেছিল, বুঝি বা শ্রীমতী "দেই লাফ" বলিয়া লাফ দেন! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম; পরে সকলেই সেই উচ্চ আলিসায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলাম—কোণার্ক না দেখিয়া ফিরিলে উড়িষ্যায় আগমনই বৃথা হইত!

জগমোহন হইতে অবতরণ করিয়া আমরা অন্যান্য দ্রষ্টব্য পদার্থ ও ভোগমণ্ডপ দেখিলাম। ভোগমণ্ডপ দেখিয়া মনে হয় ইহা সম্পূর্ণ-গাঁথা হয় নাই। যে সকল মূর্ত্তি ভোগ-মণ্ডপে ছিল—তাহা সরাইয়া নবনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। আমরা যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। এস্থানে পাণ্ডাজাতীয় একটি লোক আমাদিগকে ফুলের মালা দিতে আসলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা শ্রীমতীর প্রাপ্য স্থির করা গেল। 'পাণ্ডা' শ্রীমতীকে মালা পরাইয়া দিলেন, কিছু পয়সা দক্ষিণা পাইলেন। যাদুঘরে পাণ্ডা! যাক্। যাদুঘরে কাল প্রস্তরে উৎকীর্ণ বহু সুন্দর মূর্ত্তি দেখা গেল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

গঙ্গা, ছাগবাহন অগ্নি, মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ, শিবলিঙ্গ, তিন অংশে সীতা বিবাহ [১ সম্প্রদান, ২ নৃত্যগীত, ৩ বিবাহ মিছিল], বিষ্ণু. ঝুলন-যাত্রা, সূর্য্য। এই সূর্য্যমূর্ত্তি অতি সুন্দর। মূর্ত্তির সর্ব্বনিম্নে অরুণ সপ্ত অশ্ব পরিচালনা করিতেছেন; অরুণের ঠিক পশ্চাতে দ্বিভুজ সূর্য্যনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন; পায়ে স্যাণ্ডালের ন্যায় জুতা, কটিতে কটিবন্ধ, গলায় মালা, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে মুকুট। উপরে তোরণের মধ্যস্থলে রাহুর মুখ। সূর্য্যদেবের পাদদেশের দুই পার্শ্বে দুটি ছোট মূর্ত্তি, একটি শঙ্খ বা ঐরূপ কিছু বাজাইতেছে, অপরটি বোধ হয় পূজার্থ দ্রব্য-হস্তে দণ্ডায়মান; ইহাদের পার্শ্বে ঢাল ও তরবারি হস্তে দণ্ড ও পিঙ্গল নামক দুইজন দ্বারপাল; ইহাদের উপরে ছোট মন্দিরের চূড়ার উপরে দুইটি নারীর মূর্ত্তি, ইঁহারা বোধ হয় নিক্ষুভা ও জ্যৌ—সূর্য্যের দুই পত্নী (স্কন্দপুরাণ, প্রভাস, ১১ অধ্যায়)। ইঁহাদের উপরে দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। উপরের দুই কোণে অপ্সরার পৃষ্ঠে কি যেন উড়িয়া আসিতেছে। সমগ্র মূর্ত্তিটি শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাদুঘরের একখানি দীর্ঘ প্রস্তরফলকে নবগ্রহের মূর্ত্তি ক্ষোদিত; এই প্রস্তর-ফলকখানি নাকি পূর্ব্বে জগমোহনের দ্বারের উপর ছিল। এইরূপ প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত নবগ্রহমূর্ত্তি পুরীতে গুণ্ডিচা-বাড়ীর দ্বারের উপরে দেখা যায়। যাদুঘরের ভিতরে লৌহনির্ম্মিত কয়েকটি ক'ড়ি (Beam) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদের মধ্যে তিনটির দৈর্ঘ্য ৩৫′-৯″। ইহারা মন্দিরের কোনও স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখন এখানে থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

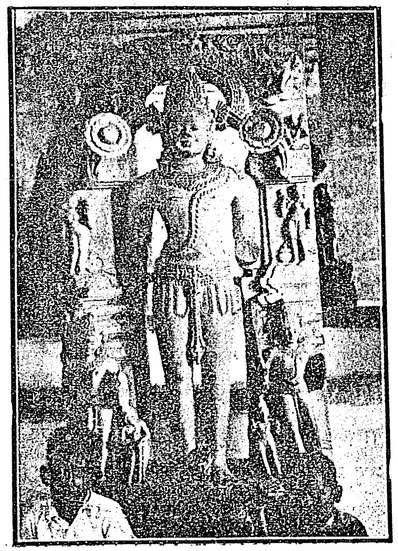

সূর্য্য—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত (chlorite) উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোণার্ক হইতেই তথায় নীত হইয়াছে।

কোণার্ক মন্দিরের হাতায় উত্তরদ্বারে দুইটি হস্তীর মূর্ত্তি।

প্রত্যেক হস্তীই এক একখানি প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ, প্রত্যেকের শুণ্ডে একটি করিয়া মানুষ ঝুলিতেছে। দক্ষিণ দ্বারে দুইটি অশ্ব; ইহারাও এক একখানি প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ। বিখ্যাত শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হাভেল সাহেব বলেন (Indian sculpture and Painting p. 146-47)—Had it by chance been labelled Roman or Greek, this magnificent work of Art would now be the pride of some great metropolitan museum in Europe and America.—যদি ইহার গায়ে, রোমান বা গ্রীক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বলিয়া বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে ইউরোপ বা আমেরিকার যে কোনও প্রধান সহরের যাদুঘরে ইহা সাদরে রক্ষিত হইয়া যাদুঘরের গৌরব বাড়াইত।

বিমানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মায়াদেবীর মন্দির; বাহিরের কারুশিল্প সুন্দর, কিন্তু তাহার বিশেষ করিয়া দেখিবার মত অবসর আমাদের ছিল না। কোণার্কে দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা সে সকল না দেখিয়া এক্ষণে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। মন হইল উচাটন, অথচ সব যে দেখা হইল না এরূপ ভাবও মনে জাগিতে লাগিল! ফিরিতেই হইবে, মন্দিরের নিকট দিয়াই ফিরিতে লাগিলাম; এতদিনের ঝড়-বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরের কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা প্রতি পদক্ষেপেই আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছিল; যেন বলিতেছিল, থাকিয়া যাও, দেখিয়া যাও, আদর করিয়া যাও। এমন একখানি প্রস্তর নাই, যেখানিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই। প্রত্যেক পাথর-খানিতে শিল্পীর আদরের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। পাথর দেখিতে দেখিতে ভুল হইয়া যায়, মনে হয় ইহা যেন কোমল লঘু মৃত্তিকা বা মোম ছিল, শিল্পী সযত্নে হাতে করিয়া তুলিয়া বুকের নিকটে রাখিয়া সমস্ত স্নেহরস নিঙড়াইয়া দিয়া ইহাকে অভিষিক্ত করিয়া মনের মতন করিয়া গড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে, পরে কোনও দয়াল দেবতা শিল্পীকে অমর করিবার জন্য কোমল মৃত্তিকা বা মোমখণ্ডে সযত্নে অঙ্কিত শিল্পকে কঠিন প্রস্তরের আকার দিয়া আজ পর্য্যন্ত মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলাম। ফিরিবার পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল—"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তিসকল যে ক্ষোদিয়াছিল, এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবুদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষ মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীরাম্বরা তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?" (বঙ্কিমচন্দ্র)

ফিরিতেই হইল। আবার সেই বালুময় দীর্ঘ পথ, পা যেন আর চলিতে চায় না, কি যেন ফেলিয়া চলিয়াছি! যেখানে মোটর-যানকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে পুনঃ সেই স্থানে আসিলাম। সামান্য জলযোগান্তে যাত্রা করা হইল, তখন বেলা ৩।১৫ মিনিট। ১॥ ঘণ্টার মধ্যে সব দেখা হইল! এ যেন আমেরিকার সঙ্ঘের ভবঘুরের ২।১ দিনে ভারত দর্শন! তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোণার্কে যাওয়ার পক্ষে সনাতন গো-যানই প্রশস্ত; সময়ের তাড়া থাকে না, যত খুশী কোণার্ক দর্শন করুন, সারাদিন পরে আহারান্তে গোযানে শয়ন করিয়া প্রত্যাগমন করুন। সময়ের তাড়া নাই, আরামের তাগাদা নাই, সভ্যতার বালাই নাই।

এইবার একটু ইতিহাসের কথা। মন্দির নির্ম্মাণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে (১) মাদলা পাঁজি (২) গঙ্গাবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসন এবং (৩) আইন-ই-আকবরী দেখিতে হইবে।

(১) মাদলা পাঁজিতে আছে (Dr. Rajendralal Mitra, Orissa II)

সপুচ্ছনরসিংহেন ক্ষ্মেশ্বরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে॥

রাজা নরসিংহদেবের দ্বারা দ্বাদশ শকশতাব্দীতে অংশুমালী সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণিত হইয়াছিল।

(২) তাম্রলিপিতে দেখা যায়—কোণার্কের মন্দির নরসিংহদেবের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে নির্ম্মিত হয়। নরসিংহদেব ১১৬০ শক হইতে ১১৮৬ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী); তাহা হইলে ১১৭৮ শকে (১২৫৬ খৃষ্টাব্দে) মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিতে হয়। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নরসিংহদেব ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন (History of Orissa, vol I. p. 262)। এই হিসাব মাদ্‌লা পাঁজির হিসাবের সহিত মিলে। চোড়গঙ্গবংশের রাজাদের রাজত্বের সময়ের হিসাবও ইহাই নির্দ্দেশ করে।

(৩) আইন-ই-আকবরী। প্রথম ভাগ—সুবে বাঙ্গালা পৃঃ ৩০৯ (Francis Gladwinএর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের অনুবাদ) Near to Jaganaut is the temple of the Sun, in the erecting of which was expended the whole revenue of Orissa for 12 years... This is said to be a work of seven hundred and thirty years antiquity. Raja Nurshing Deo finished this building, thereby erecting for himself a lasting monument of fame..... জগন্নাথের মন্দিরের অনতিদূরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত; এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উড়িষ্যার ১২ বৎসরের আয় ব্যয়িত হইয়াছিল।...৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়; রাজা নরসিংহদেব ইহা সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় যশের চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।..

আবুল ফজলের এই উক্তি কতটুকু প্রামাণ্য তাহা বিচার-সাপেক্ষ। মন্দির যে নরসিংহদেবের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, মাত্র এইটুকু আমরা উক্ত উক্তি হইতে গ্রহণ করিতে পারি; পূর্ব্বে লিখিত দুই প্রমাণের সহিত তাহা মিলে। কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণের সময় আবুল ফজলের মতে, ১৫৬৬ (আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তি)+৪৭ (আবুল ফজলের মৃত্যু)—৭৩০=৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। সম্রাট আকবর রাজত্ব করিয়াছিলেন ৪২ বৎসর। আকবরের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে উড়িষ্যায় এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল মনে করিলে (অর্থাৎ ১৫৮০ হইতে ৭৩০ বাদ দিলে) মন্দির নির্ম্মাণের সময় দাঁড়ায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত প্রমাণের সহিত মিলে না। জগন্নাথের মন্দিরও তখন নির্ম্মিত হয় নাই। অন্য কারণেও আবুল ফজলের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না; কোণার্কের মন্দিরে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখা যায়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; অতএব জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের পরে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিতে হয়। জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের সময়—একাদশ শতাব্দীর পরে হইতে পারে না, কেন না একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরের খ্যাতি বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছিল (R. D. Banerjee—History of Orissa, vol II. p. 370)। আরও এক কথা, কোণার্ক শব্দের অর্থই হইতেছে, চক্রক্ষেত্র বা পুরী হইতে ঈশান কোণে অবস্থিত সূর্য্যমন্দির; পুরীর মন্দিরের পূর্ব্বে পুরী হইতে ঈশান কোণের মন্দির কেমন করিয়া হইবে!

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপই বলিতে হইবে। কালের প্রভাবকে প্রায় উপেক্ষা করিয়া এই মন্দির সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রায় ৭০০ বৎসর দাঁড়াইয়া আছে। শিল্পী কালের গর্ভে বিলীন হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিল্পী ও তাহার শিল্পকে অমর করিয়া রাখিয়াছে কোণার্ক।

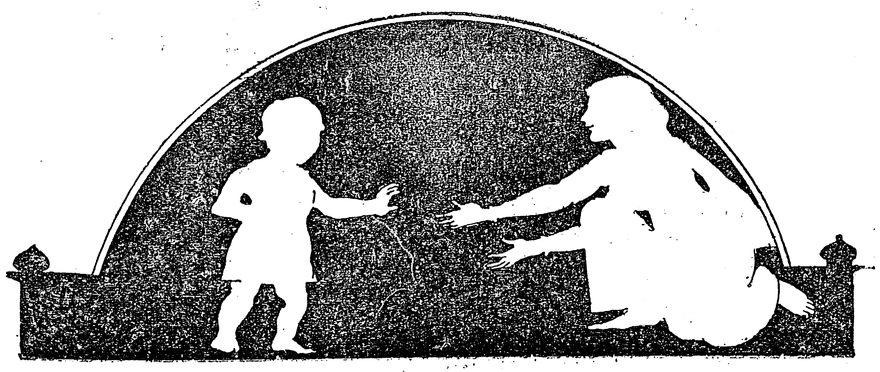

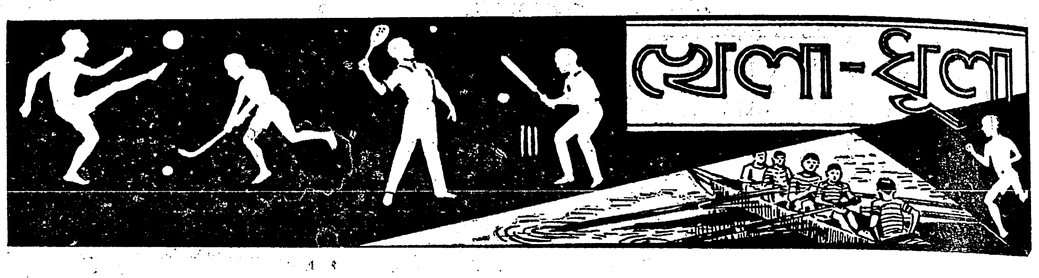

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ঃ

লা হো রে নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পাঞ্জাব ৯১ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম, বাঙ্গলা ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং বোম্বাই ১৯ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাঙ্গলার পুরুষ প্রতিযোগিগণের মধ্যে কেবলমাত্র এফ্ গাণ্ট্জার ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হতে পেরেছেন। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার মিস্ স্মিথ ৫০ ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং মিস্ পিচার্ড ৮০ মিটার বেড়া দৌড়ে ও হাইজাম্পে প্রথম ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করেছেন। পোল-ভল্টে বি পি রায় চৌধুরী (বাঙ্গলা) দ্বিতীয় হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়ারা পঞ্চম টেষ্টে জয়ী হয়েছে এক ইনিংস ও ৬ রানে। গ্রিমেট ৭৩ রানে ৬ উইকেট, ও'রেলি ৪৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে।

এইবারের অভিযানে অষ্ট্রেলিয়ারা একটা খেলাতেও হারে নি, বারোটা খেলায় জিতেছে, আর তিনটায় ড্র করেছে।

ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

জগৎ বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান তাস্ম্যানিয়ার বিরুদ্ধে খেলে ৩৬৯ রান করেছেন। তিনি তৃতীয় শত রান মাত্র ৪০ মিনিটে করেছেন। তৃতীয় উইকেট সহযোগিতায় ৩১৬ রান হয়েছে, তার শেষ এক শত রান মাত্র ৩১ মিনিটে হয়।

ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

আগামী ৪ঠা এপ্রিল ভারতীয়গণ ক্রিকেট খেলতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে তাঁরা তিনটি টেষ্ট ম্যাচ ও আটাশটি ম্যাচ বিভিন্নদলের সঙ্গে খেলবেন। ২রা মে তারিখে উষ্টার্সের সঙ্গে তাঁদের সেখানে প্রথম খেলা হবে এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান জিমখানার সঙ্গে শেষ খেলা হবে।

নিম্নলিখিত সতেরো জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মহারাজ কুমার ভিজিয়ানাগ্রাম (ক্যাপ্টেন), মেজর সি কে নাইডু, ওয়াজির আলি, মহম্মদ নিসার, এল অমরনাথ, বিজয় মার্চ্চেণ্ট, বাকা জিলানী, আমির ইলাহী, মুস্তাক আলি, মেহেরমজি, এল পি জয়, এস্ ব্যানার্জ্জি, এম জে গোপালন্, পি ই পালিয়া, হিন্দেলকার, এস এম হোসেন, রামস্বামী।

পাতিয়ালার যুবরাজও নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু তিনি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। টেষ্ট-খেলা এবং বিশেষ বিশেষ খেলাতে অমর সিং, দিলওয়ার হোসেন ও জাহাঙ্গীর খাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে। মেজর ব্রিটেন জোন্স দলের ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

সি এস নাইডু ও ভায়া (Indian Whippet) নির্ব্বাচিত না হওয়ায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। সি এস নাইডু একজন সুদক্ষ সর্ব্বদিক-পারদর্শী খেলোয়াড়—বোলিং, ব্যাটিং ও ফিল্ডিং সকল বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর ভায়া তো acquisition to any

কালীঘাট স্পোর্টসের ৮৬ গজ বেড়া দৌড়ে
মিস্ এম্ স্মিথ প্রথম হয়েছেন
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল এডুকেশন সপ্তাহে—লেকে ছাত্রদের নৌবিহার ও গীত-বাদ্য ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

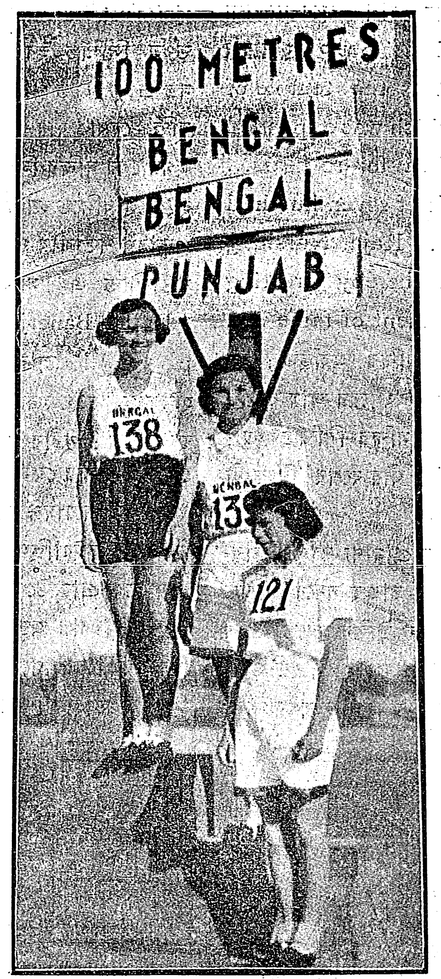

নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ১০০ মিটার দৌড়ে, প্রথম—মিস্ এম্ স্মিথ (বাঙ্গলা), দ্বিতীয়—মিস্ ডি প্রিচার্ড (বাঙ্গলা), তৃতীয়—মিস ডি ফরেষ্ট (পাঞ্জাব)

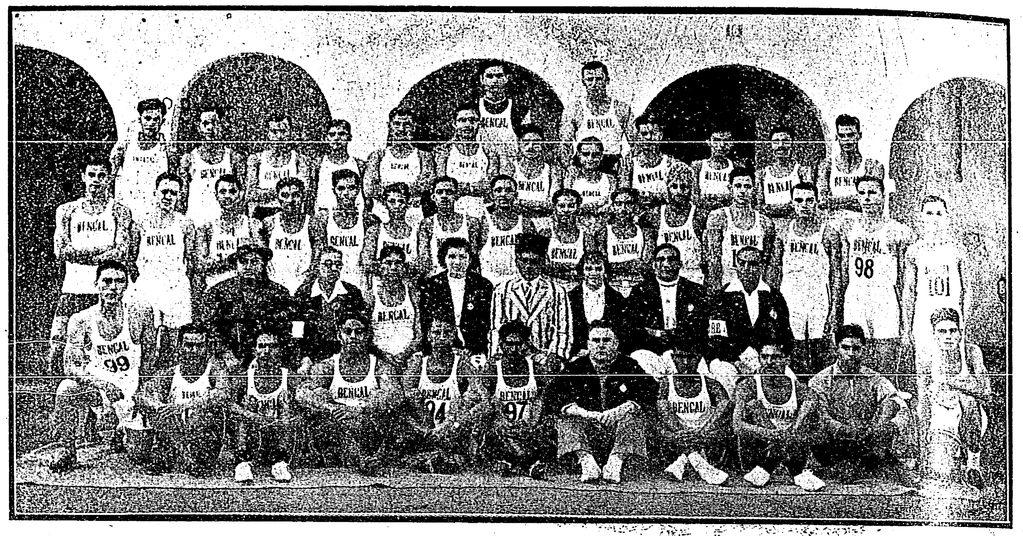

বেঙ্গল অলিম্পিক দল—লাহোরে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন

জলপাইগুড়ি যোগেশচন্দ্র স্মৃতি স্পোর্টসে (দক্ষিণে) ফজলর রহমান সাধারণ প্রতিযোগিতায় ও শান্তি বোস স্কুলের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন —ভক্তকুমার ঘোষ

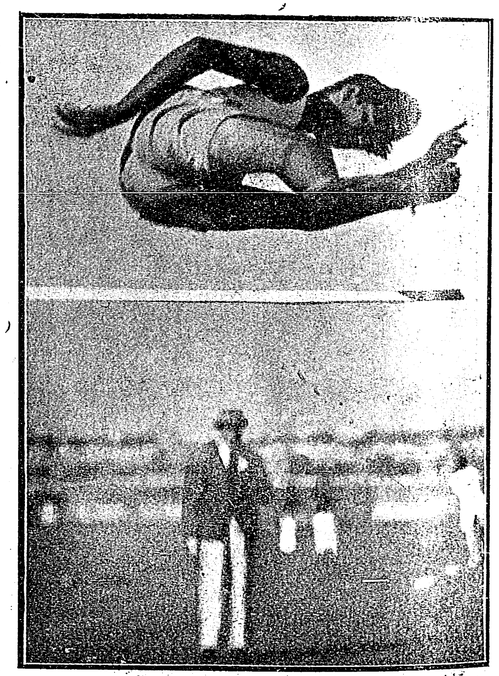

নিখিল ভারত অলিম্পিকে জেরাল্ড ডি মনি (মাদ্রাজ) ৫ ফুট ১০·৫ ইঞ্চি লাফিয়ে হাই জাম্পে প্রথম হয়েছেন

side,—ফিল্ডিংএ তাঁর জোড়া নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট খেলা, বাঙ্গলা ও আসাম বনাম মাদ্রাজ, মাদ্রাজে হয়েছে। মাদ্রাজ ৯১ রানে জয়ী হয়ে ফাইনালে গেলো। বৃষ্টির জন্য খেলোয়াড়দের খুবই অসুবিধা হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথমে বাঙ্গলার আরম্ভ বেশ ভাল হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে সি পি জনস্টনের বোলিংএ ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা সুবিধা করতে পারে নি। জনষ্টন ২৮ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। মোট স্কোর : মাদ্রাজ—১৯৫ ও ১৫৮; বাঙ্গলা ও আসাম—১৪৪ ও ১১৮। বাঙ্গলার কমল ভট্টাচার্য্য, ভাণ্ডারগাচ ও লংফিল্ড যেতে না পারায় হীনবল বাঙ্গলা হেরে গেলো, নতুবা কি হতো বলা যায় না।

যুক্তপ্রদেশ দক্ষিণ পাঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসের স্কোরে হারিয়েছে। যুক্তপ্রদেশ —২৩০ ও ১৯৫ (৬ উইকেট); দক্ষিণ পাঞ্জাব—১৬৯ ও ২৮০ (৫ উইকেট, ডিক্রেয়ার্ড)।

উত্তর ভারত যুক্তপ্রদেশকে এক ইনিংস ও ৩১ রানে হারিয়ে বোম্বাইএর সঙ্গে ফাইনাল খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। উত্তর ভারত—প্রথম ইনিংস —৪৫২। যুক্তপ্রদেশ—২০৮ (৯ উইকেট) ও ২১৩।

জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্রিকেট শীল্ড ঃ

মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্রিকেট শীল্ড খেলার সেমিফাইনালে মোহনবাগান মাণিকতলা ইউনাই-

হেস্টার স্কুল গার্লস স্পোর্টসের ১০০ মিটার দোড়ে—
প্রথম—রমা লুড্ডি, দ্বিতীয়—হিরণময়ী বসু —কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

কালীঘাট স্পোর্টসের এক মাইল দৌড়ের আরম্ভ—ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিংএর লক্ষ্মীনারায়ণ (বাম থেকে তৃতীয়) প্রথম হয়েছেন
ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

স্পোর্টিংও ই বি আর্ ম্যান্‌সন্ ইন্‌ষ্টিটিউটকে তিন উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে যায়।

ইণ্টার স্কুল মেয়েদের স্পোর্টসের "হাই জাম্পে" সিলভিয়া আইজাক প্রথম হয়েছেন

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ইণ্টার স্কুল মেয়েদের স্পোর্টসে ৭৫ মিটার দৌড়ে—রুবি আরণ প্রথম ও হিরণ্ময়ী বসু দ্বিতীয় হয়েছেন

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং এক ইনিংস ও ৫৮ রানে মোহনবাগানকে হারিয়েছে।

বিলিয়ার্ড ঃ

ই মঙ্ক (রেঙ্গুন) ৪৯ পয়েণ্টে রাজাকে (কলিকাতা) হারিয়ে প্রফেশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খেলা অত্যন্ত সাধারণ ধরণের হয়েছে, স্কোর উঠ্‌ছিলো অত্যন্ত ধীরে। রাজা ছয় সাতটা অল্ রাউণ্ড 'ক্যান্‌ন্' করে। 'টপ্‌টেবল' খেলা তেমন হয়নি। উভয় খেলোয়াড়ই অত্যন্ত সোজা 'সট্'ও 'মিস্' করেছে।

স্কোর ঃ প্রথম সেসন্—ই মঙ্ক—৪৫৬; রাজা—৩৮৬;

দ্বিতীয় সেসন্—ই মঙ্ক—৯৪৭; রাজা—৮৯৬।

ব্রেক্‌স্ ঃ ই মঙ্কের—৪২, ৩০, ২৬, ২০, ২৪, ৪২, ৪৬, ২৬, ৪১, ৬৩, ২১, ৩১, ৬১, ৪৮।

রাজার—৪৪, ২৩, ২৪, ৩২, ৫২, ৩৮, ২২, ৩০, ৩৩, ২১।

ইণ্টার-ভার্সিটি হকি ঃ

পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চতুর্থ বার্ষিক আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে, কোন পক্ষ গোল দিতে পারে নি। ১৯৩৩ সালে প্রথম এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সেবার কলিকাতা ৩-২ গোলে জয়ী হয়েছিল। বিগত দুই বৎসর ১৯৩৪-৩৫ সালে কলিকাতা পাঞ্জাবের নিকট ৪-০ গোলে পরাজিত হয়।

পাঞ্জাবের খেলা উন্নত ধরণের হয়েছে, তাদের খেলোয়াড়দের খেলার কৌশল কলিকাতার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভবিষ্যতে জয়লাভ করতে হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের খেলার অধিকতর উন্নতি করতে হবে।

মেয়েদের হকি ঃ

গ্রাস্‌হপার্স এক গোলে ওয়াণ্ডারার্সকে হারিয়ে মেয়েদের সিনিয়র হকি নক্-আউট্ টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী হয়েছে।

জামালপুর দল ২-১ গোলে জুয়িস্ গার্লস্‌দের হারিয়ে মেয়েদের জুনিয়র নক্-আউট্ টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী হয়েছে।

ওয়াণ্ডারার্স'রা ৩-১ গোলে গ্রাস্‌হপার্স'দের পরাজিত করে লেডী টেগার্ড কাপ্ বিজয়িনী হয়েছে।

লেডী টেগার্ট কাপ্ বিজয়িনী ওয়াণ্ডারার্স —দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

সিনিয়র নক-আউট টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী গ্রাস্‌হপার্স দল —তারকদাস

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলায় বাঙ্গলা ৭-০ গোলে বিহার ও উড়িষ্যাকে হারিয়েছে। বিহার ও উড়িষ্যা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল দল। গোলরক্ষক বলদেশ্বরী অনেক অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে। বাঙ্গলার পক্ষে ডেভিডসন ৩, সুলতান খাঁ ২, সি ট্যাপ্‌সেল ১ ও গ্যালিবর্ডি ১ গোল দিয়েছেন। ইঁহাদের খেলা বেশ ভালো হয়েছিল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড এমেটের খেলা ভালো হয়নি।

ভূপাল ও পাঞ্জাব প্রথম দিনে গোল শূন্য 'ড্র' করে দ্বিতীয় দিনে ভূপাল এক গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়েছে। ভূপালের অনমনীয়, কৃতসঙ্কল্প বাধাদান পাঞ্জাবকে জয়ী হতে দিলে না। বানি খাঁর জন্য পাঞ্জাবের ফরওয়ার্ডরা কৃতকার্য্য হতে পারলে না। ব্যাক ফারুকের বল ধরা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মারা অতি সুন্দর। পাঞ্জাবের লেফ্‌ট ইন ব্যারেট খেলার আরম্ভেই দুটি গোলের সুযোগ নষ্ট করায় তাঁর দলের হার হলো। এই প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব গত বৎসরে বিজয়ী ছিল।

বোম্বাই ৩-২ গোলে ইউ পিকে হারিয়েছে। বোম্বাই ভালো খেলেছে। ইউ পির ক্যাপটেন বিখ্যাত রূপসিং একা যে গোলটি করেন তাতে তাঁকে সত্যই যাদুকর বলা যেতে পারে। বোম্বাই পক্ষে সেণ্টার হাফ নির্ম্মলের খেলা সুন্দর হয়েছিল। জেমিসন, টাইরেল, পিণ্টো ও আসলাম এবং

বিজিত পক্ষে রূপসিং,ওয়েলস ও লিমোণ্ডাইন ভালো খেলেছেন। টাইরেল ও জেমিসনের দু'টি গোলই বিশেষ সুন্দর ও চতুরতাপূর্ণ ছিল।

মাদ্রাজ ২-১ গোলে মধ্যভারতকে হারিয়েছে।

৩-০ গোলে সম্মিলিত রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে বাঙ্গলা সর্ব্বপ্রথমে সেমি ফাইনালে উঠেছে। রেলওয়ে দল ভালো খেলতে পারে নি। বাঙ্গলা যতো আক্রমণ করেছে তাতে আরো বেশী গোলে তাদের জেতা উচিৎ ছিল। রেলওয়ে পক্ষে টেলিস, জনার্দ্দন, পেনিগার, প্রিতম সিংএর খেলা খুব ভালো হয়েছিল। বাঙ্গলার গ্যালিবর্ডি

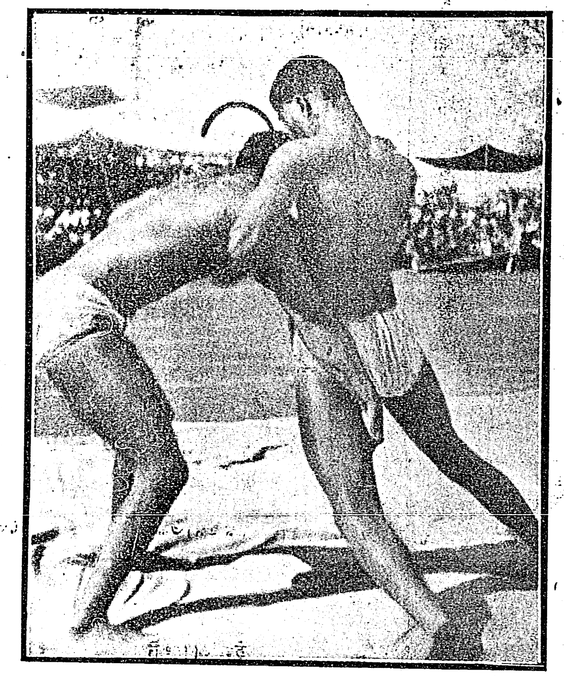

নিখিল ভারত অলিম্পিক খেলায় মল্ল দ্বন্দ্বে রত
জি ঘোষ (বাঙ্গলা) ও রামদুলারা (ইউ পি)
জি ঘোষ বিজয়ী হয়েছেন

৬ষ্ঠ ফরওয়ার্ড ও ৩য় ব্যাক হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছেন এবং প্রথম গোলটি দিয়েছেন। সি ট্যাপসেল ও হজেস ব্যাকদ্বয় অপরাজেয়। দু'জন আউটের মধ্যে এ দেবই বেশী খেটে খেলেছেন, তাঁর জন্যেই এল ডেভিডসন তৃতীয় গোলটি করতে করেন। সুলতান খাঁ ম্যাকতারমট, নয়নাকানু ও গ্রস্‌ট্রেটকে কাটিয়ে এবং মিকিকে গোল থেকে বের করে নিয়ে দ্বিতীয় গোলটি দেন। বাঙ্গলার একটি গোল আম্পায়ার জগন্নাথ বাতিল করেন। কিন্তু বহু দর্শকের অভিমত যে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করে পরে পোষ্টে ঠেকে ফিরে আসে।

মানাভাদার ষ্টেট ২-১ গোলে সিন্ধুপ্রদেশকে হারিয়েছে। সিন্ধুর হারের জন্য তাদের গোলকিপারই দায়ী। বিজয়ীদের সেণ্টার হাফ মাসুদ উৎকৃষ্ট খেলা খেলেছে। রাইটব্যাক সত্তারের কৌশলপূর্ণ খেলার জন্যই সিন্ধু গোল করতে পারে নি। ফরওয়ার্ডে নাইডু ও জব্বরের আদান-প্রদান চমৎকার, তারা দু'জনে দু'টি গোল দেয়। রাইট্ আউট সাহাবুদ্দিনের গতি খুব দ্রুত, সে কয়েকটি নিখুঁত সেণ্টার করেছে।

ভূপাল ও বোম্বাই-এর খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। উভয় দলেই বিশিষ্ট নামকরা খেলোয়াড় ছিল। ভূপাল দল কেবল ভারতীয় খেলোয়াড়ে গঠিত, কিন্তু বোম্বাই দলে নানা জাতি ছিল। উভয়পক্ষের দু'টি গোলই শেষ সময়ের পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়। খেলাটি এত উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল

কালীঘাট স্পোর্টস্ বিজয়িনী ওয়াণ্ডারার্স এথেলেটিক ক্যাম্পের খেলোয়াড়গণ। বাম থেকে দক্ষিণে:—
মিস্ এম, ক্লেমিস, পেগি ম্যাক্‌ইণ্টায়ার,
এল ক্যারান ও মারজোরি স্মিথ (৫৮)
ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

যে এক মুহূর্ত্তও বিরক্তিকর মনে হয় নি। দ্বিতীয় দিনে, বোম্বাই ২-১ গোলে ভূপালকে হারিয়েছে। খেলাটি খুব উচুদরের হয়েছিল। ভূপালের রাইট হাফ্ ও ক্যাপ্টেন আসান আহত হওয়ায় দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম থেকেই খেলতে অপারক হন। ভূপালের সাকুর প্রথম গোল দেয়। বোম্বাইদল লং পাস্ করে খেলতে আরম্ভ করে ভূপালদলকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। টাইরেল দু'টি গোলই দিয়েছে। জে পিণ্টোর বিপক্ষকে কাটিয়ে বেরুনো ও সহকর্ম্মিদের

সুন্দর সুযোগ করে দেওয়া খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং বিপক্ষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে। সুইনির স্থলে বোকারা খেলেছেন, তাঁর বলের উপর আয়ত্ত অতি চমৎকার, দুজন ব্যাকই বেশ নির্ভরযোগ্য; সেণ্টার হাফ্ নির্ম্মল খুব খাটিয়ে এবং তাঁর ফরওয়ার্ডদের বল জোগান নিখুঁত ও সুবিচারসম্মত। বর্ত্তমান দলসমূহে নির্ম্মলের ন্যায় সেণ্টার হাফ্ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অলিম্পিকে স্থান পাবার তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মাদ্রাজ ও দিল্লীর খেলা প্রথম দিনে ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। দিল্লীর রাইট ব্যাক রাজেন্দ্র সিং, লেফ্‌ট হাফ্ ব্যাক জাফর, এক্সট্রস ও রঞ্জৎ সিং খেলায় বিশেষত্ব দেখিয়েছে। মাদ্রাজ পক্ষে কুলেন, দোরাবজি, মার্ফি, ব্লাঙ্কলে ও মাসিলামনি ভালো খেলেছে।

দিল্লী দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাদ্রাজকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। খুব উত্তেজনার মধ্যে ও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলাটি হয়েছিল। বল চক্ষের পলকে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরছিল, সময়ে সময়ে লক্ষ্য রাখা দুরূহ হচ্ছিল। দিল্লী তাদের ফরওয়ার্ডদের ভাল ফিনিস্ ও তৎপরতার জন্য এবং দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগের বলে অতিরিক্ত সময় খেলে জিততে পেরেছে। দিল্লীর এক্সট্রস, রঞ্জৎ সিং ও আবদুল হাই এই তিন জনে মিলে চারটি গোলই দিয়েছে। এদের খেলা খুব উচ্চ ধরণের। দিল্লীর গোল-রক্ষক মূলা সিং বিশেষ শক্ত সটগুলি অবলীলাক্রমে রক্ষা করে তাঁর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। মাদ্রাজের পক্ষে ইন্‌সাইড রাইট ব্লাঙ্কির খেলার যোগ্যতা ও নিপুণতা অসাধারণ, তাঁর সহকর্ম্মিদের মধ্যে পাশ নিখুঁত ও সুবিচারপূর্ণ ছিল। ব্লাঙ্কি দু'টি অতি সুন্দর গোল করেছে এবং তাঁর একটি গোল দুর্ভাগ্যবশতঃ 'ষ্টিকের' জন্য বাতিল হয়েছে।

বাঙ্গলা ৩-০ গোলে দিল্লীকে হারিয়ে সর্ব্বপ্রথম ফাইনালে উঠ্‌লো। বাঙ্গলা দলে একজন 'সার্প সুটার' সেণ্টার ফরওয়ার্ডের বিশেষ অভাব ছিল, অলিম্পিকের খেলোয়াড় আর কার যোগ দেওয়ায় সে অভাব পূর্ণ হয়েছে। আর কার দু'টি গোল করেন এবং এ দেব একটি। দিল্লী তাদের পূর্ব্ব খেলার তুলনায় খারাপ খেলেছে। ফরওয়ার্ডে এক্সট্রস্ ও হাই ব্যতীত কেউ ভালো খেলতে পারে নি। রক্ষণভাগে মূলা সিং ও সৈদুল হক উৎকৃষ্ট খেলেছে। বাঙ্গলার পক্ষে এলেন, সি ট্যাপ্‌সেল, সি হজেস, গ্যালিবর্ডি, চ্যাটার্জ্জি, এ দেব, আর কার, সুলতান খাঁ ও নাজির সুন্দর খেলেছেন। এল ট্যাপ্‌সেল ও এল ডেভিডসনের খেলা ততো উচুদরের হয় নি। এ দেব ও আর কার দ্বিতীয় গোলটি বিশেষ দুরূহ অবস্থা থেকে করেন।

বোম্বাই ও মানাভাদারের সেমি ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র হওয়ায় ফাইনাল খেলা পিছাইয়া গেলো, শনিবারে খেলা হবে। বোম্বাই তাদের পূর্ব্ব খেলার তুলনায় নিকৃষ্ট খেলেছে। বোম্বাইএর নির্ম্মল, ফিলিপ্‌স আসলাম, এল পিণ্টো ও বোকারা এবং মানাভাদারের মহম্মদ হোসেন, মামুদ, সাহাবুদ্দিন, নাইডু ও বোষ্টন খাঁ ভালো খেলেছে। আজ (১১-৩-৩৬) পুনরায় ইহাদের খেলা হবে।

হকি লীগ খেলা ঃ

হকি লীগ খেলা চলছে। গত বৎসরের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত গত বারের সুনাম রাখতে পারেন নি। তাঁরা ছ'টি খেলা খেলে মাত্র ৯ পয়েণ্ট লাভ করেছেন। সেণ্ট জোসেফ ১১ পয়েণ্ট ও ভবানীপুর ১০ পয়েণ্ট করেছে। রেঞ্জার্স ৪টি খেলে ৭ এবং কাষ্টমস্ ২টি খেলে ৪ করেছে। মোহনবাগানের বিশিষ্ট খেলোয়াড় এ দেব ও এইচ মিত্র নবাগত বি জি প্রেস দলে যোগ দেওয়ায় মোহনবাগান শক্তিহীন হয়েছে। কিন্তু সুলতান খাঁ তাদের দলভুক্ত হওয়ায় অনেকটা ক্ষতি পূরণ হয়েছে। ক্যালকাটা ও পুলিসের সঙ্গে ড্র করায় তাদের মূল্যবান দুটি পয়েণ্ট নষ্ট হয়েছে। খুব সম্ভব এবার রেঞ্জার্স ও কাষ্টমসের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়নসিপ্ নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে।

নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ

দ্বাদশ বার্ষিক নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

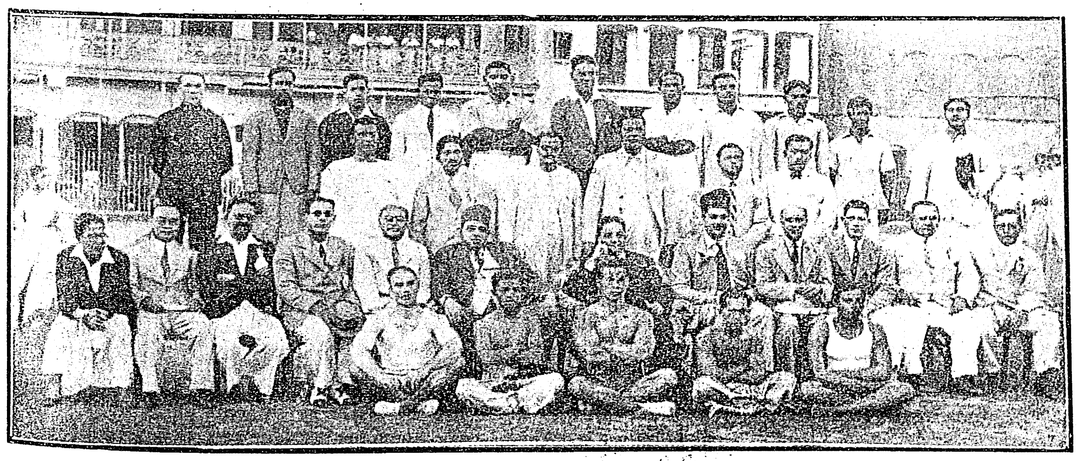

নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীগণ, উদ্যোক্তাগণ,
মহারাজা বর্দ্ধমান ও মহারাজা সন্তোষ ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

শেষ হয়েছে। মিষ্টার জো উইক্ (বর্ম্মা) মোট ৬৯০ পাউণ্ড ভারোত্তোলন করে তাঁর নিজস্ব পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি ১২ ষ্টোন ও তদূর্দ্ধ বিভাগে প্রথম হয়ে গোপীনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন এবং সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

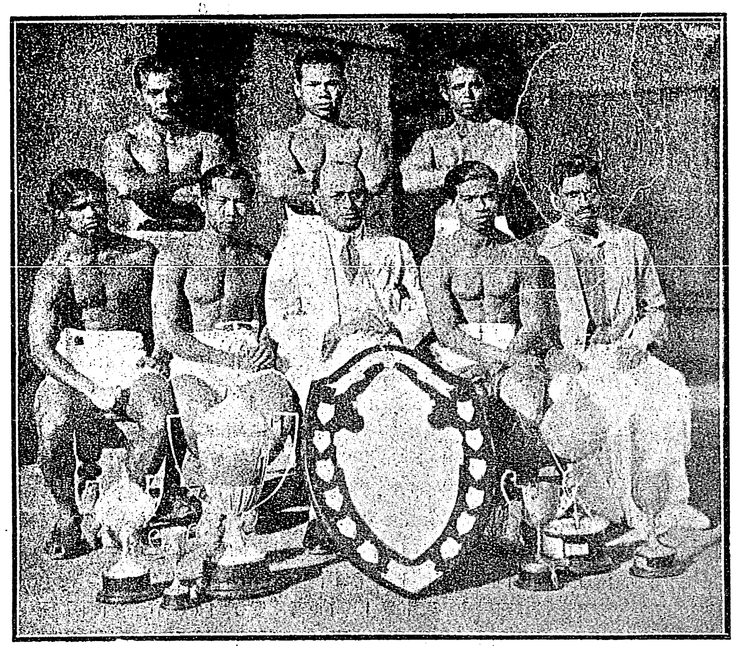

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণ—(বাম থেকে দাঁড়িয়ে)—১১ ষ্টোন বিজয়ী এম পি কৃষ্ণাণ (মাদ্রাজ), ১২ ষ্টোন বিজয়ী জো উইক্ (বর্ম্মা), পি গোপালম্ (ক্যানানোর) ; (উপবিষ্ট)—এম ভারাথন (ক্যানানোর), টুন্‌মিন্ (বর্ম্মা),এন এন ঘোষ (সভাপতি), সান্‌থিন (বর্ম্মা) ও হরেন্দ্র কাবাসী (সম্পাদক)

ছবি—তারকদাস

মিষ্টার এম্ পি কৃষণ (মাদ্রাজ) মোট ৫৪৫ পাউণ্ড উত্তোলন করে ১০ ও ১১ ষ্টোন বিভাগে প্রথম হয়েছেন ও ডি এন বসু মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও রাধারাণী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়ে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মিষ্টার সান্‌থিন (বর্ম্মা), (পকেট হার্‌কিউলিস্ নামে অভিহিত) তাঁর নিজের ওজন অপেক্ষা অধিক ভার উত্তোলন করে রাসবিহারী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ ট্রফি পেয়েছেন এবং ৮ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাগবাজার জিম্‌ন্যাসিজম্ চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন।

মিষ্টার টুন্‌মিন্ ৯ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোবিন্দ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন। মিষ্টার টি নাহাপিট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য সুবর্ণ পদক লাভ করেছেন। বাঙ্গলার কেউ উচ্চ স্থান অধিকারী হন নাই।

সন্তরণে নূতন রেকর্ড ঃ

আমষ্টার্ডমের সংবাদে প্রকাশ, উইনি ডি নওডেন ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ১ মিনিট ৪-১৬ সেকেণ্ডে সাঁতারে নিজের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ম্যাষ্টেনব্রক ১০০ মিটার ব্যাক-ষ্ট্রোক ১ মিনিট ১৫-১৮ সেকেণ্ডে সাঁতারে মিসেস হোম জারেটের ১ মিনিট ১৬-১৮ সেকেণ্ডের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "তীর্থযাত্রী"—২৲

ভাগবতাচার্য্য শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা" দ্বিতীয় খণ্ড (৭-১৮ অধ্যায়)—১৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "দীপের আলো"—১৷৷০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড—২৲

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অনাথ আশ্রম"—২৲

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত সমালোচনা "শরৎচন্দ্র"—১৸০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার "কুহকিনীর ফাঁদ"—৸০

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত কিশোর উপন্যাস "লাইট্ হাউস্ রহস্য"—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "দোলা" দ্বিতীয় ভাগ—৩৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার "ডাকাতীর সোনা"—৸০

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন প্রণীত আলোচনা "গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য"—২৲

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুলালচন্দ্র পাত্র প্রণীত ছেলেদের অভিনয় উপযোগী নাটক "চালিয়াৎ-ছেলে"—৸০

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "হাওয়া-বদল"—১৲

শ্রীবিমলানন্দ রায় বি-এ প্রণীত ভ্রমণ কহিনী "দক্ষিণ ভারত"—১৲

শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত গোয়েন্দা গ্রন্থমালার "দস্যুকন্যা"—৸০

শ্রীপ্রমথনাথ পাল বি-এ প্রণীত সমালোচনা পুস্তক "দত্তা পরিচয়"—৸০

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত বিচিত্র রহস্য সিরিজের "নাগিনী"—৸০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

Bharatvarsha Halftone & Printing Works